আইনস্টাইনীয়
বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক

Unified Field Made by Unified Centre Theory

নিমাইকুমার ঘোষ

আত্মবিজ্ঞান

এম. টি. ৩৪/১ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রথম প্রকাশ :
১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ
১৩৯১ বঙ্গাব্দ

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী অন্তলীনা ঘোষ
আত্মবিজ্ঞান
এম. টি. ৩৪/১, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রক :
শ্রীগণপতি হালদার
হালদার প্রিন্টিং সেণ্টার
২৯নং বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মূল্য দশ টাকা

আইনস্টাইন বলেছিলেন, মহাশূন্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সময়ের গতিকে পাল্টিয়ে দিতে পারে। আমেরিকার স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা মহাকাশ ফেরীর সাহায্যে এই পরীক্ষা চালাবেন। ওয়াশিংটনস্থ 'নাসার' প্রধান বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক বলেছেন, আজ পর্যন্ত যত পরীক্ষা হয়েছে, তার মধ্যে এটি হবে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা এই মাধ্যাকর্ষণ সমস্যা প্রকল্প ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে কাজ শুরু করবে। তার আগে আরও চিন্তা ভাবনা করবার জন্য তাঁদের হাতে আমার এই 'আইনস্টাইনীয় বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক' পুস্তকখানা অর্পণ করলাম।

২রা আগস্ট-১৯৮৩

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মজয়ন্তী

বিনীত—

নিমাইকুমার ঘোষ

নিমাইকুমার ঘোষের অন্যান্য বই :

আগুন হতে গিয়ে (আধুনিক কবিতা)
নিশিরাগ (উপন্যাস)
যুগে যুগে কালে কালে (উপন্যাস)
রত্নাকরের প্রেম (উপন্যাস)
মঙ্গলের দিন (গ্রহ বিজয়ের কল্পকাহিনী)
বিপ্লবী গজাদা (রাজনৈতিক নীতি বিহীন কৌতুক)
বাংলার আমি গেরিলা (বাংলাদেশের দেশপ্রেমের কবিতা)
রোশেনারা কাদের (দেশাত্মবোধক কবিতা)
আন্দোলনে জয়প্রকাশ সেন্টারিজমের ইতিহাস (গণনৈতিক ইতিহাস)
সেন্টারিজমে ধর্ম বিজ্ঞান দলহীন গণতন্ত্র (গণনৈতিক ইতিহাস)
কেন্দ্রায়ণে সমগ্র বিজ্ঞান (একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব)
দলাদিষ্ট রাজনীতি বনাম ভোটমোক্ষিত গণনীতি (গণনৈতিক প্রবন্ধ)
ভগবান ব্রহ্ম আত্মা ও ধর্ম (বিশ্বধর্মগ্রন্থ)

এক

আইনস্টাইন ছোটবেলা থেকে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। কোনদিন এক মুহূর্ত স্থির হয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা করতে পারেন নি। সামাজিক বিভেদে সব সময় থাকতেন উত্তপ্ত। সে উত্তাপ দেখা না গেলেও তার দাহিকা শক্তি ছিল স্টোভের মতো। তাই হয়তো তিনি ঘরের জ্বলন্ত স্টোভে লক্ষ্য করেছেন তার আগুন ঘরকে আলোকিত করছে, কিন্তু চাকতিটা তখনও লাল হয় নি, লাল হওয়ার পথে উত্তপ্ত হচ্ছে। তখন লাল না হলেও তার দাহিকা শক্তি আছে। তেমনি তাঁর জীবনও দাহিকা শক্তিতে পুড়েছে, কিন্তু সাধারণ লোক বুঝতে পারত না।

এই তাপ বাড়তে বাড়তে স্টোভের চাকতিকে আগুন করেছে, ক্রমে আলো দিয়েছে আইনস্টাইনকে। নিজের মত তিনি পৃথিবীতেও দেখলেন, সূর্য দিনে আলো দেয়, তাপ দেয়। তাই আলো আর তাপ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্টোভের কালো চাকতিটা ক্রমে লাল হয়ে ওঠার পর স্টোভ নিভিয়ে দিলে যত সময় চাকতি লাল থাকে তত সময় সে আলো দেয় আবার তাপও দেয়। তারপর আলো থাকে না তাপ থাকে। তারপর তাও আর থাকে না। আবার সেই কালো চাকতি।

স্টোভে তো দেশলাই কাঠি ঠুকে দিলে জ্বলে ওঠে। আইনস্টাইনও তেমনি সমাজের সাম্প্রদায়িকতার আগুনে জ্বলে উঠতেন। তবু সেই জ্বলা না জ্বলার মধ্য দিয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা করতেন, তাতে, অন্তত কিছু সময়ের মত আত্মস্থ হতে চেষ্টা করতেন। তাত্ত্বিক বিজ্ঞান হল রীতি মত সাধনার বিষয়। যোগী না হলে তাতে সফলতা লাভ করা যায় না। নিশ্চিন্ত ভাবে সেই ধ্যানমগ্নতার সুযোগও তাঁর জীবনে আসে নি। তাই তিনি আলো তাপের অসাধারণ ব্যাখ্যা দিলেন। কিন্তু তার অদৃশ্য ভাবের গভীরে যাওয়ার সুযোগ দিল না সমাজ। তাই তিনি অসমাপ্ত থেকে গেলেন।

খুব গভীরের কথা চিন্তা না করলেও তাপ ও আলোর অনেক প্রকার রূপ কল্পনা করেছেন। তারনামো বা অন্য কোন উৎসের সাহায্যে আলো জ্বলে। সূর্যের আলোরও যে একটা উৎস আছে, তা নিয়ে তিনি তেমন মাথা ঘামান নি।

তবে তিনি বলেছেন, আলোর আরও রূপ আছে যা আমরা চোখে দেখতে পাই না। যেমন: বেতার-তরঙ্গ, এক্স-রশ্মি।

আইনস্টাইনের প্রাথমিক তত্ত্বের চারটি বিশেষ শব্দ হল আলোক, বিশ্বজগৎ, কাল ও চতুর্থ মাত্রা। এই চারটি না জানলে তাঁর তত্ত্ব বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। আলোর কথা পূর্বে বলা হল। এখন বলা হচ্ছে বিশ্ব জগতের কথা। তার হদিস পেতে হলে মেঘমুক্ত অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাতে হবে। তাদের পরিক্রমাও চলে নির্দিষ্ট পথ ধরে। সেই পথের কথা বৈজ্ঞানিকরা কাগজ-পেনসিল ধরে এঁকে দেখাতে পারেন।

কাল বলতে শুধু ঘড়ির সময় বোঝায় না, দুটি ঘটনার মাঝখানের সময়কে কাল বলে। আবার দুটি স্থানের দূরত্বকেও কাল দিয়ে মাপা হয়। যেমন কলকাতা থেকে দিল্লী ১৫০০ কিলোমিটার হলেও অতিক্রমের সময়ের জন্য এই দূরত্বকে কালে মাপা যায়। আলোর গতিকেও কালে মাপা যায়।

আবার চতুর্থ মাত্রাটিও কাল। তবে সে কাল পূর্বোল্লিখিত কাল নয়। তাঁর মতে একটা প্লেন উড়ে যেতে দেখলে প্রথমে উত্তর দক্ষিণের দূরত্ব মাপতে হবে। তারপর পূর্ব পশ্চিমের দূরত্ব মাপতে হবে। তারপর মাপতে হবে উচ্চতা। তাতেও সব কিছু জানা যাবে না। প্রতি সেকেণ্ডে প্লেন সরে যাচ্ছে, সে হিসাবটিও রাখতে হবে।

একটা ট্রেন ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে চলছে বললে বুঝব, মাটির হিসাবে ট্রেনটি ৬০ কিলোমিটার চলছে। তার সময় এক ঘণ্টা। মনে করা যাক—সেই গতি সম্পন্ন ট্রেনে আমরা চলেছি। চলতে চলতে আমরা কি দেখতে পাব? জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে মাটির দিকে তাকালে দেখতে পাব ট্রেনের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। অপর দিকের জানালার দিকে তাকালে দেখতে পাব অন্য একটা ট্রেন আমাদের ট্রেনের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। আবার আমাদের পায়ের নিচে তাকালে দেখতে পাব ট্রেনটা যেন চলন শক্তি হারিয়েছে। এখানে বস্তুর গতির কথা বলতে গিয়ে অপর বস্তু অর্থাৎ মাটির সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে মাটি অতিক্রম করছে। পার্শ্ববর্তী ট্রেনের তুলনায় ৮ কিলোমিটার বেশি বেগে চলছে। আবার আমাদের সম্পর্কে ট্রেনটির গতি বিন্দুমাত্র নেই।

সূর্য গ্রহ উপগ্রহের ক্ষেত্রেও দূরত্ব হচ্ছে আপেক্ষিক। ঠিক দূরত্ব জানতে হলে আমাদের সৌর জগতের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাই

স্থান ও কাল গতির উপর নির্ভরশীল। এবং তা আপেক্ষিক। আপেক্ষিক কাল সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, মনে করা যাক আমরা একটা নদীর ধারে ঘড়ি হাতে দাঁড়িয়ে আছি। চলমান একটা নৌকায় একজন এক মিনিট কালের ব্যবধানে দুটি আলোর ঝলক দেখাল। এই দুটি ঝলকের মধ্যবর্তী কাল তাদের পক্ষে এক মিনিট হলেও আমাদের পক্ষে এক মিনিটের বেশি হবে। কারণ নৌকা এগিয়ে যাওয়াতে সেই আলোর ঝলক আমাদের চোখে আসতে এক মিনিটের বেশি সময় লেগেছে।

তবে তিনি বলেছেন, আলোর গতির আপেক্ষিকতা নাই। সকল আলো প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০,০০০ কিলোমিটার বেগে চলে। এত দ্রুত জগতের কোন যান চলতে পারে না। তার গতির সঙ্গে অন্য কোন বস্তুর গতির তুলনা হয় না।

আলো চোখে দেখার যোগ্য তরঙ্গ রশ্মি। আবার বেতার তরঙ্গ বা এক্স রশ্মি চোখে না দেখার যোগ্য। আলোকে তরঙ্গ ধরলে এদের সঙ্গেও আলোর আপেক্ষিকতা সম্ভব। আলোকে এক জায়গায় বেঁধে রাখলে সবার মূলে কেন্দ্রতত্ত্বে পৌঁছানো যাবে না। কেন্দ্র তত্ত্ব থেকে বিজ্ঞান আরম্ভ না করলে একীভূত ক্ষেত্র-তত্ত্বে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অনন্ত বিশ্বে আলোর যখন একটা গতির হিসাব পাওয়া যাচ্ছে, তখন তাকে আপেক্ষিকতায় ফেলা যেতে পারে নিশ্চয়।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা বাদে মূলে-যাওয়া যাবে না। একটার চেয়ে অন্যটা ছোট কি বড় হলেও সবার কেন্দ্রের জন্য সবাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। গৃহের কর্তা গৃহস্থ। সে গৃহের সবাই তার অধীন হলেও তাদের অনেকে গৃহ বাঁধতে পারে। তারাও সংসার গড়তে পারে। সূর্য যেমন গ্রহদের ধরে রেখেছে এবং বাঁচিয়ে রেখেছে আকর্ষণে বিকর্ষণে, তেমনি গ্রহরাও উপগ্রহদের ধরে রেখেছে এবং বাঁচিয়ে রেখেছে। এমনিভাবে কর্তা বা মূল কেন্দ্র তার অধীনদের বাঁচিয়ে রেখেছে। তবু তার কৈন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব তাদের পরে পুরোপুরি চাপাতে পারে না। কারণ, তাদেরও প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব আছে প্রত্যেকের কৈন্দ্রিক চরিত্রের জন্য।

এই কৈন্দ্রিক চরিত্র কিন্তু প্রত্যেকের আলাদা আলাদা হলেও তাদের পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীদের ভূমিকা থাকতে বাধ্য। তাই পৃথিবীর নিজস্ব কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ থাকলেও পৃথিবীর নানা বস্তুর নানা কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ কাজ করে। পৃথিবীর আকর্ষণ-বিকর্ষণ সেখানে একাধিপত্য করতে পারে না। জলের নিজস্ব আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে, মাটিরও নিজস্ব আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একক ক্ষেত্রের মধ্যে প্রত্যেকের নিজের নিজের ক্ষেত্র আছে। সে ক্ষেত্রে সবাই সবার আত্মীয়।

তেল পুড়ে আলো হয়। সেই আলো অন্ধকারকে ঠেলে রাখে। এখানে তেল পুড়ে অতীত হতে থাকে, আলো বর্তমান হতে থাকে আর অন্ধকার ভবিষ্যৎ হতে থাকে। তেলেরও আবার তিনটি কাল আছে, আলোরও তিনটি কাল আছে, অন্ধকারেরও তিনটি কাল আছে। আলোও নীরেট আলো হতে পারে না, অন্ধকারও নীরেট অন্ধকার হতে পারে না। বৈদ্যুতিক পাখার উপর দিকে আলো জ্বললে তার ব্লেডের ছায়া অন্ধকার, বাকী অংশ আলো। তখন যদি পাখাটাকে জোরে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়. তখন একা অন্ধকার থাকবে না, একা আলোও থাকবে না। আলো ও অন্ধকার মিশে একাকার হয়ে যাবে। তখন আর তাকে আলো আর অন্ধকারের মিশ্রণ বলে মনে হবে না। এমনি ভাবে জগতের সব কিছুর মধ্যে সব কিছু আছে। তাতে যার আধিক্য বেশি তাকে সেই নামে অভিহিত করা হয়।

বস্তু ক্ষয়কারী বিকর্ষণই শক্তি। বস্তু পূরণকারী আকর্ষণকে শক্তি ঠিক বলা যায় না। দুর্বলতাও বলা যায় না। একে বলা যায় বস্তু মজুদকারী, আর শক্তিকে বলা যায় বস্তু পাচারকারী। বস্তু থেকে শক্তি যখন বিকর্ষিত হয় তখন তা অন্যত্র জমা হচ্ছে বস্তু সৃষ্টি করতে। অর্থাৎ সেখানে একের বিকর্ষণেই অন্যের আকর্ষণ হচ্ছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত আলো আছে তা সব সময় বিকর্ষিত হচ্ছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত অন্ধকার আছে তা সব সময় আকর্ষিত হচ্ছে দেখা যায়। আসলে আকর্ষণ বিকর্ষণ কাজটা কেন্দ্রকে ভিত্তি করে শক্তিই করছে। অন্ধকার আছে তাই আলোকে বুঝতে পারি। আলোর পটভূমি অন্ধকার। সে সর্বত্রই আছে, আলো বা শক্তি সর্বত্র যাচ্ছে। বৈদ্যুতিক পাখা স্থির অবস্থায় থাকলে হিসাব নেওয়া যায় ব্লেডের অন্ধকার কত অংশ আছে, ব্লেডের ফাঁক দিয়ে আসা আলো কত অংশ আছে। তারপর পাখা ঘোরালে ধরে নেওয়া যায় আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণে কত পার্সেন্ট আলো আছে আর কত পার্সেন্ট অন্ধকার আছে। অন্ধকার সব সময় সর্বত্র আছে। তাই আলোর প্রকাশে সে সরে যায়, অপ্রকাশে ফিরে আসে। অলে অন্ধকারের জন্য আকর্ষণ আছে, আলোর জন্য বিকর্ষণ আছে। আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের ওঠা নামাও তেমনি আকর্ষণ বিকর্ষণ। একটার অবর্তমানে অন্যটিকে বোঝা যায়।

উজ্জ্বল আলোতে আছে দ্রুত ছুঁড়ে দেওয়ার গতি। আর মৃদু আলোতে আছে

আলো ছুড়ে দেওয়ার গতি। আইনস্টাইনের পূর্বসূরী বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন সব ধাতু না হলেও, কোন কোন ধাতুর উপর যে কোন উজ্জ্বলতায় আলো পড়লে ঐ ধাতুর উপরিভাগ থেকে ইলেকট্রন একই বেগে বিচ্যুত হয়। একই আলো কাছ থেকে ফেললে তার যে বেগ, দূর থেকে ফেললে সেই বেগ। এর থেকেও আলোর গতিবেগ ধরা যায়, যদি লক্ষ্য করা যায় নিকট থেকে আলো ফেলে যে সময়ে ইলেকট্রন বিচ্যুত হল, তার কত সময় পরে দূর থেকে আলো ফেলায় ইলেকট্রন বিচ্যুত হল। তা ধরা সহজ না হলেও আলোর যখন গতিবেগ আছে, তখন নিশ্চয় সেখানে সময়ের পার্থক্য আছে। শুধু সময়ের পার্থক্য নয়, নির্দিষ্ট ধাতুতে পড়া আলোরও পার্থক্য আছে। তবে সে পার্থক্য ইলেকট্রনের গতি স্বীকার করল না।

এখানে শক্তি কাজ করছে, উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল আলো, দু'রকম আলোর গতি, ইলেকট্রনের চরিত্র এবং স্থানীয় আবহাওয়া। এক আলো থেকে এতগুলো ঘটনা ঘটায় মূল বা সেণ্টার কিন্তু সেই আলোই। তাতে এতগুলো ঘটনাকে এক সেণ্টারে বাঁধা গেল। তা না করে যদি ফিল্ডে বা ঘটনাস্থলে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর, গতির সঙ্গে গতির আপেক্ষিকতা খুঁজি তাতে সেণ্টারিজমের অভাবে ইউনিফয়েড ফিল্ড থিওরিতে যাওয়া যাবে না। রামের সঙ্গে শ্যামের আপেক্ষিকতা থাকলেও এক অপরকে প্রভাবিত করছে না। তাই রাম ভাল হলে শ্যাম ভাল নাও হতে পারে। এখানে ফিল্ডের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ইউনিফয়েডের প্রশ্নই ওঠে না।

রাম ও শ্যাম মূলত মানুষ। যদি বলা যায় মানুষ মরণশীল, তা হলে রাম ও শ্যাম দুজনেই মরণশীল। মানুষের সঙ্গে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের তুলনা হয় না। যদি বলা যায় জীব মাত্রেই মরণশীল, তা হলে এই নিয়মে মানুষ পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ সবাই পড়ে। যদি বলা যায় সমস্ত জীবনই মরণশীল, সেখানে মানুষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ গাছপালা কেউই মরণের হাত থেকে বাঁচতে পারে না। যদি বলা যায় সূর্য একদিন ধ্বংস হবে, তা হলে ধরে নিতে হবে সৌর জগতের কিছুই বাঁচবে না। আপেক্ষিকতা পার্থক্য ডেকে আনে বলেই আপেক্ষিকতাবাদী বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকার সূত্রে ইউনিফয়েড ফিল্ড দখল করতে পারবেন না। যদি তা দখল করতে পারেন, সেণ্টারিজমের জোরেই পারবেন।

দেখানো হল, যত মূলে যাওয়া যাবে, তত আপেক্ষিকতা কমতে থাকবে। এই এক ব্রহ্ম থেকে যতই দূরে আসা যাবে ততই এক ব্রহ্ম বহু হতে হতে আপেক্ষিকতা

সৃষ্টি হতে থাকবে। সেখানে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার মুক্তি নাই। সেই মূল সেণ্টার থেকে আপেক্ষিকতায় উঠে আসতে হবে। সেখানে রামের সঙ্গে শ্যামের, ট্রেনে বসে অন্যান্য গতির চিন্তা করলে চলবে না। এই সত্য স্থানীয় ক্ষণস্থায়ী সত্য। ট্রেনে বসে পায়ের দিকে তাকালে ট্রেন চলছে না মনে হবে, কিন্তু তার চাকা তো চলছে। এই চাকা থামলে সব দেখাই এক দেখা হবে। আপেক্ষিকতা সৃষ্টি করে নিয়ে আপেক্ষিকতা দেখলে দর্শকের কাছে তা সত্য হলেও সবার কাছে তা সত্য নয়। ট্রেনের কাছের চলন্ত মাটির পরে যে বসে থাকবে সে বলবে, ট্রেন চলছে কিন্তু মাটি চলছে না। সবাইকে একে বাঁধতে হলে সবার মধ্যে যা আছে, তাই ধরে টান দিতে হবে। অণু পরমাণুর সেণ্টার আছে, পৃথিবীর সেণ্টার আছে, সূর্যের সেণ্টার আছে। সে সেণ্টারগুলোর আপেক্ষিকতা আমাদের দেখতে হবে। প্রকাশ্যে রাম শ্যামের পার্থক্য থাকলেও কেন্দ্রে তারা এক। সেই এক ধরে টান দিলে সবাই এসে ধরা দেবে। একটা গরুকে বাঁধতে সারা শরীরে দড়ি জড়ানোর দরকার হয় না। গলায় একটা দড়ি বাঁধলেই যথেষ্ট।

একটা লাঠির মাথায় নানা স্থানে তেলে ভিজানো পলতে ঝুলিয়ে অগ্নি সংযোগ করে ঘোরালে পলতেগুলো ঘোরার উল্টো দিকে বেঁকে গেলেও আলো বিস্তার করতে থাকবে। এই আলোর বিরুদ্ধে, আগুন জনিত শূন্যতার বিরুদ্ধে হাওয়া এলে আবার বাঁকানো পলতের খাঁজে সংকোচনে আকর্ষণ সৃষ্টি হতে থাকবে। এই তো সেণ্টার ভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণের মূল কথা। পৃথিবীরও আকর্ষণ বিকর্ষণ এইভাবে চলছে। সেখানে হাওয়া ধরে রাখার পলতে না থাকলেও নানা বস্তুর প্রভাব সেই কাজ করে। আবার সেই প্রভাব আলোর মত পৃথিবীর বাইরে বিস্তার লাভ করে। সেই বিস্তার জনিত ক্ষয় মহাকাশের ধারা পূরণ করতে আসে। কারণ শূন্যতাই আকর্ষণের মূল কারণ। পূর্ণতাই বিকর্ষণের মূল কারণ।

একটা শূন্য কলসী ফেলে রাখলে সে কিন্তু পূর্ণ হবে না, আবার পূর্ণ কলসী ফেলে রাখলে সে শূন্য হবে না আপনা থেকে। রৌদ্রে গরম হলে জল বাষ্প হয়ে ঊর্ধ্বে উঠে গেলে কলসীর সেই স্থান পূর্ণ করবে হাওয়া। শূন্য কলসীতে তো হাওয়া আছে। তবে সে হাওয়াকেও গরম করলে গরম হাওয়া উঠে যাবে, ঠাণ্ডা হাওয়া এসে সেই স্থান পূর্ণ করবে। উত্তাপের ঠেলায় বস্তু চূর্ণও হালকা হয়ে বেরিয়ে আসে। এখানে শক্তি কাজ করছে। শক্তিতে একটা ঢিলকেও দূরে ছুড়ে

ফেলা যায়। তাই তাকে চূর্ণ করার প্রয়োজন হল না। হাইড্রোজেন বেলুনকে চূর্ণ করে শক্তি প্রয়োগ করে তোলার দরকার হয় না। প্রাকৃতিক শক্তিতে সে উঠে যাচ্ছে। সূর্যের এমনি শক্তির ডাইনামোই সব কিছুকে আকর্ষণ বিকর্ষণে ভাঙছে আর গড়ছে। এই ভাঙা গড়ার মধ্যে আপেক্ষিকতা দিয়ে বিচার করে দেখতে পারি কোন বস্তু সৃষ্টির পক্ষে উপযোগী এবং সৃষ্টি বিনাশের পক্ষে উপযোগী। তবে এই পরীক্ষা চালাতে হবে সেন্টারিজমের দিকে চেয়ে। নইলে বিপথগামী হতে হবে। সেন্টার সবার মধ্যে আছে বলে, তার পথই সবার পথ।

সূর্যের একটাই সেন্টার গ্রহদের চালাচ্ছে, প্রত্যেক গ্রহের প্রত্যেক সেন্টার আবার সাধ্যমত তাদের উপগ্রহদের চালাচ্ছে। এমনি ভাবে শক্তি চলে আসছে অণু-পরমাণু পেরিয়ে ভাবলোকে। অণু-পরমাণুই ভাঙতে ভাঙতে ভাবলোকে এসে আলোক শক্তি হয়েছে, তাই তার পরমাণু নাই। এই ধরণের ভাব শক্তি আবার বস্তু গড়ছে, যা দেখানো হল লাঠির গায়ে জ্বলন্ত পলতে বেঁধে। এই ভাবে বিভিন্ন বস্তু না গড়লে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ঘটত না। সৃষ্টির জন্য তারা হাইড্রোজেন বেলুনের মত ঘুরছে ক্রমশূন্যতায়। তাই জগতে কোন কিছুর শেষ নাই। গতিরও শেষ নাই। তবে আলোর গতির সঙ্গে অন্য গতির আপেক্ষিকতা চলে।

চন্দ্রশেখরের তত্ত্বে যে নক্ষত্রের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে, সেখানেও শেষ কথা নাই। সেও ক্ষয় হয়ে অন্য সৃষ্টির উপাদান যোগাতে পারে। ক্ষয় প্রত্যেকের আছে। সামান্য আলোর আঘাতে ধাতু ক্ষয় হয়ে ইলেকট্রন পর্যন্ত বেরিয়ে আসে। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বলয়ে সব বাঁধা। গোলাকার বলয়ের আবার শেষ কোথায়? কোথা থেকে যে এই বলয়ের আরম্ভ আজ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানী বলতে পারেন নি। এর আরম্ভ সেন্টার থেকে। তা সে একটা সূর্যের সেন্টার হোক বা একটা উকুনের সেন্টার হোক। যে কোন সেন্টার থেকে আরম্ভ করলে সমগ্রে পৌছানো যাবে। এত বড় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় চালানোর শক্তিও সেন্টার থেকে। সৃষ্টির আগে যদি একটা বস্তু থেকে থাকত, নিশ্চয় তা একটা সীমার মধ্যে ছিল। সীমা বললেই অনন্তের কথা মনে হবে। অনন্ত তাহলে শূন্য ছিল। শূন্যের আকর্ষণে বস্তু ছড়িয়ে পড়েছিল। সৃষ্টির আগে যদি অনন্ত শূন্যই থেকে থাকত, তবে আজ এত বস্তু এল কোথা থেকে? বস্তু শূন্যে ছড়ানো ছিল। শূন্যতার শীতলতা তাদের আকর্ষণ করে বস্তু সৃষ্টি করল। শীতলতা প্রসূত বস্তুর মধ্যে শূন্যতা থেকে একটা

পার্থক্য থাকতে হবে। অর্থাৎ তাতে শীতলতা ঢুকতে না পারায় উষ্ণতা দেখা দিল। শীতলতা ও উষ্ণতার পার্থক্যে শূন্য ও বস্তুর সৃষ্টি।

যখন একাধিক বস্তু সৃষ্টি হতে থাকল তখন থেকে ঘূর্ণনের সূত্রপাত। শূন্যতা ও পূর্ণতা পরস্পরকে আকর্ষণ বিকর্ষণ শেখায়। ফলে দেখা দিল ভাঙ্গা আর গড়া। ভাঙ্গা গড়া আছে বলেই ঘূর্ণন আছে, আবার ঘূর্ণন আছে বলেই ভাঙ্গা গড়া আছে। ঘূর্ণনে সব অংশের সঙ্গে সব অংশের সাক্ষাৎ না হলে যার যে প্রয়োজন আদান প্রদান করবে কি করে? তা ছাড়া সৃষ্টির যেখানে একটা শৃংখল আছে, সেখানে ঘুরতেই হবে। সোজা চলা সেখানে থাকা। মানে অবাস্তবতার স্বর্গে বাস করা। কিছুকে কেন্দ্র করে সেন্টারিজমের শাসন মানতেই হবে। তা ছাড়া সোজা চলা মানে চিরদিনের মৃত্যু। তাই চন্দ্রশেখরের নক্ষত্র মরতেই পারে না। মরে সে নিজের দেহ ক্ষয় করে অন্যকে সৃষ্টি করতে থাকবে। অনড় শবদেহের কোথাও স্থান নাই।

একটা জীবের চলা ফেরা শেষ হতে পারে, কিন্তু তার দেহ পঞ্চভূতে মিশবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। মৃত জীবের জীবন না থাকলেও শরীর পদার্থ কিন্তু আকর্ষণ বিকর্ষণে জীবন্ত। ডক্টর সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর নক্ষত্রের মৃত্যু দেখিয়ে সীমা টেনেছেন। এই চন্দ্রশেখর-সীমা (চন্দ্রশেখর লিমিট) ভ্রান্ত বলেই মত দিয়েছেন ব্রিটেনের স্যার আর্থার এডিংটন। ইনি কিন্তু অধ্যাপক সাহার তাপ আনয়ন তত্ত্বকে জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানে বারটি শ্রেষ্ঠ মৌল তত্ত্বের একটি বলে প্রশংসা করেছিলেন। অবশ্য চন্দ্রশেখরও এডিংটনের শ্বেত বামন তত্ত্বকে মানেননি বলে দুজনের মধ্যে মন কষাকষি হয়েছিল। তিনি বললেন, শ্বেত বামনে শেষ নয়। আরও আছে। তাঁর এই মত স্বীকার্য। কিন্তু তিনি সেই শ্বেত বামনকে প্রাণ দিয়ে টেনে আনলেন কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাক হোলে। এর অপর নাম নিউট্রন নক্ষত্র। এখানেই চন্দ্রশেখর সীমা টানলেন।

কোন কিছুর যত সময় চলা থাকে, তত সময় সীমা টানা যায় না। আলোর গতিবেগ ঠিক করে দেওয়া হয়েছে ঠিকই। তার পরে তার আলো হিসাবে অস্তিত্ব না থাকতে পারে। কিন্তু তার আগেই সে অন্যকিছু সৃষ্টি করে যেতে পারে, তার ভূমিকা আরও দূর পর্যন্ত। তাপ বাড়ালে আলো হয়। সেই আলোই আবার তাপ দিতে পারে। সূর্যের তাপে বিদ্যুৎ হতে পারে। সেই বিদ্যুৎ শক্তিতে এমন জিনিস গড়া যেতে পারে, তার কার্যকারিতা অমর হয়ে যেতে পারে। তাই কোন কিছুতে সীমা না টেনে তার অন্ত চলার পথ খুঁজতে হবে। তাদের

চিন্তাধারা আপেক্ষিকতার পথে ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরিকে ঘোলাটে করে দিচ্ছে। একটার সঙ্গে আর একটার পার্থক্য ঘটালে বিজ্ঞান একস্থানে মিলতে পারবে না।

দুই আর তিনের পার্থক্য হল এক। অর্থাৎ দুই অপেক্ষা তিনের শ্রেষ্ঠত্ব এক। এই এক দুটি সংখ্যাকে কিন্তু এক করল না। এক করতে হলে যোগে এসে বলতে হবে দুই আর তিন মিলে পাঁচ। এই পাঁচের মালিক যদি আমি হই, তবে পাঁচ আমাতে এসে এক হল। আপেক্ষিক বড় ছোট করতে গিয়ে তিন থেকে দুইকে বাদ দিয়ে অংশকে পূর্ণ বলতে পারি না। আপেক্ষিকতা অংশের জন্য সত্য কথা বলে। পূর্ণের জন্য চিন্তা করে না বলেই উত্তরাধিকার সূত্রে বিজ্ঞান মার খেয়ে যাচ্ছে। দু টাকা + তিন টাকা নিয়ে আমি পাঁচ টাকার মালিক। আমি এখানে যোগ চিহ্ন। পাঁচ টাকা থেকে দুটাকা খরচ করলে আমি বিয়োগ চিহ্ন। আমার কাছে তিন টাকা যোগ থাকলেও বিয়োগ চিহ্ন। আমি যে দুটাকা হারিয়ে মূলধন ভাগ করে ফেলেছি। আমি তার একভাগে থেকে ইউনিফায়েডের অধিকার রাখতে পারি না। এক ব্রহ্মে যেতে পারি না।

আইনস্টাইন যদি ধর্ম নিয়ে একটু মাথা ঘামাতেন তবে তিনি হয়তো সেণ্টারিজমে আসতে পারতেন। ধর্মের অন্ধতাকে আমিও মানি না। ধর্মও বিজ্ঞানের পথে ইউনিফায়েডে যেতে চায় নি। এই দুয়ের সমঝোতার অভাবে কেউ একে যাওয়ার পথ খুঁজে পায়নি। দুয়ের মধ্যে আপেক্ষিকতার চিন্তা ছিল বলেই ধর্ম ও বিজ্ঞান দুই তরফই বঞ্চিত। দুই তরফ একের কথা চিন্তা করে দুটি এক সৃষ্টি করেছে। অখণ্ডের মধ্যে দুই অখণ্ডতা ভাবতে গিয়ে তাকে কেটে খণ্ড করে মারতে হয়েছে। এই মৃত্যুই আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে এসেছি। তিনি যদি পঞ্চাশের দশকে কলকাতায় এসে সত্যেন বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তবে সেণ্টারিজমের কথা শুনতে পেতেন। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একবার আলোচনা করি। তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার কথা 'সেণ্টারিজমে ধর্ম বিজ্ঞান দলহীন গণতন্ত্র' পুস্তকে বিস্তারিত বলেছি।

বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানের অধিকারে ছিল, তখনও সেখানকার সরকারকে সেণ্টারিজমের কথা জানানো হয়। তারপরই সালাম পাক-রাষ্ট্রপতির বিজ্ঞান বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টা হন। তিনি এক সেণ্টারিজমের একটা অংশের কথা বলে ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্টিভেন ভিনবার্গ ও গ্লাশো। এই পুরস্কার পেয়ে গ্লাশো বলেছিলেন, নোবেল কমিটি আমাদের এই পুরস্কার দিয়ে খানিকটা ঝুঁকিই নিয়েছে। নোবেল কমিটির অন্যতম সদস্য

নেংগট নাগেল বলেন, দশ বিশ বছরে হয়তো তত্ত্বটাই ভিত্তিহীন হয়ে পড়বে। তবে কেন তাঁদের পুরস্কার দেওয়া হল? আরও মজার কথা, ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত বর্তমান লেখকের 'রত্নাকরের প্রেম' আমেরিকান লাইব্রেরী কংগ্রেসে ছিল, যাতে ঐ বিষয়ে আলোচনা ছিল। আরও সব জানতে হলে পড়তে হবে 'কেন্দ্রায়ণে সমগ্র বিজ্ঞান' পুস্তকখানা।

এই পুরস্কার প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন, পরমাণুর উইক ফোর্স, স্ট্রং ফোর্স আবিষ্কারের ফলে আইনস্টাইনের ইউনিফয়েড ফিল্ড থিওরিকে খানিকটা এগিয়ে দেওয়া গেল। এই একপেশে আবিষ্কারে একে আসা যাবে না। তাঁরা আইন-স্টাইনের কথা বললেও সেন্ট্রিজমে আসতেই হবে। তাঁরা সেখানে যত তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন ততই মঙ্গল।

সাদা রজনীগন্ধা ফুল রং শোষণ করে। গায়ে লাগানো রঙ ধুয়ে ফেলা গেলেও যে রঙ সে শোষণ করে তা ধুয়ে ফেলা যায় না। তাই বলে কি আসলে রজনীগন্ধাকে সেই রঙের ফুল বলা হবে? মূলে সে সাদাই। ২+৩ পাঁচ হয়। এই যুক্ত চিহ্নকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে আমি বসে দুদিকে চাইলে কি দেখতে পাব? একদিকে দেখব দুই আর একদিকে দেখব তিন। চলন্ত ট্রেনে বসে তেমনি একদিকে দেখা গেল চলন্ত মাটি, অপর দিকে দেখা গেল চলন্ত ট্রেন। তাতে আপেক্ষিকতা প্রমাণ হলেও একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রমাণ হচ্ছে না। মানব কল্যাণে তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের প্রয়োজন নাই দেখে তাব জন্য আইনস্টাইন ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কার পাননি। পেয়েছিলেন অন্য গবেষণায়। ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট এবং তার প্রয়োজনীয়তার জন্য। তবে সালাম কেন পেলেন?

আমাদের সব সময় কেন্দ্র থেকে চিন্তা করে উঠতে হবে। চিন্তা করতে হবে স্ট্রং ফোর্স পরমাণু কেন্দ্রে যাচ্ছে কতটুকু, উইক ফোর্স সে ছাড়ছে কতটুকু। স্ট্রং ফোর্স পরমাণুতে যাওয়ার সময় ছাঁকা হয়ে যাচ্ছে বলেই আপেক্ষিক মোটা অংশ বাইরে থেকে আরও আসা ফোর্সের সঙ্গে জটলা করতে থাকে। ফলে তাদের আরও দুর্বল অংশ পরমাণু কেন্দ্রে দুর্বল ফোর্স সৃষ্টি করতে চলে যায়। বারবার এই ছাঁকা ফোর্স নেওয়ার দরুণ তার ছাড়তে হচ্ছে পাওয়া উইক ফোর্স। তার জন্য ইলেকট্রন ঘুরছে। এই অবস্থায় পরমাণুকে ভাঙলে ইলেকট্রন ঘোরার মুখে প্রচণ্ড আঘাত খায়। এই আঘাতে তার যে প্রচণ্ড গতি হয় তা কয়েক লক্ষ গুণ বেশি। গতির মুখে ঘা খাওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আসা উইক ফোর্স স্ট্রং ফোর্সকেও পরাস্ত করে ছুটতে থাকে। সেই ফোর্সের কাছে বাইরের

চাপও আপেক্ষিক শূন্য হয়ে যায়। আপেক্ষিক শূন্যতা তখন সেই গতিকে আরও বাড়াতে চুম্বকত্ব প্রয়োগ করতে থাকে।

এই চলার শক্তি ও চুম্বকত্ব ট্রান্সমিটার ও রিসিভারের চরিত্র পায়। শরীরে যেমন শিরা-উপশিরা আছে, আবহাওয়ায় তো তা নাই। তাই ট্রান্সমিটার ও রিসিভারের আকর্ষণ বিকর্ষণের ফলে আকাশে অদৃশ্য শিরা-উপশিরা সৃষ্টি হয়। কোন হাল্কা বস্তু জলে ডুবিয়ে ছেড়ে দিলে ভেসে ওঠার কারণ ঐ রকমই। নিচের ঠেলায় ও উপরের আপেক্ষিক শূন্যতায় পথ সৃষ্টি করে হাল্কা বস্তু ভেসে ওঠে। আকাশ ও জল কঠিন বস্তু নয় বলে পথ আবার জোড়া লেগে যায় কাজ শেষ হয়ে গেলে।

হাইড্রোজেন উপরে ওঠে পৃথিবীর আকাশে তার উপযোগী রাস্তা থাকার জন্য। অন্যের কাছে আকাশ পথহীন হলেও তার কাছে পথহীন নয়। মানুষের কাছে যেমন পথ চলা সোজা, হাইড্রোজেনের কাছে তেমনি পথ চলা সোজা, কারণ তার পথ তৈরি করা আছে স্বাভাবিক ধারার মধ্যে। বস্তুর কাঠিন্য তরলতা ইত্যাদিও আপেক্ষিক অন্যান্যের কাছে। সেখানে তাদের পক্ষে শূন্যতার আকর্ষণ ও পূর্ণতার বিকর্ষণ তৈরি হয়ে আছে। আপেক্ষিকতার জন্য সে পথ সবার উপযোগী নয়। পথ হতে হলে কঠিন পদার্থ হওয়া চাই। জল তরল হলেও তার পরমাণু তরল নয় তাই তাদের অনুযায়ী পথ আছে।

দুই

আইনস্টাইনের বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন সে একবার অসুস্থ হয়ে বিছানায় ছটফট করছিল। তাই তার বাবা তাকে শান্ত করবার জন্য খেলনা হিসেবে একটা নৌ-কম্পাস কিনে দেন। সেই কম্পাস পেয়ে ছেলেটার রোগের ছটফটানি কমে গেল। কিন্তু তার পরিবর্তে বেড়ে গেল কৌতুহল মেটানোর ছটফটানি।

এবারও বাবা ভয় পেয়ে গেলেন। ছেলের অসুখ কি আরও বেড়ে গেল? তিনি লক্ষ্য করতে লাগলেন, সে কখনও শুয়ে কখনও বসে নানা ভাবে কম্পাসটি দেখছে। তার কাঁটা যত নড়াচড়া করে তার শরীর নড়াচড়া করে তার চেয়েও বেশি। মনও নড়াচড়া করে আরও অনেক গুণ বেশি। সব ছেলেরই এমনি চাঞ্চল্য থাকে কৌতুহলের জন্য। এই কৌতুহল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কারো খেলার

দিকে যায়, কারো সাহিত্যের দিকে যায়, কারো বিজ্ঞানের দিকে যায় ইত্যাদি। এই ছেলেটির গেল বিজ্ঞানের দিকে মন। সেই বিজ্ঞানের প্রথম হাতে খড়ি হল এই কম্পাস দেখার মধ্য দিয়ে।

তিনি কম্পাসকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন কিন্তু বারবারই তার কাঁটার এক মুখ থাকে দক্ষিণ মেরুর দিকে অন্য মুখ থাকে উত্তর মেরুর দিকে। কম্পাসের কাঁটার নির্দেশ মত পৃথিবীর উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুকে দেখলেও পৃথিবী কিন্তু নিজের অক্ষে এবং কক্ষে পুরো ঘুরছে। দুই মেরুর সীমা থাকলেও পৃথিবীর ঘোরার বিরতি নাই, সীমা নাই। পৃথিবী গোলাকার বলে তার বেড়েরও সীমা নাই। গোলাকার বস্তু তাই সীমার মধ্যে অসীম।

কোন কিছু শুরু হয় একটা শেষ বা সীমা থেকে। সৃষ্টিও হয় সীমা থেকে। সমাজে শোষণ চরম সীমায় গেলে বিপ্লব হয়। তার পরেই নূতনের সৃষ্টি। তবু এই সৃষ্টিকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে শোষণ না করে পরস্পরের সহযোগিতায় বাঁচতে হবে। গরুর দুধ বেশি দুয়ে নিয়ে বাছুরকে খেতে না দিয়ে মারলে তাকে শোষণ বলে। এইভাবে গো-বংশ ধ্বংশ হলে গোয়ালা গরুর থেকে বাঁচার সহযোগিতা পাবে কোথায়? তাই বাঁচার শৃঙ্খল সৃষ্টি করতে হবে। গোরু গোয়ালাকে বাঁচাবে, গোয়ালা গোরুকে বাঁচাবে। এই ভাবেই সমাজ স্থায়ী হয়। এই ভাবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্থায়ী হয়েছে।

সেন্টারিজম ছাড়া একাধিপত্য কারো নাই। হাইড্রোজেন বেলুন মাধ্যাকর্ষণকে উপেক্ষা করে উপরে ওঠে নিচের ভারী হাওয়া-জনিত উপরের আপেক্ষিক শূন্যতার চৌম্বকত্বে। জল নিচের দিকে পড়ে হাইড্রোজেনের চেয়ে ভারী, এমন কি বায়ুর চেয়ে ভারী হওয়ার জন্য এবং পৃথিবীর চৌম্বকত্বের জন্য। এই জলকেও শূন্যে ধরে রাখা যায়। যাঁরা চিনির সরবৎ বিক্রী করা দেখেছেন, তাঁরা এটাও দেখেছেন পিচকারীর মত একটা পাইপ সরবতের পাত্রে ডুবিয়ে দিয়ে উপরের ছ্যাদায় হাওয়া ঢুকতে না দেওয়ার জন্য আঙুল বন্ধ করে সরবৎ তোলে। তাছাড়া পিচকারীতে জল তোলা সবাই দেখেছেন। সেখানে বায়ুশূন্যতাই জল তুলল মাধ্যাকর্ষণকে হার মানিয়ে। সেই পিচকারীতে চাপ দিলে জল এমন বেগে পড়ল যে মাধ্যাকর্ষণ তত বেগে জল টেনে নিতে পারত না।

পৃথিবীর বুকের মাধ্যাকর্ষণ জলকে টানে আবার জলের বাষ্পকে ধরে রাখতে না পেরে ছেড়ে দেয়। মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে তা হলে একটা শূন্য শক্তি কাজ করছে, বায়ুর মধ্যে যে বাষ্পকে, হাইড্রোজেন বেলুনকে ঊর্ধ্বে তুলে দেয়। বাষ্প

না হয় অল্প সূক্ষ্ম কণিকার জন্য বায়ু ও মাধ্যাকর্ষণের ফাঁক দিয়ে পথ করে দিল। তাছাড়া যে কোন শক্তি তীব্রতা অনুসারে পেছনের দিকে একটা বিপরীত বেগ রেখে যায়। তার জন্য বাষ্পকণা (অন্যান্য সাহায্য সহ) মাধ্যাকর্ষণকে ভেদ করেছে। কিন্তু অত বড় হাইড্রোজেন বেলুন হাল্কা হলেও কি করে ঐ সূক্ষ্ম পথ ধরে উঠল ?

সেন্টারিজমে বলা হয়েছে, আকর্ষণ বিকর্ষণের জন্য সব শক্তিই মিশ্র-শক্তি তাদের চরিত্রও মিশ্র-চরিত্র। হাওয়াও মিশ্র-শক্তির মিশ্র-চরিত্র প্রকাশ করে একই হাওয়া পথ পেলে ঘরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বেরিয়ে যায় বাইরে। এই প্রবাহিত হাওয়া ঘরের কোণে প্রবাহিত হয় না। হাইড্রোজেন বেলুন সূক্ষ্ম পথে আকাশে উঠতে না পারলেও ঘরের কোণের হাওয়ার মত সূক্ষ্ম পরিবেশের আবহাওয়ার সাহায্যে উপরে ওঠে। সে হাওয়ার চেয়ে হাল্কা বলেই পেছনের হাওয়া আঘাত করছে এমন ভাবে যে, বেলুনের উপর দিকের আপেক্ষিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে তাকে আকর্ষণ করছে। গ্যাস উত্তপ্ত বলে বাইরের হাওয়ার চাপে উপরে উঠছে। তার তাপ উপরমুখী হয়ে শূন্যতা সৃষ্টি করায় উপরে ওঠার চৌম্বকত্বও পাচ্ছে। হাওয়া কোথায় যাবে সব সময় হাওয়ার উপর নির্ভর করে না। স্থানের উপরেও নির্ভর করে। তাই হাওয়া ঘরের কোণে প্রবাহিত হয় না পূর্বে বলা হয়েছে।

শূন্যতার নিরপেক্ষতা আছে। সেখানে কিছু ছেড়ে দিলে সে কোন কিনারায় নিয়ে যাবে না। কারণ অন্য কিনারাকে বঞ্চিত করতে হবে। তাকে কোথায় আনলে নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে ? সে তাকে নিয়ে আসবে শূন্যতার সেন্টারে। এই জন্য গ্রহ উপগ্রহদের সেন্টারের এত গুরুত্ব। এই সেন্টারই তাই বস্তু ও শূন্যের ধারক ও বাহক। সেন্টারের পুরুষ হচ্ছে বস্তু, প্রকৃতি হচ্ছে শূন্য। স্ত্রী যদি পুরুষকে ঘরে না টানত তবে সংসারের কথা চিন্তা করা যেত না। পুরুষের বীর্য ও বস্তু সে আকর্ষণ করে সংসার গড়ে। সেই সংসারকে পুরুষ বাইরের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে ও সামগ্রী এনে দেয়।

এই শূন্যতাই আকাশে বেতার তরঙ্গ, আলোক তরঙ্গ চালায়। সে-ই আবার জীবের শরীরে রক্ত প্রবাহ বজায় রেখেছে। শূন্যতার চুম্বনে বস্তুতে যখন যন্ত্রের মত সাড়া জাগল, তখনই জেগে উঠল জীবনের সৃষ্টির ভবিষ্যৎ। অবশ্য বস্তুতে সাড়া জাগবার আগে আকাশে-বাতাসে দাপাদাপি চলেছিল। সেই দাপাদাপিই তো ক্রমে যন্ত্র ভাব থেকে জীবন ভাবকে আনল। সেই যন্ত্র জীবনে যন্ত্রণা আনল। বস্তু পুরুষকে তো শূন্য প্রকৃতি পূর্বেই জেনেছে

বসিয়ে ছিল। এখন প্রকৃতি জীবের শরীরে রক্ত প্রবাহ চালায়। এই প্রবাহ বারবার চলার আঘাতে শরীরের মধ্যে শিরা-উপশিরার সৃষ্টি হয়েছে। সেই শিরা-উপশিরায় আজ চলছে রক্ত। তখন তা ছিল না। তখন শূন্যতা যশে জল বা অন্য তরল চলাফেরা করত। আজ নাড়ির দেওয়ালে কোটিং পড়তে পড়তে নানা রোগ সৃষ্টি করছে, তেমনি জীব সৃষ্টির সময় বস্তুর মধ্যে তরল চলতে চলতে চলার পথে কোটিং ফেলে শিরা-উপশিরা সৃষ্টি করেছিল।

নিশ্ছিদ্র কৌটা থেকে বায়ু বের করে নিলে কৌটার মুখ আর খোলা সহজ হয় না। এখানে দুটি কারণ কাজ করছে। এক হল বায়ুর পতন শক্তি, দুই হল বায়ুর শূন্যতার আকর্ষণ শক্তি। কৌটায় বায়ু ভরা থাকলে বায়ুর পতন শক্তি কাজ করত না, কারণ কৌটার মধ্যের বায়ু সে পতন রুখছে ঊর্ধ্বমুখী ঠেলা দিয়ে। কৌটার বাইরের বায়ুর ওজন তো আছেই সামঞ্জস্য রাখতে। এই বায়ুতে যদি শুধু মাধ্যাকর্ষণের চাপ থাকত, তবে কৌটার ঢাকনা ভারী হত বেশি। ভেতরের হাওয়া অতটা ভারী হত না কৌটার তলা আবৃত বলে। উপর নিচে পাশে সবদিকে সমান প্রবাহ বলে স্বাভাবিক ভাবে ঢাকনা খোলা যায়। লাগানো যায়।

বায়ুহীন কৌটায় তিনটি শক্তি কাজ করছে। বায়ুহীনতার আকর্ষণ, বায়ুর ওজন ও বায়ুর পতন শক্তি। একটা ঢিলের ওজন মাথায় রাখা যায়, কিন্তু তাতে মাথা ফাটে না। সেই ঢিল উপর থেকে মাথায় পড়লে ওজন শক্তির সঙ্গে পতন শক্তি পেয়ে মাথা ফাটিয়ে দেবে। এখন কথা হচ্ছে, শূন্যতার আকর্ষণ না হলে যদি জগতের সবকিছু অচল হয়ে যায়, তবে মাথা কি ঢিলটাকে আকর্ষণ করল? তাও না, তবু এখানে শূন্যতার আকর্ষণ কাজ করছে। ঢিলটার উপর থেকে পড়ার যে পতন শক্তি ছিল, সেই শক্তির তুলনায় আবহাওয়ার বাঁধা কিছুটা শূন্য ছিল। সেই শূন্যতাই মাথার দিকে ঢিলটাকে আকর্ষণ করেছে। ঢিলটার পথে যদি শক্তি বাঁধা থাকত, তবে তার কাছে ঢিলের ওজন ও পতনশক্তি শূন্য হয়ে যেত। তখন সেই শূন্যতাই ঢিলটাকে আকর্ষণ করত। ঢিলটা সেই বাধায় ধা খেয়ে পেছনের দিকে ছুটে আসত। তখন সেই বাধা পাওয়া শক্তির কাছে ঢিলের ফিরে আসা শূন্যতা হত।

একটা দাঁড়িপাল্লার এক কেজি মাল মাপা অবস্থায় কেজিটাকে যদি আলতো ভাবে ধরে উচু করতে থাকা যায়, তবে মালের দিক নামতে থাকবে। এখানে বায়ুর ভূমিকা নাই, কিন্তু শূন্যতার আকর্ষণের ভূমিকা আছে। মালের পতনশক্তি কেজির নিচে শূন্যতা সৃষ্টি করছে বলে মালের দিক নেমে গেল। কেজির দিকে তার

উল্টো হল। কেজি তুলে ধরার জন্য উপরে শূন্যতা সৃষ্টি করা হয়েছে, নিচে উত্থান। এখানেও বায়ুর ভূমিকা নাই। কারণ বায়ু সর্বত্র সমান। সর্বত্র সমতায় কোন সৃষ্টি হয় না। কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণের অসমতায় ডাইনামো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছে শূন্যতার আকর্ষণ ও পূর্ণতার বিকর্ষণ দিয়ে। মুখ খোলা কৌটার ভেতরে বাইরে সমান বায়ু। তাই কৌটার খোল ও মুখ দুটি আলাদা আলাদা বস্তু ছিল। সেই দুটি দিয়ে কৌটা খোলা ও লাগানো যেত। যখন বায়ুশূন্য হল তখন কৌটার ভেতরে ও বাইরে অসাম্য থাকায় কৌটার খোল ও ঢাকনা আলাদা আলাদা থাকল না। ভেতরের শূন্যতার আকর্ষণে ও বাইরের বায়ুর পতনের জোরে কৌটা একটা বস্তু হয়ে গেল। বস্তু সৃষ্টির এইটাই মূল সূত্র। কেন্দ্রভিত্তিক এই গুণে বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি। পুরো কৌটাটা শূন্য থাকায় কৌটা হল কেন্দ্র, তাই তার শূন্যতার আকর্ষণ আছে। বাহির হল তার আকর্ষণ যোগ্য বস্তু। কিন্তু কৌটার বদ্ধতায় যোগাযোগের অভাবে সৃষ্টিসম্ভব হচ্ছে না। সূর্যের কেন্দ্রে বা পৃথিবীর কেন্দ্রে তা সম্ভব হচ্ছে বলেই সৃষ্টি হচ্ছে। অবশ্য কৌটা খুলে দিলে সৃষ্টি হবে না। কারণ তখন ভেতরের বায়ু বাইরের বায়ু সমান হয়ে যাবে। কৌটায় সৃষ্টি দিতে হলে সূর্য পৃথিবী বাইরের আকর্ষণ বিকর্ষণের যে পরিবেশে আছে, সেই পরিবেশে কৌটাকে রাখতে হবে।

এত ঘটনার মধ্যে দেখা গেল। ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি সার্থক করতে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা প্রয়োজন হয় না। কেন্দ্রবাদই তাকে সার্থক করতে পারে। চলন্ত ট্রেনে বসে তিনি যে আপেক্ষিকতা খোঁজার কথা বলেছেন, ট্রেনে বসে যিনি দেখবেন তিনি নিজেই তো একটা চলন্ত কেন্দ্র। তিনি পায়ের দিকে চেয়ে দেখলেন, তিনি স্থিরই আছেন। জগতে যারই স্থিরতা থাক, সেই হচ্ছে কেন্দ্র। কারণ তাকে ধরেই সমস্ত কিছুর হিসাব পাওয়া যায়। দিগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ধ্রুব তারকা. কম্পাস কেন্দ্র। সূর্যের অত চাঞ্চল্যময় ব্যাপ্তির মধ্যে তার কেন্দ্রই স্থির। তার কেন্দ্রে আলোর চাঞ্চল্য নেই, তবু সে বাইরে তা প্রকাশ করছে। সূর্যের আলোর কাছে প্রদীপের আলো কিছুই না। তার ফোর্স প্রদীপের আলোর ফোর্সকে ঢেকে রাখে। সেখানে কেমন করে বই পড়া আলোর সঙ্গে নক্ষত্রের আলোর তুলনা করলেন আইনস্টাইন? তিনি আবার বলেছেন, সবকিছুর তুলনা আছে, কিন্তু আলোর তুলনা নেই। তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে আলো বাদ যাওয়ায় সে তত্ত্ব ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরিকে নস্যাৎ করবেই। একটা হাজার পাওয়ারের বাল্ব

বহুদূর আলো ছড়াতে পারে, একটা প্রদীপ কি তাই পারে? জোরের বেলাতে এত পার্থক্য সেখানে প্রতি এক রূপ কি করে। একটা প্রিজমে একদিকে একই জোরের মত তিনই ছোড়া হোক এক স্থানে পড়বে। শক্তির পরিবর্তন ঘটলে আলাদা স্থানে পড়বে। তেমনি আলোর উৎস যদি দুর্বল সবল হয়, তবে তাদের আলোক শক্তি সমান হবে কেমন করে? আইনস্টাইনের মতে আলো যদি সর্বত্রগামী হয়, তবে বই পড়ার আলো কি সূর্যকে আলোকিত করতে পারে? আলো পরমাণুর স্তর অতিক্রম করায় সে বস্তু নয়, তাপ পারের শক্তি। কোন বস্তুর গতির সঙ্গে তার তুলনা করার কথা ওঠে না। সেখানে তাঁর কথা ঠিক। তবে তেজী আলোর সঙ্গে মৃদু আলোর আপেক্ষিকতা মাপা যেতে পারে। আলো যদি কণার সংখ্যায় চলে তবে গতি এক হতে পারে, কিন্তু আলো চলে কণার সংযোগে সৃষ্ট পরিমাণ হয়ে। আলোর ছড়িয়ে যাওয়া কণারা দূরের পথে হারিয়ে যায়, টর্চের সজ্ঘবদ্ধ আলো দূরে যেতে পারে।

লোহাতে হাতুড়ি পিটালে যে আলো হয়, সে আলোর সঙ্গে সাধারণ আলোর মূলত পার্থক্য নাই। দুটোই সংঘর্ষজনিত আলো। একটা আলোর সৃষ্টি হল লোহা ও হাতুড়ির সংঘর্ষে, যা তেলের অভাবে স্থায়ী হতে পারল না। অপর আলোটি হল অক্সিজেনের সংঘর্ষে, তা তেলের জন্য স্থায়ী হল। আলোতে তেল শক্তি যোগালেও, অক্সিজেনহীন স্থানে সংঘর্ষের অভাবে আলো জ্বলবে না। ইলেকট্রিক বাল্বে অক্সিজেন ছাড়া আলো জ্বলার কারণ পাওয়ার হাউস থেকে তারের পথে অবিরাম শক্তি এসে বাল্বের মধ্যে নিভে যাচ্ছে। শুধু তার ধারার জন্য আলো দেখি। প্রদীপের আলো অক্সিজেনের সংঘর্ষে বাইরে জ্বললেও অক্সিজেনহীন বাল্বের মধ্যে জ্বলবে না। এখানে আলোর পার্থক্য আছে। যেমন হাইড্রোজেন জ্বলা আলোর সঙ্গে সাধারণ আলোর পার্থক্য আছে। সাধারণ আলোতে দেশলাই কাঠি ধরিয়ে তার দ্বারা হাইড্রোজেন জেলে কাঠি নিভিয়ে দিলে, সেই কাঠি আবার হাইড্রোজেনের আগুনে জ্বলবে না অক্সিজেনের অভাবে।

আলোর উৎস থেকে আলোর একরকম গতিশক্তি, আলো ধাক্কা খেয়ে প্রতিফলিত হলে আর একরকম গতিশক্তি। তার কণিকাদের পরিবর্তনে আলোর উজ্জ্বলতার পরিবর্তন হয়। গতিরও পরিবর্তন হতে বাধ্য। এই আলো চলে আপেক্ষিক অন্ধকারে। তাই নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে এলেও, বই পড়ার আলো নক্ষত্রের পথে গতি হারাবে আপেক্ষিক বেশি উজ্জ্বলতার পরাক্রমে। এই শক্তির অসমতার জন্য প্রত্যেকের নিজের নিজের চরিত্র গড়ে ওঠে। একটা

হাইড্রোজেন বেলুন জলে ডুবিয়ে ছেড়ে দিলে, যে শক্তিতে জল ভেদ করে উঠবে, সেই শক্তিতে আকাশের বাতাস ভেদ করে উঠতে পারবে না। আবার এই গুঠা একস্থানে বদ্ধ হলে পাশে সরতে আরম্ভ করবে। এখানে জল ও বাতাসের দুই চরিত্র হওয়ায়, একই বেলুন দুই চরিত্র পেল। তারপর আকাশে বেশি দূর উঠতে না পেরে একটা স্তরে স্থায়ী চরিত্র পেল। এমনি স্থায়ী চরিত্রে এসে গ্রহ উপগ্রহরাও ঘুরছে। মাধ্যাকর্ষণ থাকতেও জলের একরকম চরিত্র, হাওয়ার আর একরকম চরিত্র। তবু তারা পৃথিবীর নিয়ম মেনে চলছে। পিতার চরিত্রের কাছে পুত্র অলস হলেও, পুত্রের একটা চরিত্র থাকে। তার কাছেও তার পুত্র অলস মনে হবে। তাদের মধ্যে এই পার্থক্য থাকলেও প্রত্যেকের কিন্তু একই কেন্দ্রিক চরিত্র। সেই কেন্দ্রকে ধরে সবাইকে একত্রিত করা যায়। পিতার কাছে পুত্র অলস কেন, পুত্রের কাছে পিতা সব সময় যান্ত্র নয় কেন তা তাদের মধ্যে তুলনা করলেই ধরা পড়বে।

পুত্রের চরিত্র জানতে হলে পিতার কেন্দ্রিক-চরিত্রের সঙ্গে পুত্রের কেন্দ্রিক-চরিত্র জানতে হবে। তারপর জানতে হবে তার সামাজিক চরিত্রকে। পরে তার নিজস্ব সৃষ্টির চরিত্রকে। সবার মধ্যে যখন কেন্দ্র আছে, তখন নিজের চরিত্রকে জানলে সব চরিত্রকে অল্প-বিস্তর জানা যাবে। গ্রহ নক্ষত্রদের চরিত্র তাই পৃথিবীর কেন্দ্রের চরিত্র জানলে বোঝা যাবে। কেন্দ্রই সবার সব চেয়ে আপন মাপকাঠি।

আইনস্টাইন বলেছেন, গ্রহরা অলস হওয়ার ফলে সবচেয়ে কম বাধার পথে চলা ফেরা করে। এই মহাবিশ্বের অদৃশ্য পাহাড় পর্বত ও খাত তারা পার হয়ে যায় সুবিধা মত। পথে পাহাড় থাকলে তাকে আবর্তন করে এগোয়, খাত থাকলে তার নিচে নেমে পথ অনুসরণ করে। পথ এই ভাবেই চলা সুবিধাজনক। এই কারণে গ্রহরা যদি অলস হয়, তবে সূর্য এবং উপগ্রহরাও তাদের চলার পথে অলস। একটা বুদ্ধিমান কর্মিৎকর্মা লোকও অলস। কর্মিৎকর্মারা সুবিধাজনক পথ ছাড়া ঘুর পথে যায় না। ঘুর পথে যেতে কেউ বাধ্য করলে ঘুর পথে যাবে। আইনস্টাইন মহাকর্ষ তত্ত্বে দেখিয়েছেন আলো সোজা পথে চললেও প্রয়োজনে বেঁকে যায়। তা প্রমাণিত হয়েছিল সূর্যগ্রহণের সময়।

আলো সব সময় বিচ্ছুরিত হয়, অন্ধকার সব সময় আবদ্ধ হয়। রাত্রে ইলেকট্রিক ট্রেনে চলবার সময় দেখা যায় অনতিদূরের একটা ইলেকট্রিক ট্রেনের তারে বিপরীত দিক থেকে আলো এসে পড়লে বিদ্যুতের আলো দেখা যায়।

তারের সেই আলো বিপরীত দিকে বেশি প্রতিফলিত বলে মনে হয় অনেক দূরে জলছে। আবার সেই তারেরই অন্ধকার অংশকে মনে হবে অনেক কাছে অবস্থান করছে। অন্ধকার আমাদের আচ্ছন্ন করে। আলো আমাদের দৃষ্টিকে দূরে টানে। কোন বস্তুতে আলো পড়লে সেই আলো আমাদের চোখে পড়ে বলে আমাদের ধারণা। আমরা বস্তুকে দেখি বললেও আসলে দেখি কিন্তু আমরা আপেক্ষিক উজ্জ্বল আলোককে। আলো আমাদের দৃষ্টিকে টানে। সেই আলো কিছুতে বাধা পেলে, সেই বস্তুটাকে দেখি। এই বস্তু দেখায় মন কাজ করছে বলেই বস্তুকে দেখি। নইলে আমরা আলোককে দেখি। আলোকে দেখি বলেই সেই আলোর গতি ইলেকট্রিক তারকে দূরে নিয়ে গেল যেন, অনেক দূরে।

আবার যদি আমাদের দিক থেকে ঐ তারে আলো ফেলা যায়, তার সরাসরি প্রতিফলনে দেখা যাবে তারের আলো ঠিক স্থানেই আছে। অন্ধকার দিকের তারটাকে মনে হবে পূর্বের তুলনায় একটু যেন দূরে চলে গিয়েছে। তারের প্রতিফলিত আলো সরাসরি আমাদের কাছে এল বলেই তারকে কাছে মনে হল। অন্ধকার দিকের তার পূর্বের তুলনায় কিছুটা বেশি আলো পেয়েছে বলে দূরে মনে হল। সামনা-সামনি প্রতিফলনের জন্য তাই পূর্ণিমার চাঁদকে কাছে দেখি এবং আংশিক চাঁদকে দূরে দেখি।

এমনি নানা ভাবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে দেখলেও আমরা প্রতি বছর একই সময়ে একই স্থানে দাঁড়িয়ে আমরা একই নক্ষত্র দেখি। এর থেকে প্রমাণিত হয় তারকা মণ্ডলে আমরা হেরফের দেখলেও তাদের মধ্যে দূরত্ব প্রায় সমানই রয়েছে। প্রায় কথাটা এই জন্য ব্যবহার করলাম যে চলমান ব্রহ্মাণ্ডে সবারই ক্ষয় অথবা পূরণ হচ্ছে কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণে।

তা ছাড়া আইনস্টাইন বলেছেন, অনেক সময় মনে হয় নক্ষত্রগুলি স্থান পরিবর্তন করেছে। আসলে নক্ষত্রগুলি স্থান পরিবর্তন করে না। তাদের আলো যখন পৃথিবীর দিকে আসতে থাকে, তখন সূর্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ মহাকর্ষ ক্ষেত্রের প্রভাবে বেঁকে যায় মাত্র। তার জন্য নক্ষত্রের স্থান পরিবর্তন মনে হয়। বাঁকার আরও একটা কারণ আছে। আলোক শক্তি বেরিয়ে আসার মুখে বিরোধী ধারায় বাধা পায়।

নক্ষত্র স্থান পরিবর্তন করে না। আইনস্টাইনের এই সত্য কথাটা ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর পরে দাঁড়িয়ে মিথ্যা মনে হবে। নক্ষত্র স্থান পরিবর্তন করে এটা স্থানীয় সত্য। যেমন সত্য দেখেছিলেন তিনি চলমান ট্রেনে বসে আপেক্ষিকতা বাদকে প্রমাণ করতে।

তিন

১৯৩০ সালের ২রা ডিসেম্বর রেডস্টার যাত্রীবাহী জাহাজ বেলগেনল্যাণ্ড যোগে আইনস্টাইন আমেরিকায় যাত্রা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী এলসা এবং তাঁর একজন বন্ধু গণিত বিশেষজ্ঞ ডঃ মেয়ার। তাঁর বাড়ি অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত ভিয়েনায়। তাঁর সঙ্গে আইনস্টাইন সেই জাহাজের নির্দিষ্ট কেবিনে বসে গণিত চর্চা করতেন।

বেলগেনল্যাণ্ড যখন নিউইয়র্ক শহরের নর্থ নদীর ৬০ নম্বর জেটিতে ল্যাণ্ড করবে, তখন তাঁদের গণিত চর্চা মাথায় উঠে গেল। ৬০ নম্বর জেটিতে তখন তুলকালাম কাণ্ড। দর্শক, সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফাররা আইনস্টাইনকে দেখার জন্য হৈ চৈ আরম্ভ করে দিয়েছে। জেটিতে জাহাজ থামতেই সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফাররা দ্রুত পায়ে আইনস্টাইনের কেবিনের দিকে ছুটে গেলেন। তাদের আগ্রহের বন্যা থেকে স্বামীকে বাঁচানোর জন্য এলসা তাঁকে আগলে দাঁড়ালেন। তাদের সঙ্গে স্বামী ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন না বলে তিনি ইংরেজিতে তাঁর হয়ে কথা বলতে লাগলেন।

একটা মার্কিন প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতি সমেত ঘোষক ও যন্ত্রবিদকে পাঠাল, যাতে আইনস্টাইনের কেবিনে মাইক্রোফোন লাগিয়ে অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তর প্রচার করা যায়। সেখানে এলসা স্বামীর কাছে দাঁড়িয়ে দোভাষীর কাজ করতে লাগলেন।

একজন প্রশ্ন করলেন চতুর্থমাত্রা কি এক কথায় ব্যাখ্যা করুন।

আইনস্টাইন উত্তর দিলেন, এ প্রশ্ন আপনার আধ্যাত্মবাদীকে করতে হবে।

আর একজন দাবী করলেন, একটিমাত্র কথায় আপেক্ষিকতাবাদ বর্ণনা করুন।

তিনি উত্তরে বললেন, একটা জলন্ত স্টোভের উপর মাত্র এক সেকেণ্ড বসলে মনে হবে অনন্তকাল। এবং ছলনাময়ী একটা রূপসী নারীর সঙ্গে এক ঘণ্টা কাটালেও মনে হয় এক মুহূর্ত। স্থান কাল পাত্র ভেদে সময় পাল্টায়।

গ্রহ গতিশীল বলেই চতুর্থ মাত্রা ছাড়া তার অবস্থান নির্ণয় করা যায় না। যদি গ্রহটি স্থির হত তবে প্রথমে উত্তর দক্ষিণে তার দূরত্ব মাপতাম। দ্বিতীয় বারে পূর্ব পশ্চিমে দূরত্ব মাপতাম, তৃতীয় বারে মাপতাম আমাদের থেকে তার উচ্চতা। যেহেতু গ্রহ গতিশীল তাই প্রয়োজন চতুর্থ মাত্রার। চতুর্থ মাত্রায় সময়ের কথা বলা হলেও, গতিশীলের জন্য সেই সাধারণ সময় খাটবে না। নির্দিষ্ট সেকেণ্ডই

পর্যন্ত জানতে হবে। কারণ প্রতি সেকেণ্ডে তার অবস্থান পাল্টাচ্ছে। এই হিসাব সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝা শক্ত বলেই তিনি প্রশ্নকর্তাকে আধ্যাত্মবাদীর কাছে যেতে বললেন।

কিন্তু আধ্যাত্মবাদীর কাছেও শক্ত তত্ত্ব আছে। তা নিয়ে আধ্যাত্মবাদীরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গবেষণা করে না বলেই অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। ধর্ম যে আত্মার কথা বলছে বৈজ্ঞানিকের কাছে তা ছেলেখেলা হলেও, অনেক সময় সেই ছোট ছেলের কাছ থেকে একটা ছোট লাঠি নিয়েও জলে ভেসে যাওয়া তাঁর প্রিয় বস্তুটি না ভিজে উদ্ধার করতে পারতেন। তাতে ছোট ছেলেটিও আনন্দ পেত এই ভেবে যে, তার ছোট লাঠিটাও অত বড় বৈজ্ঞানিকের কাজে লেগেছে। এমনি ভাবে যদি তিনি কোপার্নিকাস, টলেমি, নিউটনকে হেলা করতেন তবে তাঁদের ভুল ত্রুটি ধরতে পারতেন না, ফলে তিনি কোন তত্ত্বও খাড়া করতে পারতেন না। এই কথা শুধু আইনস্টাইনকে বলা হচ্ছে না, তাঁকে উদ্দেশ্য করে বৈজ্ঞানিক জগৎকে বলা হচ্ছে। এখনও আপনারা কেন্দ্রবাদের পথে একীভূত ক্ষত্রতত্ত্বে যান।

ঠিক এই কথা আধ্যাত্মিক জগতকেও বলব। তাঁরাও আইনস্টাইনের মত নিজেদের জগতের ভুল ধরে সংশোধন করে নিন। আইনস্টাইন বিজ্ঞানী হয়েও বিজ্ঞানের ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন। আপনারাও ধার্মিক হয়ে ধর্মের কিছু ভুল ধারণাকে সংশোধন করে দিন। তখন নিশ্চয় ধর্ম ও বিজ্ঞান কাছাকাছি আসতে পারবে। মূলত: আত্মার সেন্টার ও বাস্তব জগতের সেন্টারের কোন পার্থক্য নাই। এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'ভগবান ব্রহ্ম আত্মা ও ধর্ম' গ্রন্থে।

ধর্ম যেমন সৃষ্টিকে একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছে, বিজ্ঞানও তেমনি আজ সৃষ্টিকে একসূত্রে বাঁধতে চাইছে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে আপেক্ষিকতা বাদের নিজস্ব প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র থাকলেও সৃষ্টিকে একসূত্রে বাঁধার পথে অন্তরায় না হয়। আমেরিকার এক কথায় আপেক্ষিকতাবাদকে প্রকাশ করতে গিয়ে আইনস্টাইন জ্বলন্ত স্টোভে বসার কথা বলেছেন এবং সুন্দরীর সঙ্গে এক ঘণ্টা সময় কাটানোর কথা বলেছেন। এককথায় প্রকাশ করতে গিয়ে চমৎকার কথা বলেছেন। এক সেকেণ্ড কেন, তার একটা সামান্য ভগ্নাংশ সময়ও বসা মুস্কিল। অপরদিক থেকে তা বিরাট বলেই সামান্য সময়ও বিরাট মনে হয়। এখানে বক্তব্য বিষয়টা এই সেকেণ্ডের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে চলে আসে বলে এক সেকেণ্ডকে অনন্তকাল

বলে হয়। সুন্দরীর সঙ্গে এক ঘণ্টা কাটানো এর বিপরীত, কারণ ভাল লাগার সান্নিধ্যের মোহে এক ঘণ্টাকে এক মুহূর্ত মনে হয়।

আসলে অপরের কাছে এই সময়ের কোন আংকিক মূল্য নাই। এই হিসাব স্থান কাল পাত্র হিসাবে দাম থাকলেও অনন্তকে একে বাঁধতে পারে না। ধর্মে দর্শনে এর দাম অনেক। আইনস্টাইনের আরও কৃতিত্ব এই দর্শনকে বিজ্ঞানের জগতে ঢুকাতে পেরেছেন। আসলে তিনি তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী। গবেষণার যন্ত্রপাতি না ঘেঁটে পাঁচটা দেখে শুনে যা আমাদের বিজ্ঞান জগতকে দিয়ে গেলেন তাঁর তুলনা হয় না।

তিনি নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণবাদের বিরুদ্ধে এক গতি শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই ঘটনা বুঝতে হলে নিউটনের মতবাদকেও বুঝতে হবে। তিনি জড়বস্তুর বিভিন্নতা বোঝাবার জন্য মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি বলেন, যে কোন দুটি জড়বস্তুর পরস্পরের দূরত্ব যতই হোকনা কেন, তাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ শক্তি বর্তমান থাকবে। তবে দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে বিপরীত বর্গ রীতিতে মাধ্যাকর্ষণের শক্তির প্রভাব হ্রাস বৃদ্ধি হয়। নিউটনের এই মতবাদে কিন্তু কোন সীমাহীন বস্তুধর্মী জড়ক্ষেত্রের পরিকল্পনার সুযোগ নাই এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুর উপর প্রভাব বর্তানোর জন্য। অর্থাৎ আলোক বিজ্ঞান যেমন তরঙ্গবাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে তেমনি মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব তরঙ্গ তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে ছিল না। তাই কেউই বুঝতে পারতনা তরঙ্গ তত্ত্ব ছাড়া কি করে জড়বস্তুরা পরস্পরের উপর প্রভাব ফেলে। এই তত্ত্বের প্রবক্তা নিউটনও বোধ হয় বুঝতেন না এই রহস্য।

নিউটনের পরবর্তী বিজ্ঞানীরা বিদ্যুৎ বাহী জড়কণার মধ্যেও আকর্ষণ শক্তির কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু ফ্যারাডে ও ম্যাক্সওয়েল পরীক্ষানিরীক্ষায় প্রমাণ করলেন যে, দুই বস্তুর মধ্যে তরঙ্গাকারে প্রভাব বিস্তার হয়। এই মতবাদকে অনেকেই মেনে নিলেন, তবু আইনস্টাইনের মাথায় খেলে গেল অন্য আর একটা পথের সন্ধান।

পুরাতন বিজ্ঞানে দেশ বোধের একমাত্র সহায় ছিল ইউক্লিডিয় জ্যামিতি। এই জ্যামিতির মতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রসার অসীম ও অবাধ। তাই তাকে কল্পনার মধ্যেও আনা যায় না। এই অকল্পনীয় চিন্তাধারা ছিল আইনস্টাইনের পূর্বসূরী বিজ্ঞানীদের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মধ্যে। আইনস্টাইন যখন দেখলেন তাঁর আলোকিক তত্ত্বে নিউটনীয় শক্তি পরিকল্পনার স্থান হয়নি, তখন তিনি চিন্তা করতে

লাগলেন তারকারাজির গ্রহের গতি বৈচিত্র্যের ভিন্ন হেতু নির্দেশ কি ভাবে সম্ভব? তার উত্তর খুঁজতে তিনি দশ বৎসর কাটিয়ে দিলেন। তিনি দেখলেন উচ্চ গণিতের সহায়তা ছাড়া হেতুনির্দেশ সম্ভব নয়। তাই তিনি ত্যাগ করলেন ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে। তার বদলে ধরলেন রীমান কল্পিত দেশবোধ তত্ত্ব।

গণিতের সহায়তায় তিনি দেখালেন, গতি বৈচিত্র্যের কারণ হল দ্রষ্টার দেশকাল রূপ প্রক্ষেপ ভূমির বর্তুলতা ও অসমতা। এইবারই তিনি সাফল্য অর্জন করলেন। এবার ব্রহ্মাণ্ড অসীম আর অবাধ রইল না। সব কিছুকে হিসাবের মধ্যে আনার উজ্জ্বল আশা দেখা দিল।

তিনি দেখলেন জড়ের গতির উপর যেমন মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব আছে, আলোর গতির উপরও তেমনি আছে। এই বিষয়ে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার সব না হলেও অধিকাংশই বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে প্রমাণিত হয়েছে।

আলোক রসায়নেও আইনস্টাইনের প্রতিভা কাজ করেছে। হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন গ্যাসের মিশ্রণ আলোকের সংস্পর্শে এলে বিস্ফোরণ ঘটে। ১৮১৮ সালে বৈজ্ঞানিক জে, ফন গ্রটাস এই আলোক রসায়ন সম্পর্কে বলেন, আলোকের শোষিত অংশ এই বিক্রিয়া ঘটায়। এই নিয়ে পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী ড্রেপার, স্টার্ক ও অ্যালবার্ট আইনস্টাইন মাথা ঘামিয়েছেন। প্লাঙ্কের কোয়াণ্টাম সূত্র অনুসরণ করে স্টার্ক ও আনইস্টাইন দেখান যে, অণু যখনই এক কোয়াণ্টাম আলোকশক্তি শোষণ করবে তখনই অণুটি রাসায়নিক বিক্রিয়া করবে। আলোকশক্তি শোষিত হলেই যে বিক্রিয়া ঘটবে এমন নয়, তাতে তাপশক্তিও উৎপাদিত হতে পারে। এই জন্য ফিল্ম ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য আলোর সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করবার জন্য কালো কাগজে মুড়ে রাখা হয়। তা কালো কাগজের অন্ধকারে না রাখলে আলো সেই সংরক্ষিত বস্তুতে বিক্রিয়া ঘটিয়ে গুণ বের করে আনতে পারে। আলো চোখের দৃষ্টিকে যেমন তাড়িত করে, বস্তুর গুণকেও তাড়িত করে। অন্ধকার চোখের দৃষ্টিকে যেমন আচ্ছন্ন করে, বস্তুর গুণকেও আচ্ছন্ন করে। গভীর অন্ধকারের মধ্যে চোখ মুদলে আরও গভীর অন্ধকার মনে হয়। মনে হয় এই জন্য বললাম, এই অন্ধকার দেখছে চোখের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন করা মন। চোখেও অন্ধকার দেখা যায়। আলোয় দাঁড়িয়ে ঘরের কোণের অন্ধকার দেখতে পাই। ঘরে এলে সেখানে আর তখন অন্ধকার দেখা যায় না। কারণ চোখে তখন বাইরের আলোর তীব্রতা কমে গিয়েছে। কালো কাগজ

ধরে রাখা অন্ধকার, তাই কালো কাগজে মোড়া ফিল্মে আলো প্রবেশ করতে পারে না। সাদা কাগজ কিন্তু ধরে রাখা আলো। উজ্জ্বল আলোতে থেকে অল্প আলোকে দেখা যায় না। দেখা যায় অন্ধকারকে। গভীর অন্ধকারে থেকে অল্প অন্ধকারকে দেখা যায় না। দেখা যায় আলোকে। এই আলোকে তো উজ্জ্বল আলোয় দাঁড়িয়ে অন্ধকার মনে হয়। দেখাতে যেমন আলোর ভূমিকা থাকে তেমনি অন্ধকারের ভূমিকা থাকে। চোখে আপেক্ষিক অন্ধকার না থাকলে, আপেক্ষিক উজ্জ্বল বস্তুকে দেখতে পাই না। আবার চোখে আপেক্ষিক আলো না থাকলে আপেক্ষিক অন্ধকারকে দেখা যায় না। অন্ধকারে চোখ বুজে দুই হাতে দুই চোখের পাতা ঘসলে আলো অনুভব করা যায়। এখানে ঘর্ষণই অক্সিজেনের মত অনুঘটকের কাজ করে। আলো মাত্রেরই যখন বিচ্ছুরণ আছে, চোখের পাতা ঘসা আলোতেও তখন বিচ্ছুরণ থাকতে বাধ্য।

স্থান কাল অনুযায়ী রকমারী অনুঘটক কাজ করে। লোহা পিটাতে অনুঘটক হিসাবে দরকার বড় হাতুড়ি, সোনার গহনা গড়তে অনুঘটক হিসাবে দরকার হয় ছোট হাতুড়ি। প্রকৃতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী অনুঘটক চলে আসে। হাওয়া বেরিয়ে যাওয়ার পথ অর্থাৎ দূরত্ব দিলে অনুঘটকের মত হাওয়া প্রচণ্ড বেগে বইবে। ঘরের কোণে সেভাবে বইবে না। তার চরিত্র পাল্টিয়ে যাবে। ক্রমদূরত্বে হাওয়া ক্রমে প্রচণ্ড হয়। ক্রম নৈকট্যে সূক্ষ্ম হয়।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ জনিত ধারায় সম্মিলিত শক্তি কাজ করছে। হাওয়া তার এক অংশ। আলো তার একটা অংশ। এমনি আরও অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ আছে। বাজারে বহু প্রকারের মাল থাকলেও ক্রেতারা তাদের প্রয়োজন মত মাল পয়সার সঙ্গে বিনিময় করে আনে। তেমনি বিনিময় চলছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পরমাণু ভাঙা অংশ ভাবাণু থেকে সূর্য পর্যন্ত সবার মধ্যে। এখানে বাজারের ক্রেতা বিক্রেতার সবার সঙ্গে সবার সম্পর্ক। তাই সেখানে বাজারের কোলাহল, বাজারের মত কেন্দ্র ভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ।

এক মাইল রাস্তা একটা মানুষের পক্ষে বেশি নয়, কিন্তু একটা পিপিলিকার পক্ষে অসংখ্য মাইল। হাওয়া পথ পেয়ে যে গতিতে যতদূর বেরিয়ে যায়, ঘরের কোণের হাওয়া তা পারে না। তবু হাওয়া মিশ্রশক্তি হওয়ায় তার সূক্ষ্মশক্তি ঘরের ঐ কোণের দূরত্বের মধ্যেই হাওয়ার গন্তব্যস্থানের দূরত্বের মত দূরত্বে যাচ্ছে। সেই বিচারে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব যত, পরমাণুর ইলেকট্রন থেকে তার কেন্দ্রের দূরত্ব তত। সেই দূরত্বে হাওয়া না গেলেও সূক্ষ্ম কোর্স যাচ্ছে,

এবং তার পুষ্টির জন্য কিছু রেকেটউইক ফোর্স হয়ে বেরিয়ে আসছে। সেই শক্তি অনুযায়ী ইলেকট্রন ঘুরছে, যেমন সূর্যের চারধারে গ্রহরা ঘুরছে। সূর্য গ্রহের ধারা পরমাণু নিতে পারে না, ছাড়তেও পারে না। তাই পরমাণু ঐ মিশ্র ধারা থেকে নেওয়ার ক্ষমতা অনুযায়ী নেবে, সেই মিশ্র ধারাও সেই অনুযায়ী দেবে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে পৃথিবী যে ধারা টানে, সেই ধারার চাপে আমরা মরে যেতে পারি। কিন্তু মরি না, আমরা ক্ষমতা অনুযায়ী তার থেকে নিচ্ছি বলেই সে সেই মত দিচ্ছে। আমাদের ধারে কাছে আসতে পারে না সেই ক্ষতিকারক ধারা। আমাদের চার ধারে সেই সূক্ষ্ম ধারা প্রয়োজন মেটাতে এত ভীড় করে যে, পৃথিবীর উপযোগী ধারা সেখানে ঢুকতে পারে না, যেমন ঘরের কোণের দিকে হাওয়ার মূল প্রবাহ যায় না। অর্থাৎ হাওয়ার পতন সেদিকে যায় না। আবহাওয়ার চাপ শরীর কেন্দ্র মানিয়ে নিতে পারে, পতন মানিয়ে নিতে পারে না।

আমরা সেই সূক্ষ্ম ধারায় গ্রহণ বর্জনে এত শক্তিশালী যে, বাইরের বিপদ আমাদের ক্ষতি করতে পারে না। সেই আঘাতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষমতা অনেক গুণ বেশি। সামান্য একটা পরমাণুকে আঘাত করলে যে শক্তির প্রকাশ ঘটে সে শক্তি আঘাতকারীর শক্তির চেয়ে ৬০ লক্ষ গুণ বেশি। এই শক্তি চেপে রেখেছিল তার আবহাওয়ার চাপ, এই শক্তি বের করা হল আঘাত বা পতন দিয়ে। কি পরিমাণ শক্তি তাহলে ভর ভরে রেখেছিল পরমাণুর মধ্যে। আইনস্টাইনের ভাষায় ভর এখানে শক্তি। কিন্তু ভরের অর্থ আরও পরিষ্কার হয় যদি বলা যায় পরমাণুর সর্ব দিক থেকে চাপে আচ্ছাদনসহ শক্তি। শক্তিকে শক্তি বললে পরিষ্কার হয়, ভর বলার প্রয়োজন হয় না। ভারে মাধ্যাকর্ষণ কাজ করে। ভরে সর্বদিক থেকে চাপ কাজ করে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও সঞ্চিত হয়ে আছে তার ভরেই। গ্যাস যদি সিলিণ্ডারে থাকে কঠিন বা তরল পদার্থের মত তার ওজন হয়। সেই গ্যাস ছেড়ে দিলে কেন্দ্রভিত্তিক বিকর্ষণে কমে যায়। যে ওজন গ্রহণ করে কেন্দ্র। দাঁড়িপাল্লার ওজন তখন চার দিকে ভাগ হতে থাকে।

গ্যাসের প্রতিটি পরমাণুর ভর আছে এবং তার ভার বা ওজন আছে। গ্যাসের ওজন আছে কিন্তু তেমন ভর নাই বলেই চতুর্দিক থেকে আচ্ছাদিত পাত্রে রাখতে হয়। কাপা মোজের বলে বায়ু ঢুকিয়ে চাপ দিলে চাপে শক্তি হিসাবে হাওয়া আমায় আলবে—যে ধরণের শক্তি পরমাণুতে ইলেকট্রনকে বোঝায়। কাপা

দোলনের মতন বায়ুর স্তর চাপ দিলে পূর্বের তুলনায় অতি সহজে চিপটে যাবে। কারণ, সেখানে বায়ুর পতন ও শূন্যতার আকর্ষণ কাজ করেছে। এই আকর্ষণ পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের ভেতরের আকর্ষণ সৃষ্টি করে। পরমাণুর আবরণ যেমন ভরশক্তিকে ধরে রাখে, গ্যাসের বিচ্ছুরণ-শক্তির প্রাবল্যে তা ধরা যায় না। বাইরের চাপ তার ভর শক্তি সৃষ্টি করতে এসেও পরাস্ত হয়ে যায়। পরমাণুর মত গ্যাস আবরণের মধ্যে থাকলে ভর শক্তি সৃষ্টি হয়।

তেল ও জল দুটোই তরল হলে দুটো এক সঙ্গে যেমন মেশে না, পরমাণু ভাঙলে যে গ্যাস ও কণা পাওয়া যায় তারাও সাধারণ গ্যাস ও সাধারণ ধূলিকণার সঙ্গে মেশে না। এই সবই পার্টিক্যাল সহ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ধারায় মিশে আছে। চলাচলের সময় সেই ধারা থেকে তারা নিজের নিজের উপযুক্ত স্থানে চলে যায়। অবশ্য সে সব স্থানের উপযুক্ত হওয়া চাই এই সব সামগ্রী। কোন কোন ধাতুর উপর আলো পড়লে সেই সব ধাতুর পরমাণুর থেকে ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু আলোর উজ্জ্বলতার উপর নির্ভর করে না ইলেকট্রনের গতি বেগ। দূর বা কাছ থেকে আলো ফেললেও বেগের তারতম্য হয় না, ইলেকট্রনের বেগ একই থাকবে। তবে আলো যত উজ্জ্বল হবে বিচ্যুত ইলেকট্রনের সংখ্যা তত বেশি হবে। ফলে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বেশি হবে। তবে বিভিন্ন রঙের আলো ফেললে ইলেকট্রনের বেগ বিভিন্ন হবে। শাদা আলোতে যে বেগ হবে বেগুনী আলোতে হবে তার থেকে বেশি। কোন কোন ধাতুর উপর আলোর বর্ণালীর লাল উজানি আলো ফেললে ইলেকট্রন নির্গত হয় না। আরও দেখা গিয়েছে বেগুনী পারের আলো সাধারণ সব ধাতু থেকেই ইলেকট্রন নির্গত করতে পারে।

এই বিভিন্নতার উত্তর দিলেন আইনস্টাইন প্লাঙ্কের কোয়াণ্টাম তত্ত্বের উপর নির্ভর করে। তাঁর মতে একটি বিলিয়ার্ড বল যেমন অন্য বিলিয়ার্ড বলকে সরিয়ে দেয় তেমনি ভাবে আলো কোন ধাতুর উপর পড়লে তার শক্তি কণিকা পরমাণুর উপর ঘা দিয়ে ইলেকট্রন সরিয়ে দেয়। অবশ্য ঐ শক্তি কণিকার মান যথাযথ হতে হবে। আইনস্টাইন এই তত্ত্বে নোবেল পুরস্কার পেয়ে ছিলেন। এই তত্ত্ব অবশ্য এই বিষয়ে জ্ঞানকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে ছিল। সেখানে সম্পূর্ণ কথা বলা হয় নি। এখানে আলোর শক্তি কণিকার যথার্থতার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ধাতুর ইলেকট্রনের গ্রহণ ক্ষমতার কথা বলা হয় নি। তার ইলেকট্রনের যে নিজস্ব চরিত্র আছে, তা প্রমাণিত হয় একই ধরণের গতি বেগে। [illegible]

অনুযায়ী আলোক কণিকার সঙ্গে ধাতুর পরমাণু কেন্দ্রের সঙ্গে আকর্ষণ বিকর্ষণে ইলেকট্রন ছোটা না ছোটা নির্ভর করে।

এইসব বিষয় আরও পরিষ্কার করতে হলে সত্যেন বোসের "প্লাঙ্কের সূত্র ও আলোক কোয়াণ্টাম প্রকল্প" শীর্ষক প্রবন্ধের স্মরণ হতে হবে। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ম্যাকসওয়েল এবং বোলৎসমান সমষ্টিবিধি বা সাংখ্যায়নিক পদ্ধতিতে (Statistical method) দেখান, গ্যাসের অণুদের গতি কেমন হয়? তাদের মতে অসংখ্য গ্যাস অণুদের প্রত্যেকের বিক্ষিপ্ত গতির কথা না ভেবে তাদের সমষ্টির গতির কথা ভাবতে হবে। কারণ গ্যাস থেকে আমরা যে আচরণ পাই তা অণুদের সমষ্টির আচরণ, ব্যষ্টির নয়। ১৯০০ সালের প্লাঙ্ক সূত্রে বলা হয়েছে, কোয়াণ্টা বা সম্মিলিত শক্তির মাধ্যমে বিকিরণে শক্তির পরিবর্তন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে হয়, অন্যথায় হয় না। প্লাঙ্কের এই মতবাদকে বলে শক্তিকণাবাদ বা কোয়াণ্টাম থিওরি। এই থিওরিকে সত্যেন বোস এক অভিনব পদ্ধতিতে প্রমাণ করেন। তিনি আরও সহজ করে বুঝিয়ে বলেন, আমরা যখন একা থাকি তখন একার আচরণ ব্যক্তি বিশেষের আচরণ হয়। কিন্তু কোন মেলায় বা বিরাট জনসভায় যখন ঠেলাঠেলি শুরু হতে থাকে, তখন তার আচারণ ব্যষ্টির নয়, সমষ্টির। আমাদের বায়ুমণ্ডলে অসংখ্য গ্যাস অণুর অবস্থানের ফলে তেমনি সমষ্টির আচরণ প্রকাশ পায়।

প্লাঙ্কের শক্তি কোয়াণ্টাকে আইনস্টাইন ফোটন বলেছেন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোস তাকে বস্তুকণা সমতুল্য ভেবে অগ্রসর হন। আইনস্টাইনের ফোটনের তরঙ্গচরিত্রকে তিনি অস্বীকার করে নিজের কণা চরিত্রের ভিত্তিতে প্লাঙ্ক সূত্রকে নূতন ভাবে আবিষ্কার করতে গিয়ে সাংখ্যায়নিক সমস্যা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করলেন এটিকে।

প্লাঙ্কের বিকিরণ সূত্রকে নূতন করে আবিষ্কার করায় আইনস্টাইন অধ্যাপক বোসকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। তিনিও এই সূত্রকে প্রয়োগ করে গড়ে তুললেন একক পরমাণুসম্পন্ন গ্যাসের কোয়াণ্টাম বাদ। এই জন্য এই সূত্রের নাম হয় বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন। এখন তাকেই বলে বোস-সংখ্যায়ন। যে কণা বোস সংখ্যায়ন বিধি মেনে চলে তাকে বলা হয় বোসন। আর যে সব কণা ফের্মি সংখ্যায়ন মেনে চলে তাকে বলে ফের্মিয়ন। বোসন হল ফোটন (আলোক কণা) আলফা কণা, ডয়টেরন ইত্যাদি মৌল কণা। আর ফের্মিয়ন হল ইলেকট্রন প্রোটন ইত্যাদি।

মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র ও তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্রকে এক করবার জন্য ১৯২৯ সালে আপেক্ষিকতাবাদকে নূতনভাবে সাজালেন আইনস্টাইন। এই সূত্রের তিনি নাম দেন unified field theory বা একক ক্ষেত্র তত্ত্ব। তাঁর ধারণা ছিল তড়িৎ-চৌম্বক বলকেও জ্যামিতির মধ্যে ফেলা যাবে। তা সম্ভব নয়, যদিও তিনি আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারা মহাকর্ষীয় শক্তির কল্পনাকে পাল্টিয়ে মহাকাশ সময়সন্ততির জ্যামিতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করেছেন। সমপর্যায়ের চলমানতাকে খানিকটা হিসাবে আনা যায়। তাতে অসমপর্যায়ের চলমানতাকে জ্যামিতির কল্যাণে হিসাবে আনা যায় না। সেখানে গভীরের সেণ্টার থেকে হিসাব করে উঠতে হবে উপরে। তাতে সমপর্যায়ের অসমপর্যায়ের সব কিছুকে হিসাবে আনা সম্ভব হবে। কোন কিছুর ভিত্তি না থাকলে অংক ভুল হতে পারে। যার জন্য তিনি মাধ্যাকর্ষণ চর্চা করতে গিয়ে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি ছেড়ে রীমান কল্পিত দেশবোধ তত্ত্বের আশ্রয় নেন। আজ কোন কোন পণ্ডিত আইনস্টাইনের অংককে ভুল প্রমাণ করতে সক্ষম হচ্ছেন। কেন্দ্রবাদকে জানলে অত অংক কষবার দরকার হবে না, অত ভুল হওয়ারও ভয় থাকবে না।

তিনি আবার বলেছেন, কেবলমাত্র মহাকর্ষ ও তড়িৎ-চৌম্বক নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। যত মৌল কণা আছে, তাদের আচার আচরণের ব্যাখ্যা দিতে হবে। কেন্দ্র তত্ত্ব না জানলে সবার আচার আচরণ আলাদা আলাদা জানতে গেলে একক ক্ষেত্রতত্ত্ব বিভ্রান্তির ধোঁয়ায় ডুবে যাবে।

তড়িৎ-চৌম্বক সম্বন্ধে জানতে হলে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। পরমাণুর কেন্দ্রে আছে প্রোটন, যা ধনাত্মক আধানযুক্ত। আছে নিউট্রন, যা আধান বিহীন। তাদের আচ্ছাদনে আছে নিউক্লিয়স বা কেন্দ্রিন। এই আচ্ছাদনের বাইরে ঘুরছে ঋনাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রন। সূর্যের পৃথিবীকে আকর্ষণের মত ধনাত্মক নিউক্লিয়স ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করছে। ফলে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরছে। এই দুয়ের পারস্পারিক ক্রিয়ার নাম তড়িৎ চুম্বক ক্রিয়া (Electro magnetic interaction)। দুটি ইলেকট্রনের মধ্যেও আধান জনিত বিকর্ষণ ও পারস্পারিক ক্রিয়া চলছে। এইভাবে যে কোন দুই আধানযুক্ত কণার পারস্পরিক ক্রিয়াকে তড়িৎ চৌম্বক বলে। এই কণাদের মধ্যে তড়িৎ চৌম্বক ক্রিয়ার ফলে ট্রেন, ইলেকট্রিক পাখা ইত্যাদি চলে।

নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটন ও নিউট্রনগুলো পরস্পরকে ভীষণভাবে

আকর্ষণ করে আছে। এর শক্তি তড়িৎ চৌম্বক ক্রিয়ার চেয়ে অনেক বেশি। এই বলকে বলা হয় প্রবল পারস্পারিক ক্রিয়া (Strong interaction)। এখানে বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন, প্রোটন বা নিউট্রনের মধ্যে যে কেউ মেসন নামে একটি কণা ছেড়ে দিচ্ছে। সেই মেসনকে আবার একটা প্রোটন বা নিউট্রন টেনে নিচ্ছে। এইভাবে লুফালুফিতে ঐ শক্তিশালী পারস্পারিক ক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যায়, সেই আদান প্রদান টেনিস বলের আদান প্রদানের মত। এই টেনিস বলের জন্য একে অপরকে ছেড়ে যেতে পারছে না।

বৈজ্ঞানিকরা আরও দেখেছেন, প্রোটন, ইলেকট্রন এবং নিউট্রিনো (আধার বিহীন ক্ষুদ্র কণিকা) নিউট্রন ক্ষয় হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে। এই চারটি কণার মধ্যে আবার পারস্পারিক ক্রিয়া চলছে। সেই ক্রিয়া অতি দুর্বল। তড়িৎ চৌম্বক ক্রিয়ার চেয়েও অনেক দুর্বল। তাকে বলে Weak interaction বা দুর্বল পারস্পারিক ক্রিয়া।

পরমাণু সম্বন্ধে এত জানা গেলেও একক ক্ষেত্রতত্ত্বের মূলে যাওয়ার পথ পাওয়া যাচ্ছে না। পরমাণু সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এত জানেন তবু তাদের কেন্দ্রকে তাঁরা মূল কেন্দ্রের দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করছেন না। মনের চিন্তাকে সুশৃংখল করবার জন্য অঙ্কের দরকার হয়, নইলে শুধু চিন্তা বিপথগামী হতে পারে, আবার শুধু অঙ্ক বিপথগামী হতে পারে। চিন্তাকে পুষ্ট করতে হলে মানবিক ধর্ম সংস্কৃতির উপর দাঁড়াতে হবে। চিন্তা করতে হবে কেন তারা পৃথিবীতে এত প্রভাব বিস্তার করে আছে। অঙ্ক না হলে ভিত্তি হয়, যেমন আইনস্টাইনের মাথায় অঙ্কের আগে আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে চিন্তা এসেছিল। তারপর তাকে যথাযথ করবার জন্য অঙ্ক কষতে হয়েছিল। দুই আর দুই না পেলে চার হয় না ঠিকই। কেন সেই দুইকে আনলাম তার গোড়ায় না গেলে দুই আর দুই চারের কোন মূল্য নাই। তা মূলে না গিয়ে ভাসা ভাসা হয়ে থাকে। এই ভাবে ভাসতে থাকলে মূল পেছনে পড়ে যায়। ফলে আলাদা আলাদা ভাবে পরমাণু শক্তি, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চিন্তা করা হচ্ছে, কিন্তু এক সূত্রে বাঁধা সম্ভব হচ্ছে না। দুই আর তিনের আপেক্ষিকতা জানতে পারছি, কিন্তু এই আপেক্ষিকতা মূলে নিয়ে যেতে পারছে না।

ভরের জন্য সব সময় আকর্ষিত শক্তি বিকর্ষণে প্রকাশ করে। সেই শক্তি আবর্তন ক্রম করে অঙ্কের ক্ষেত্রে দেয় সেই তার থেকে প্রয়োজন

মত নিতে কিছু ছেড়ে দেয়। কারণ প্রয়োজনমত নেওয়ার জায়গা দিতে হবে তো। জগৎ আপেক্ষিকতা নিয়েও সব সময় পরিপূর্ণ। কোন কিছু নিতে হলে তার বিনিময়ে ছাড়তে হবে। আমি যে আপেক্ষিক শূন্যতার জন্য চলার কথা বলেছি, সে শূন্যতা শূন্য নয়, বস্তুর পার্থক্যে শূন্য। গ্যাস ফাঁপা হলেও তার প্রসারণ শক্তি শূন্যতাকে পূর্ণ রাখে। তবু তার মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে বাইরের বস্তু রাখার স্থান আছে।

চার

অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কাকা জ্যাকব খুবই তাঁকে ভালবাসতেন। সেই সুবাদে অ্যালবার্টও তাঁকে বারবার প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতেন। এমনি নানা প্রশ্নের মধ্যেই সেই শিশু বয়সেই তিনি প্রশ্ন করে বললেন, কাকা, বীজগণিত বস্তুটা কি?

এই প্রশ্নের একটা মজার উত্তর দিলেন জ্যাকব। বীজগণিত হচ্ছে এক ধরণের অলস অঙ্কের বই। যে জিনিসটা তুমি জানো না, তাকে X ধরে অঙ্ক কষলে অজানা জিনিসটাকে বার করতে পারবে।

ভারী মজা তো। যে জিনিসটা জানতে পারছিনা, তাকে X ধরে অঙ্ক কষলেই জানা যাবে।

তাঁর কাকা হালকা ভাবে যে কথাটা বলেছিলেন সেই কথাটাই তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল। সেই ধারণাই তাঁকে যেন আর এক জগতে নিয়ে গেল। সমস্ত খেলাধুলা ছেড়ে দিয়ে তিনি অঙ্কের চিন্তায় মজগুল হয়ে থাকলেন। যে তাঁকে বীজগণিত বা পাটীগণিতের বই যোগান দিতে পারত সেই তাঁর পরম বন্ধু হয়ে যেত। তিনি অঙ্কের বই ছাড়া শিশু সুলভ অ্যাডভেঞ্চারের বইও পছন্দ করতেন না। তাঁর শিশু বয়সে জার্মানীর স্কুলে জ্যামিতি বই পড়ানো হত না। তবু তিনি বিশেষ ভাবে জ্যামিতি চর্চা করতেন। সেভাবে যদি তিনি সংস্কৃতি চর্চা করতেন, তবে তিনি জগতকে বিজ্ঞানের সঙ্গে আরও কিছু দিয়ে যেতে পারতেন।

ধর্মের মধ্যে ভুল আছে ঠিকই। সেই ভুলটা কোথায় কি ভাবে কাজ করছে সেটা জেনে নিয়ে অঙ্কে বিজ্ঞানে হাত দিলে সমাজের মানুষ আরও শিক্ষার সুযোগ পেত। অজ্ঞানতার অন্ধকারের দেওয়াল না ভেঙ্গে দিলে পরস্পরের

আলো বিনিময় হতে পারে না। বিজ্ঞানী যদি বলে ধার্মিকরা শিক্ষার অভাবে বিজ্ঞানে ঢুকতে পারছে না, আমিও তাহলে বলব, দেওয়াল ভাঙ্গার শিক্ষার অভাবে বিজ্ঞানীরাও তাদের কিছু জানতে পারছে না। পরস্পরকে না জানলে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ সফল হবে কি ভাবে? একক ক্ষেত্রতত্ত্বের জ্ঞান সফল হবে কি ভাবে? ঘরে দরজা বন্ধ করে জ্ঞান চর্চা করলে সে জ্ঞান বাইরে আসবে কেমন করে? উল্টে ধার্মিকরাও যদি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের চিন্তা করেন, তবে তাঁদেরও জ্ঞান বা বিজ্ঞানের কাছে তারা পৌঁছাবে কেমন করে? বিজ্ঞান যেখানে প্রমাণ ছাড়া কোন কিছু বিশ্বাস করেনা, সে বিজ্ঞানকে অবমাননা করা যায় কোন যুক্তিতে? বিজ্ঞান যদি সর্বব্যাপী ঈশ্বরের বাইরে থাকে তবে সে ঈশ্বর সর্বব্যাপী হতে পারেন না। অনন্ত হতে পারেন না।

ধর্মের চোখের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের চোখের ধর্মকে এক করলে ঈশ্বরতত্ত্ব ও একক ক্ষেত্র তত্ত্ব এক হয়ে অনন্তকে খুঁজে দিতে পারে। এই দুইকে এক করা বিজ্ঞানের বাইরের কাজ নয়। সেটা বিজ্ঞান ভিত্তিক কাজ। দুই তত্ত্বকে এক করতে সবারই একে মিলিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। তাহলে আমরা দেখতে পাব ধর্ম এক সত্য চাইলেও গোঁড়ামির জন্য ভুলকে গ্রহণ করছে। এই গোঁড়ামি ভাঙ্গা তো বিজ্ঞানের কাজ। বিজ্ঞানীও তো একটা বৈজ্ঞানিক সত্য বোঝাতে অনেক বাইরের উপমা টানেন। অনেক সময় ধার্মিকও ধর্ম বোঝাতেব জ্ঞোনিক তত্ত্ব টানেন। এটা অস্বীকার করার উপায় নাই। যারা অস্বীকার করে তারা মিথ্যা কথা বলে। সে মিথ্যা নিশ্চয় দলীয় স্বার্থের জন্য। এই মিথ্যাকে বাদ দিলে নিশ্চয় সত্য উদ্ভাসিত হবে। উভয় পক্ষ যে উপমা দেয় তাও সত্য হবে।

সেখানে সত্য আপেক্ষিক হতে পারে না। সেখানে আপেক্ষিকতাবাদ পৌঁছায় না। সেই অনন্ত সত্য অনন্তে ছড়িয়ে আছে। সেই অনন্তকে বোঝবার একমাত্র চাবিকাটি আছে কেন্দ্রবাদে। সেখানে ছোট থেকে বড় যে সব বস্তু ও ভাব ছড়িয়ে আছে, প্রত্যেকে কেন্দ্রবাদ মেনে চলছে। অনন্তে এক সঙ্গে মিশে আছে অনন্ত সময়, অনন্ত আলো ও অনন্ত অন্ধকার। তাদের জানতে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে যে সব বস্তুর কৈন্দ্রিক চরিত্র আছে তাদের বুঝলেই যথেষ্ট।

যীশু তো কবেই জীবনলীলা সাঙ্গ করেছেন। তাঁর জন্য খ্রীষ্টানরা আজও কাঁদেন। শুধু খ্রীষ্টান কেন, সাহিত্যে ভালভাবে রূপ দিতে পারলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও কাঁদে। সেই কবেকার সমস্যা মানুষের চরিত্রের কেন্দ্রে লেখক তুলে ধরতে পারেন বলেই কাঁদে। সেই কবেকার সমস্যা নিয়ে আজ তারা

ইহুদীদের নির্যাতন করতে ছাড়ে না। সেই নির্যাতনের শিকার ইহুদী বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও হয়েছিলেন কারণ ইহুদীরের জন্য যীশুর মৃত্যু হয়েছিল। এর উত্তর খোঁজা কি অঙ্কের পক্ষে সম্ভব? আপেক্ষিকতাবাদের পক্ষে সম্ভব? ভাববাদের পরে যে নির্ভর করে আছে দার্শনিকতত্ত্ব, সেই তত্ত্বকে নির্ভর না করলে আইনস্টাইনের তাত্ত্বিক বিজ্ঞান সম্ভব নয়।

ধার্মিক এইভাবে অনেক সময় মানুষকে ক্ষেপিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ফয়দা লোটে। এটা তো বৈজ্ঞানিক সত্য। তবে কি বিজ্ঞানীরা স্বার্থান্বেষীদের শোষণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ধর্মের বৈজ্ঞানিক খবর নিতে চান না? তাঁরা কি আসলে একক ক্ষেত্রতত্ত্বের নির্বাণ চান না?

অনন্ত সময়, আলো এবং অন্ধকারকে আমরা না ধরতে পারলেও বস্তুর চরিত্রে' মানুষের জীবনে ধরতে পারি। ভাব থেকে অণু পরমাণু, অণু পরমাণু থেকে বস্তু, বস্তু থেকে বিশ্বজগৎ। আবার এই বিশ্বজগৎ থেকে বস্তু, বস্তু থেকে অণু পরমাণু, আবার সেই অণু পরমাণু থেকে ভাবের সৃষ্টি। এখানে বস্তুবাদেরও গুরুত্ব দেবনা, ভাববাদেরও গুরুত্ব দেব না। গুরুত্ব দেব কেন্দ্রবাদের।

শূন্যে তারা ভেসে আছে এবং জেগে আছে। তারা আগে, কি শূন্য আগে তা জানার দরকার নাই। কেন্দ্র না থাকলে ঐ ভাবময় আকাশ ও বস্তুময় তারা কিছুই থাকত না। আকাশেও আছে ভাব পারের বস্তু, তারাতেও আছে বস্তু পারের ভাব। কেন্দ্র ভিত্তিক শূন্য ও বস্তুর আরও সূক্ষ্ম উৎপাদন হল সময়. আলো এবং অন্ধকার।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সেণ্টার ছাড়া কোন কিছুর ধ্রুবত্ব নাই। সব চরিত্রের গুণ সেণ্টারেই আবদ্ধ। একটা পাইপের এক মুখে জল ঢুকালে অপর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই এক মুখে আকর্ষণ অপর মুখে বিকর্ষণ সবই সেণ্টারে আছে। এমনি সমগ্র শূন্যের মধ্যে ভাব পারের বস্তুদের ও বস্তু পারের ভাবদের চলা ফেরার এই নিয়ম রক্ষিত হয়ে আছে। তাদের সূক্ষ্ম, স্থূল ইত্যাদি সৃষ্টির চলা ফেরায় পাইপ বা পথ সৃষ্টি নির্ভর করছে। জলের নমনীয়তার জন্য যেমন জলপথ থাকে না, চলার সময় পথ সৃষ্টি হয়, তেমনি শূন্যেও চলার কারণে পথ সৃষ্টি হয়, আবার বন্ধ হয়ে যায়।

এই সব ঘটনায় চারটি কারণ কাজ করছে। তারা হল কৈন্দ্রিক শক্তি, সেই শক্তি অনুযায়ী বস্তু বা ভাব, সেই বস্তু বা ভাব অনুযায়ী চলা ও এই চলার লক্ষ্যস্থল। এসব কারণ এক সেণ্টার থেকে সৃষ্টি হলেও তাদের নিজের নিজের

কৈন্দ্রিক চরিত্র আছে। একই পিতার অন্নে প্রতিপালিত হলেও, সন্তানদের যেমন একই চরিত্র গড়ে ওঠে না, এদেরও তেমনি অবস্থা।

পথের তারতম্যে চরিত্রের তারতম্য হয়, শক্তির তারতম্য হয়। একটা পাইপকে মনে করা যাক সমান নয়—কোথাও মোটা কোথাও সরু। কোন সেণ্টার থেকে সেই পাইপে একই বেগে জল প্রবাহিত করলেও জলের চলার মোটা সরু পথ অনুযায়ী তারতম্য দেখা যাবে। যেখানে মোটা সেখানে চলার তাড়া বা গতি কম। যেখানে সরু সেখানে চলার তাড়া বা গতি বেশি। এই দুই রকম শক্তি জলদাতা একটি সেণ্টারই সৃষ্টি করেছে এবং এই পথের তারতম্য পরস্পরের পরিপূরক। এখানে সেণ্টারকে বুঝলে বিভিন্নতাকে ধরা যায়। এই বিভিন্নতার মধ্যে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ঘটছে।

এই পাইপে যদি গ্যাস চালনা করা যায়, তবে দেখা যাবে সরু পথে গ্যাস চলার জন্য সংকোচিত হচ্ছে, মোটা পথে চলার জন্য প্রসারিত হচ্ছে। সেণ্টারের দুই গুণ এখানেও কাজ করছে। পাইপের মোটা পথে আপেক্ষিক শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে সরু পথে আপেক্ষিক পূর্ণতা সৃষ্টি হচ্ছে। এই আপেক্ষিকতা সেণ্টারের সঙ্গে তাল রেখে চলার মিত্রতা এবং দুই ধরণের চলার পার্থক্য সৃষ্টি করছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতায় কিন্তু মূলের সঙ্গে সম্বন্ধ বোঝা যায়না। একটার সঙ্গে আরেকটার পার্থক্য বোঝা যায় মাত্র। তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গতির জন্য তিনি মূলের সঙ্গে অন্যান্যের সম্বন্ধ ধরতে পারেন নি। এই সম্বন্ধ ধরতে না পারার জন্য অঙ্ক ভুল হওয়ার কারণ থেকে যায়। সেখানে একক ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্ভব নয় কারণ অনন্তকে কেটে বহু না করলে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা সম্ভব নয়।

শিশুকে ভূতের গল্প বললে বিশ্বাস করে। তাকে যদি সেই গল্পের মধ্যে সারা জীবন ঘরে আবদ্ধ করে রাখা যায়, বয়সের গুণে ভূতের ভয়ের রূপ পাল্টালেও, সম্পূর্ণ ভূতের ভয় থেকে মুক্ত হতে পারে না। মুক্ত হতে হলে জীবনের পথে চলতে হবে। অঙ্কেও তেমনি শাখা প্রশাখার কিছুটা ভুল ধারণা পাল্টালেও, যাকে নিয়ে হিসাব তার মূল থেকে না চললে একক ক্ষেত্র তত্ত্বের অঙ্ক নির্ভুল হতে পারে না। বাষ্প চালিত পাইপের মোটা স্থানে বাষ্প হাল্কা হয়ে থাকলেও, তাকে পৃথিবীর আবহাওয়ার চাপের সঙ্গে তুলনা করব। পৃথিবীর আবহাওয়ার চাপ যেখানে এত প্রবল, সেখানে সংকীর্ণ পথে আরও কত প্রবল। অবশ্য গ্যাস চালনা করতে থাকলে, এই অবস্থা দাঁড়াবে। গ্যাস চালনা না করলে সরু স্থানে যে চাপ, প্রসারিত স্থানেও সেই চাপ থাকবে। তখন পথ স্থানে পরিণত

হয়। চলা হয়ে যায় তখন জড়। পৃথিবী সব সময় চলছে বলেই কোন জড়ত্ব নাই।

এই চলার জন্য অণুপরমাণুতে ধ্রুবত্ব নাই। যখন খুব চাপে নক্ষত্রের পরমাণুর ইলেকট্রন ইত্যাদির চলা শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন নক্ষত্রের মৃত্যু হয়। তবু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চলা তাকে স্থির থাকতে দেয় না। কারণ কেন্দ্র এক মাত্র ধ্রুব। তাকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরবে। তাকে ক্ষয় করে সৃষ্টির কাজে লাগাবে সেই চলা। অসীম চাপেও মৃত নক্ষত্রের নক্ষত্র হিসাবে সেণ্টার না থাকলেও বস্তু হিসাবে সেণ্টার থাকতে হবে। যদি তার সেণ্টার না থাকে, সে নিজেই সেণ্টার হয়ে যাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চলা ফেরার মধ্যে। সেণ্টারের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্ক না চললে, অঙ্ক চরিত্রহীন হয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙ্গলে শরীরে একটা জড়তা আসে। জেগে থাকা অবস্থায় শরীরের কোষে কোষে যে চাঞ্চল্য থাকে, ঘুমিয়ে থাকার সময় তা থাকে না বলেই, জেগে উঠলে সেই জড়তা প্রকাশ পায়। হাত পায়ের গিঁটের সংকোচন তখন কাজের বড় সংকোচন প্রসারণে জেগে থাকার উপযোগী হয়। তখন আরও প্রবল হয়ে ওঠে শরীরের উইক ফোর্স ও স্ট্রং ফোর্স। ফলে সমস্ত দেখার মধ্যে একটা স্থূলতা আসে।

ঘুমন্ত অবস্থায় যে সূক্ষ্ম উইক ফোর্স ও স্ট্রং ফোর্স কাজ করে, তার ফলে আমরা এমন সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করি যে তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না। শরীরে যখন কেন্দ্র ভিত্তিক যান্ত্রিক কাজ চলছে, তখন তাকে যান্ত্রিক অনুভবের দেখাই বলতে হবে। অবশ্য চিত্তের চরিত্রের জন্য ভুল দেখা হোক আর ঠিক দেখা হোক, তা দেখাই। ঘুমের সূক্ষ্ম ধারার জন্য সূক্ষ্ম দর্শন মানুষকে গভীরভাবে চিন্তা করায়। সূক্ষ্ম ও স্থূলের পার্থক্য বুঝে মানুষ নিজেকে চিনে কাজ করতে পারে। তখন হয়তো মনে হয়, দুদিন পরে তো মরে যাব, তখন কেউ আর আমার দাম দেবে না। তাই এখন আমার কি করা উচিত? স্বপ্ন অনেক সময় এই আত্মদর্শনের সহায়ক হয়।

মৃত তারকাও তেমনি জেগে ওঠে, সৃষ্টির জগতে। তারকার চরিত্রের মৃত্যু হলেও, শরীরের ভূমিকা থেকেই যায়। শরীরের ভূমিকা থাকলেই আকর্ষণে বিকর্ষণে স্থূল সূক্ষ্মের কাজ চলতে বাধ্য।

হাঁটা মানেই এক পায়ে পতন আর অপর পায়ে সেই পতন রক্ষা। পতনে আমরা সামনে এগিয়ে যাই। অপর পা সেই পতন রক্ষা করে আবার নিজেই আর

একটা পতন সৃষ্টি করে। একের এখানে দুই চরিত্র থাকতেই হচ্ছে। এই সৃষ্টি চালানোর জন্য গ্রহ উপগ্রহদের ঠিক বস্তুভিত্তিক সেন্টারের আকর্ষণ বিকর্ষণ হয় না। একটু বাঁকা ভাবে হয় বলেই পতন হয়। সেই পতন রক্ষা করে কক্ষে এবং অক্ষে গ্রহ উপগ্রহদের চলা বজায় থাকে। ঠিক সেন্টারে ঐ কাজ হলে বায়ু, আলো, অন্ধকার কিছুই চলত না। জীবন স্তব্ধ হয়ে যেত। এই চলমানতার উপর সব চঞ্চল বলেই আইনস্টাইনের চতুর্থ মাত্রার প্রয়োজন হয়েছে।

এই চলার জন্য নক্ষত্র কৃষ্ণ গহ্বর বা ব্ল্যাক হোলে এসে পৌছায়। এখানে ধাতুর পরে আলো পড়ার ফলেও ইলেকট্রনের নিজের মত চলার সূত্র নির্ভর করে। আলো ধাতুটিকে ঠেলল, তাতে একটা চলার ক্ষমতা পাচ্ছে। সেই ক্ষমতা গ্রহের বেলায় থাকছে, কারণ ইলেকট্রনের মত তার বিচ্যুত শক্তি চলার বিরুদ্ধে বাধা হচ্ছে না। আলোর গতি কেন্দ্রের গুণের গতি। সে কেন্দ্রের শক্তির গতি অসীম। আলোর গতিকে সে হার মানায় বলেই সে আলোকে গতি দিয়েও অন্যকে গতি দিতে পারছে। সে অন্যের গতিকে নিজস্ব করে নিয়ে সেই নিজস্ব গতি দিচ্ছে আলো সহ অন্যান্যকে। যেমন একটা হাইড্রোজেন বেলুনকে এক স্থানে বেঁধে রেখে একটা ঢিল ছুঁড়ে সুতো কেটে দেওয়া হল। সেই ঢিলের শক্তিতে সে বিচ্যুত হলেও বেলুন কিন্তু তারপর নিজের গতিতে আবহাওয়াকে মানিয়ে নিয়ে আকাশে উঠবে। সে আর তখন কিন্তু ঢিলের শক্তির উপর নির্ভর করে না।

এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে শক্তি গেলে, সেই শক্তি সেই অন্য কেন্দ্রের উপযোগী হবে। পৃথিবীতে এই ভাবে বস্তুর পরিবর্তন হচ্ছে, শক্তির পরিবর্তন হচ্ছে। সেই শক্তি দশ দিকে এমন ভাবে চলছে যে, মনে হবে না গতির উৎস কোথাও আছে। এই কারণে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি প্রবল হলেও তার মধ্যে থেকে পরম্পরতার জন্য আমরা বুঝতে পারব না। অথচ পরমাণুর শক্তি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হলেও, পরিশোধিত করলে অসীম হয়ে যায়। ইউরেনিয়াম পরমাণু তার খনিতে নিজস্ব আবহাওয়ার জন্য বিশেষ তেজস্ক্রিয় থাকে না। যেমন, পৃথিবী তার নিজস্ব স্থানে থাকায় মাধ্যাকর্ষণ অত প্রখর হয় না। ইউরেনিয়ামকে তার খনি থেকে সরিয়ে আনলে তেজস্ক্রিয় বেশি হবে। তাকে পরিশোধিত করলে আরও বেশি হবে। এখানে পরমাণু কতখানি শক্তিশালী তা নির্ভর করছে পারিপার্শ্বিকের উপর।

আবহাওয়ার যে গুণ আছে, পরমাণুর তা নাই। পরমাণুর যে গুণ আছে

আবহাওয়ার তা নাই। উভয়ের গুণ তাই পরস্পরকে বিনিময় করে। যেমন শ্রমিকের শ্রম ও মালিকের ধন বিনিময় হয়।

একটা আলো স্বাভাবিকভাবে পড়লে তার তেমন জোর হয় না। কিন্তু টর্চের ফোর্সের মত ফোর্স দিয়ে ফেললে শক্তিশালী হয়। কারণ ফোর্স রাস্তা পরিষ্কার করে দিল বলেই চারদিকে আলো ছড়াল না। সমস্ত আলো একমুখী হয়ে শক্তি যোগাল বেশি। ঘরের হাওয়াকে পথ করে দিলে একমুখী হয়ে ফোর্স পায়। ঘরের কোণের হাওয়াকে তেমনি পথ করে দিলেই ফোর্স পেতে পারে। সেই পথহীন স্থানে পথ করতে হবে অন্যভাবে। সেখানে আগুন জ্বেলে দিলে. আগুনের দিকে হাওয়া ছুটে আসবে। তবে সেখানে পথ হল কি করে? সেখানকার রুদ্ধ হাওয়া উত্তাপে হাল্কা হয়ে উপরে পথ করে বেরিয়ে আসতে থাকে। আর সেই শূন্যস্থানে হাওয়া প্রবেশ করতে থাকে। এই ভাবে শক্তির কত রকম চলার পথ হতে পারে। বিচার করলেই প্রতি ক্ষেত্রে দেখা যাবে, একের যা নাই তা অন্যের থেকে নিচ্ছে। আবার অন্যের যা নাই তা অপর থেকে নিচ্ছে। এইভাবে প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতিটি বস্তুর অভাব সৃষ্টি হচ্ছে, আর পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় হচ্ছে।

এই বিনিময়ের চলার আর শেষ নাই। এইভাবে কেন্দ্রভিত্তিক চললে ঘুরে ফিরে আবার পূর্বের স্থানে আসতে হবে, অর্থাৎ আবার সবার পুনর্জন্ম হতে হবে। চললেই তার জন্ম নিতে হয়। পূর্বে দেখানো হল ঘরের কোণে আগুন জ্বাললে হাওয়া ছুটে এসে উত্তপ্ত হচ্ছে। হাওয়া সেখানে অন্য জন্মে চলে যাচ্ছে। সেই জন্মে উপরে উঠে ঠাণ্ডা হয়ে আবার নিচে নেমে আগুনের দিকে ছুটে আসছে। এইভাবে বিনিময়ের শৃঙ্খল চলছে ফুটন্ত জলের ওঠা নামার মত।

আলো ছড়িয়ে পড়লে পাশে আলো আর অন্ধকার মিশে থাকে। সেই আলোকে তীব্র করলে, আলোর সঙ্গে সঙ্গে পাশের অন্ধকার তীব্র হতে থাকে। পথ পেয়ে পাশের আবছা আলোও মূল আলোর ধারার সঙ্গে বেরিয়ে আসে বলেই তা সম্ভব। সমান আলোর সঙ্গে সমান আলোর বিনিময় হয় না, কারণ উভয়ের দেওয়া নেওয়ার কিছু থাকে না। তবু দুই আলোর মিলন শক্তির জোরে সেখানে অবশ্য সৃষ্টি থাকতে পারে না। আলো যে পথে যাওয়ার উপযোগী, সেই পথে ফোর্স পেয়ে পাশের আলো চলে যায়। পথের মিলের জন্য তারা মিলল। স্বাভাবিক ভাবে তারা মেশে অন্ধকারের সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমে। তীব্র আলো রাস্তা সুগম করল মৃদু আলো সেখানে ঢুকে পড়ল। নইলে মৃদু আলোর পথ আর তীব্র আলোর পথ এক নয়। মৃদু আলো চুইয়ে অন্ধকারে ঢোকে, তীব্র আলো তীব্র শক্তিতে

আধারে ঢোকে। যেমন এক ব্যবসায়ী অপর ব্যবসায়ীর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও উভয়ের ক্রেতা দ্বারা আক্রান্ত হলে উভয়ে এক হয়ে যায়।

মৃদু দ্বন্দ্ব তীব্র দ্বন্দ্বে মেশে অন্য দ্বন্দ্বের চাপে। একা কেউ এখানে মূল কারণ হতে পারে না যদিও তা একটা সীমার মধ্যে ঘটছে। একটা সরু মোটা পথের পাইপের মধ্যে ফোর্সে জল চালিত করলে সীমার মধ্যে হলেও জলের গতি নানা রকম হবে। তাই সৃষ্টিতে দ্বন্দ্ববাদ চরম নয়, কারণ তারও হেতু আছে, আবার তার বিরুদ্ধ শক্তিও কারণ হিসাবে দাঁড়ায়। ফোটনও একা কিছু করতে পারে না তারও এমনি নানা কারণ আছে। কোয়ান্টাম বাদে সম্মিলিত শক্তির প্রয়োগ থাকলেও তার চারধারেও অনেক পক্ষে ও বিরুদ্ধে কারণ আছে। এসব হিসাব করে একক ক্ষেত্রতত্ত্বে পৌঁছানো যায় না। বহু প্রকারের কণা নিয়ে একটা ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, তার তত্ত্ব জানতে হলে প্রতিটি কণার বিচার করতে হবে, পরস্পরের সম্বন্ধ বিচার করতে হবে, আবার তাদের সঙ্গে বিরোধীর দ্বন্দ্বের বিচার করতে হবে। এত সব বিচার করতে গেলে মানুষের আয়ু তো দূরের কথা, পৃথিবীর আয়ুতেও কুলাবে না, যতই আপেক্ষিকতাবাদ প্রয়োগ করা হোক।

অথচ কত সহজভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানা যাবে কেন্দ্র তত্ত্বের উপর নির্ভর করলে। সেখানে চন্দ্রশেখর সীমাও সীমায় বাঁধা নাই। চন্দ্রশেখর যে কোন এক স্থান থেকে আরম্ভ করেছেন বলেই তাঁর থিওরির সীমা দেখাতে হয়েছে যে কোন স্থানে। মূলে যাওয়া হয়নি বলেই যত থিওরি তত সমস্যা। আজ পর্যন্ত সমস্ত আবিষ্কার খণ্ড খণ্ড সত্য। তাই প্রত্যেকের বাইরের কিছুকে একটা থিওরিতে বাঁধা যায় না। সেই একতা আনতে পারে একমাত্র সেণ্টারিজম।

বিশ্ব সৃষ্টির একটা শুরু ধরা হয়েছে সূর্যের থেকে ত্রিশ গুণ বড় একটা গোলক থেকে, যে গোলক প্রচণ্ড চাপের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এই গোলককে বলা হয় কসমিক এগ বা মহাজাগতিক অণ্ড। তার ঘনত্বের মাপের হিসাবে বলা হয়েছ; মাত্র এক ঘন সেন্টিমিটারের ওজন ১০ কোটি টনেরও বেশি। প্রচণ্ড চাপ ও কয়েক লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপের প্রভাবে প্রচণ্ড শক্তিতে তা বিস্ফোরিত হয় কয়েক হাজার কোটি বছর আগে। তার ফলে সৃষ্টি হয় ছায়াপথ।

অণ্ড বা ডিমের এই বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্টি হয় প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন ইত্যাদি মৌলগুলি। যেমন হাঁস মুরগীর ডিম ফেটে বেরিয়ে আসে বাচ্চা। গ্যামো বলেন, এই মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি হতে সময় লাগে মাত্র এক ঘণ্টা। তারপর প্রায় ২৫ কোটি বছর লেগে যায় বিকিরণ আরম্ভ হতে। বস্তু ততদিন পর্যন্ত হাল্কা

আবহাওয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। ক্রমে তা নানা রকম রাসায়নিক মৌলে ভরা গ্যাসীয় গোলক সৃষ্টি করল। তার নাম নক্ষত্র।

ধর্মও জানত, অণ্ড বা ডিম ফেটে তার জন্ম বলেই, নাম ব্রহ্মাণ্ড। হাঁস মুরগীর বাচ্চারা যেমন পরস্পরের প্রেমের আকর্ষণে ও খাদ্য নিয়ে পরস্পরের শত্রুতার বিকর্ষণে বাস করে, তেমনি মহাকর্ষীয় বলের সাহায্যে মহাজাগতিক বস্তুরাও আচরণ করতে লাগল। তাদের সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে সেণ্টারিজম অনুযায়ী ভেতরের উষ্ণতা বাড়াতে প্রসারণও চলতে লাগল। এই উষ্ণতা দশ লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছালে নক্ষত্রের নিউক্লিয় বিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ফলে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি হতে থাকায় প্রচণ্ড শক্তি বিকিরণ হতে থাকে। তখন সংকোচন এক রকম থেমে থাকে। নিউক্লিয় বিক্রিয়ার মত হাইড্রোজেনের সমস্থানিক ডয়টেরিয়াম থাকবে নক্ষত্রে। তাতে সাম্যাবস্থা সৃষ্টি হবে। এই ডয়টেরিয়াম কমতে থাকলে মহাকর্ষীয় বলকে আর ঠেকান যায় না। তেজস্ক্রিয়তার অভাবে আবার সংকোচন আরম্ভ হবে। এই সংকোচনে আবার নক্ষত্রের মধ্যে উষ্ণতা বাড়তে থাকে। ফলে আবার সংকোচন থেমে যায়।

এইভাবে চলতে চলতে সমস্ত হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হলে আবার মহাকর্ষীয় বল চেপে ধরে। এর ফলে আবার উষ্ণতা বাড়ে। এদিকে বাইরের আবরণে কিছু হাইড্রোজেনের দহনে আবার প্রসারণ ক্রিয়া চলে। নক্ষত্রের ব্যাস তখন বেড়ে যায় একশ গুণ। বিজ্ঞানীরা এই অবস্থার নাম দিয়েছেন লাল দানব।

এমন সময় সূর্যের চেয়ে বড় নক্ষত্রে তাপ এত বেশি হতে থাকে যে হিলিয়াম পুড়ে কার্বন অক্সিজেন তৈরি হতে থাকে। এইভাবে হিলিয়াম পুড়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত, নক্ষত্র সাম্যাবস্থায় থাকে। আবার এই হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম সৃষ্টি হতে থাকে নক্ষত্রের লাল দানব অবস্থায়। এইভাবে চলতে থাকায় নক্ষত্রের নিউক্লিয় জ্বালানি কমে যায়। ফলে বহির্মুখী চাপ কমে যাওয়ায় মহাকর্ষীয় চাপ রুখতে পারে না। এই চাপে নক্ষত্র যত ছোট হতে থাকে, ভেতরের পরমাণু থেকে ইলেকট্রন ছুটে বেরিয়ে আসতে থাকে। তার থেকে উদ্ভূত ইলেকট্রন গ্যাস বা ফের্মি গ্যাস বাইরে চাপ সৃষ্টি করে। তার বাধায় মহাকর্ষীয় সংকোচন থেমে যায়। ছোট আকারের এই কম দীপ্তির নক্ষত্রই হল শ্বেত দানব।

এই শ্বেত দানব ছোট হওয়ার ফলে উষ্ণতা খুব বেশি হয় বলেই সাদা দেখায়। আবার অতিকায় নক্ষত্রগুলিও (সুপার নোভা) বিস্ফোরণের ফলে শ্বেত দানব

অবস্থা ধারণ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের উপর ব্যাসার্ধের আকার নির্ভর করছে।

শ্বেত দানবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আর্থার এডিংটনের মত হল, এই অবস্থাতেও সে শক্তি বিকিরণ করে যাবে। জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে তার মৃত্যু হবে। চন্দ্রশেখর এ মৃত্যু মেনে নেননি। তিনি বললেন, সব নক্ষত্র এই ভাবে মরে না। নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের দেড়গুণ কম হলে ভেতরের ইলেকট্রনের বহির্মুখী গ্যাসের চাপ মহাকর্ষীয় সংকোচনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। এই শ্বেত দানব অবস্থা তখন স্থায়ী হয়। নক্ষত্রের ভর যদি তার বেশি হয়, নক্ষত্রটি সংকোচনের ফলে ছোট হতে থাকে। ইলেকট্রনগুলো তখন বহির্মুখী চাপ হারিয়ে নিউক্লিয়াসের প্রোটনের উপর প্রবল বেগে পড়ে নিউট্রন সৃষ্টি করবে। ইলেক্ট্রন যদি না থাকে তার গ্যাস ও চাপ কিছুই থাকে না। এই সুযোগে মহাকর্ষীয় বল নক্ষত্রকে আরও চাপতে থাকে। ফলে সে আরও ঘনত্ব পেয়ে ছোট হয়ে যায়। সাড়ে চার লক্ষ মাইল ব্যাসার্ধের নক্ষত্র তখন কমে ৫ থেকে ৫০ মাইল ব্যাসার্ধে দাঁড়ায়। তখন এর নাম হয় নিউট্রন নক্ষত্র।

নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের দ্বিগুণ বা তারও বেশি হলে মহাকর্ষীয় বল এত বেড়ে যায় যে, সেখান থেকে কোন আলো বেরিয়ে আসতে পারে না। সবই হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়তে থাকে কেন্দ্রের ছোট পরিসরের মধ্যে। তখন আর তাকে দেখা যায় না। চিরদিনের জন্য তার মৃত্যু হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিকগণ তার নাম দিয়েছেন কৃষ্ণ গহ্বর বা ব্ল্যাক হোল।

সূর্যের ভরের দেড়গুণ, এইটিই চন্দ্রশেখর সীমা। নক্ষত্রের ভর এই হিসাবের মধ্যে থাকলে তাকে বলা হয় শ্বেত দানব, এর বেশি হলে সৃষ্টি হয় নিউট্রন নক্ষত্র বা কৃষ্ণ গহ্বর। র‍্যালফ হাওয়ার্ড ফাউলার ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে সত্যেন বসু, আইনস্টাইন, ফের্মি, ডিরাক কর্তৃক কোয়াণ্টাম সংখ্যায়নের নিয়মকানুন অনুযায়ী শ্বেত দানবের ব্যাখ্যা দেন। তিনিও এডিংটনের সিদ্ধান্তে আসেন। চন্দ্রশেখর তাকে আরও প্রসারিত করে কৃষ্ণ গহ্বর পর্যন্ত আনেন। ১৯৩৩ সালে তিনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের উপর নির্ভর করে শ্বেত দানবের ব্যাখ্যা দেন।

আপেক্ষিকতাবাদ পাশাপাশি স্তরের হিসাব দিলেও গভীর কেন্দ্রের হিসাব দিতে পারেনা, তা পূর্বেই দেখানো হয়েছে। কাজেই চন্দ্রশেখরের আবিষ্কার একটা সীমা পর্যন্ত এসেও একক ক্ষেত্র তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। সেখানে

পদার্থ বিজ্ঞানের কথা বলা হলেও রসায়নের কথা তেমন বলা যেতে পারে না। একক ক্ষেত্রতত্ত্ব সব কিছুকে নিয়েই।

কেন্দ্রের ঘোরারও স্থান নাই। তাই গাড়ির চাকা ঘুরলেও গাড়ি চলে কিন্তু গাড়ি ঘোরে না। কেন্দ্রের যেহেতু প্রসার নাই তাই সে ঘুরলে পথ অতিক্রম না করলেও তার প্রসারের দিক ঘোরে, পথ অতিক্রম করে। এই প্রসারিত চাকার বেষ্টনী খুলে ফেললে দেখা যাবে কেন্দ্রের তুলনায় মুখের দিক কত প্রসারিত পথ। সেই পথ কেন্দ্রের দিকে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। সেখানে যা কিছু ফেলা যায়, প্রসারণ গ্রাস করতে পারে, কিন্তু ক্রম সূক্ষ্ম বস্তু ছাড়া কেন্দ্র নিতে পারে না। ক্রম সূক্ষ্ম বস্তু কেন্দ্রে চলতে থাকে, আর স্থূল বস্তুগুলো সূক্ষ্মের সঙ্গী হয়ে এসে প্রসারে জমতে থাকে। স্থূলতার জন্য কেন্দ্রে সে চাপ সৃষ্টি করতে পারে না। এই কারণেই পৃথিবীর সমস্ত বস্তু প্রয়োজন মত আবহাওয়া থেকে আকর্ষণে বস্তু নেয়। সঙ্ঘবদ্ধ স্থূল বস্তুরা অনুপোযোগী হওয়ায় কেন্দ্রে চাপ সৃষ্টি করতে যায় না। তবু সে আকর্ষণে ধরা আছে। সূক্ষ্ম বস্তু নিয়ে কেন্দ্র নিজে পুষ্ট হয়ে আরও সূক্ষ্ম কম বস্তু ছেড়ে দেয়। কেন্দ্রের ছোট মুখের মত ছোট মুখযুক্ত একটা জালা বৃষ্টিতে বসিয়ে রাখলে তাতে কম বৃষ্টি পড়বে। কিন্তু তার গায়ে বেশি পড়লেও গড়িয়ে পড়ে যাবে।

কেন্দ্র আকর্ষণ করে সূক্ষ্মতা সৃষ্টি করে। বিকর্ষণে ক্রম স্থূলতায় স্থূল বস্তু সৃষ্টি করে। শরীরের তুলনায় মুখ বড় জালা বৃষ্টিতে বসিয়ে রাখলে জল বেশি জমে স্থূলতা সৃষ্টি করে। বৃষ্টি সব স্থানে সমান হলেও সব পাত্র ক্ষমতা অনুযায়ী নেয়। তাই আমরা আবহাওয়ার চাপে মরি না।

পৃথিবীর কেন্দ্রের প্রসারের উত্তাপ গবেষণাগারে আগুনের উত্তাপে সৃষ্টি করা যায়, পৃথিবীর কেন্দ্রের সংকোচনের ঠাণ্ডাও শীতলতা দিয়ে সৃষ্টি করা যায়। সংকোচনের চাপ চরম হলে আবার চরম কেন্দ্র থেকে প্রসারের উত্তাপ সৃষ্টি হতে চাইবে। এই প্রসারের শক্তি চরমে এলে বাইরের চাপ আবার তাকে শীতল করতে চাইবে। এই ভাবে নক্ষত্রের মৃত্যু হয়। কিন্তু আবার জাগে। যদি সে না জাগে অন্যের জাগরণের খোরাক হয়। হাইড্রোজেন বোমা অসীম শক্তি সম্পন্ন। তা সৃষ্টি হয় হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে রূপান্তরিত করার পথে। বোমার তেজস্ক্রিয়তার তুলনায় হিলিয়াম ঠাণ্ডা। কারণ আকর্ষণ বিকর্ষণের তেজস্ক্রিয়তা কমে গিয়েছে।

নানা টানা পোড়েনে সূর্য গ্রহ উপগ্রহ নিরেট থাকে না। সবার কেন্দ্রভিত্তিক

আকর্ষণ বিকর্ষণ পরস্পরকে টেনে রেখেছে আবার বিচ্ছিন্ন রেখেছে। ইলেকট্রনদের নিয়ে পরমাণু যেমন একটাই, গ্রহদের নিয়ে সৌরজগৎ তেমনি একটাই। সৌরজগতের গ্রহদের উপগ্রহ যেমন দেখতে পাই, পরমাণু জগতের ইলেকট্রনদের উপগ্রহ আছে বাষ্পাকারে। এই বাষ্প ক্ষয় হয়ে ও ইলেকট্রন ক্ষয় হয়ে যেমন শক্তি প্রকাশিত হয়, তেমনি সৌরজগতেরও গ্রহ উপগ্রহ বিচ্যুত হতে হতে শক্তি প্রকাশিত হয়। এই ক্ষয়ে এক পরমাণু অন্য পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। এইভাবে এক ইলেকট্রনযুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণু সৃষ্টি হতে পারে। চাপে আবার একাধিক ইলেকট্রনের পরমাণু সৃষ্টি হতে পারে অন্যান্য পরমাণুর যোগাযোগে। সৌরজগতের গ্রহরাও তেমনি বিচ্যুত হয়ে চলেছে। শেষদিক থেকে একটা করে গ্রহ হারিয়ে যাচ্ছে, সেখানে তার পেছনের গ্রহ এসে দাঁড়াচ্ছে। পৃথিবী একদিন মঙ্গলের স্থানে এলে পৃথিবীর স্থানে শুক্র এসে দাঁড়াবে। চাঁদে মানুষ যাওয়ার আগে প্রকাশিত 'মঙ্গলের দিন' পুস্তকে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলাম। এই প্রসঙ্গে সেদিন এক ভদ্রলোক আমাকে বলেন, এই থিওরি যে অভ্রান্ত তা রাশিয়ার মহাকাশ যান প্রমাণ পেয়ে এসেছে। আমি বললাম, আমি প্রমাণ পেয়েছি অনেক আগে। আমার সে প্রমাণের আর দরকার নেই। তারা যে এই থিওরি বিশ্বাস করেছে, তাতেই মঙ্গল।

পৃথিবীরও একদিন শুক্রের মত আবহাওয়া ছিল। শুক্রেরও একদিন পৃথিবীর মত আবহাওয়া হবে সূর্য থেকে বিচ্যুত হতে হতে। এমনি ভাবে কেন্দ্রভিত্তিক বিচ্যুত সৃষ্টির মূলে কাজ করছে। পৃথিবীর পরে হাইড্রোজেন বেলুন ছেড়ে দিলে পৃথিবী থেকে বিচ্যুত হতে হতে তার উপযুক্ত স্থানে গিয়ে দাঁড়াবে। আবার বিস্ফোরণে মহাকাশ যান পৃথিবী থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। পৃথিবী একদিন আকারে ছোট ছিল বলে স্থলভাগ কাছাকাছি থাকায় এক মহাদেশ বলা হয়েছে। সেই পৃথিবী প্রসারিত হতে থাকায় সেই মহাদেশ বহু ভূখণ্ডে ভাগ হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর প্রসারণে তারা বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে।

পূর্বে ধারণা ছিল শুক্রে সবুজের সমারোহ। রুশ বিজ্ঞানীরা ভেনেরা মহাকাশ যান পাঠিয়ে খবর নিয়েছেন, শুক্রে সবুজ বনাঞ্চল দূরের কথা সবুজ রঙই সেখানে নেই। ঘন মেঘের বাতাবরণের নিচে ঠিক দুপুরও ম্যাটমেটে হলদে। আকাশের প্রসার কম বলে হলুদ স্তর ভেদ করে পৃথিবীর মত সাদা ঝকঝকে দুপুর সৃষ্টি হতে পারে না। ঘন বায়ুমণ্ডলে কারবণ-ডাই-অক্সাইড আছে প্রায় ৯৭ পার্সেন্ট পরিমাণে। জলকণা, নাইট্রোজেন, বিভিন্ন নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে অতি

সামান্য। চারদিকে শুধু কমলা রঙের উষর মরু ধূ ধূ করছে। তবে সেখানে উপত্যকা, ইসতার ল্যাণ্ড আছে। আছে এভারেস্টের চেয়ে উঁচু পর্বতশ্রেণী, ম্যাকসওয়েল রেনজ। পৃথিবীর মত সেখানে জল বৃষ্টি হয় না, হয় সালফিউরিক অ্যাসিডের বৃষ্টি—যা আরসেনিক আর অ্যানটিমনির অক্সাইড মিশ্রিত।

শুক্রকে বাসোপযোগী, করবার জন্ত বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, যে জীবাণু কারবন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে সেই জীবাণু সেখানে ছেড়ে দিলে কারবণ-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে অক্সিজেন ছড়িয়ে দেবে। পৃথিবীর মত আবহাওয়া সৃষ্টি তাতে ত্বরান্বিত হয় কিনা ভেবে দেখতে হবে। সূর্যের যে স্তরে পৃথিবী ভাসছে, সেই স্তরে হয়তো ক্রমে শুক্রকে আসতে হবে। তখন সালফিউরিক অ্যাসিড বৃষ্টি ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হতে থাকবে জলের বৃষ্টিতে। এক বস্তু থেকে আর এক বস্তু আপনা থেকে সৃষ্টি হয় না। কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণের আবহাওয়ারও প্রয়োজন হয়। সেই ভাবে সৃষ্টি হবে জল, জ্বালানী ইত্যাদি। পৃথিবীর পেট্রোল, কয়লা ইত্যাদিকে পুরো জৈব ভাবলে চলবে না। জৈবরা পেট্রোল, কয়লা সৃষ্টির রসদ যে প্রকৃতি থেকে পেয়েছে, সেই প্রকৃতিও তাকে সরাসরি রসদ দিচ্ছে।

ঠাণ্ডায় জল বরফ হয়, আবার গরমে বরফ জল হয়। সর্বত্র মাটির তলায় কয়লা হয়না, তেলও হয় না। বরং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইউরেনিয়মের খনিতে ইউরেনিয়ম সৃষ্টি হয় এবং স্থায়ী হয়। অন্তত্র আনলে তা তেজস্ক্রিয় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ক্ষয় হতে থাকে আবহাওয়ার আঘাতে। চরম আঘাত পেলে তো বোমের মত ফেটে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। এমনি ভাবে জলের আবহাওয়ায় জল সৃষ্টি হয়। সেই ভাবে শুক্রে জলের ভাগ আজ সামান্ত হলেও বাড়বে। এই ভাবে শুধু সে পৃথিবীর মত হবে না, পৃথিবীর স্থানও দখল করতে আসবে। পৃথিবী তখন মঙ্গল হতে চলবে।

পাঁচ

সৌরজগতের মত একটা পরমাণুকে কণা জগৎ বললে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কেন্দ্রের নেতৃত্বে সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি নিয়ে একটা সৌরজগৎ সৃষ্টি হয় তেমনি কেন্দ্রের নেতৃত্বে প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন নিয়ে একটা

পারমাণবিক জগৎ সৃষ্টি হয়। পরমাণুর মধ্যে এই সব বস্তুর আকর্ষণ বিকর্ষণে যেমন ভাবময় গ্যাসের শূন্য সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি সৌর জগতের মধ্যেও আকর্ষণ বিকর্ষণে ভাবময় আকাশ সৃষ্টি হয়েছে।

তাদের চলা ফেরা সবই গোলাকৃতি ঘেঁসা, কারণ তাদের আকার ও বস্তুর পার্থক্যের নানা প্রতিক্রিয়া। নানা বস্তুর নানা শক্তি যেমন চলার পার্থক্য আনে তেমনি তার আকারেরও। এই সব কারণে বাইরের প্রভাব বস্তুর ঠিক কেন্দ্রে পড়ে না, আবার ঠিক কেন্দ্র থেকে সরতে চায় না। এই কারণেই তারা ঠিক কেন্দ্রে স্থিতি না পেয়ে চলা পেয়েছে। প্রতিটি চলার ভরে আঘাত আছে বলে চলতে থাকে। পরমাণুতে আঘাত করলে ভরের আবরণ ছিঁড়ে যায় বলেই শক্তি প্রকাশ করে। ভর সর্বত্র আবরণের কাজ করে। কঠিন বস্তুর আবরণ কঠিন, জলের বা অন্যান্য তরলের আবরণ নমনীয় এবং গ্যাসের আবরণ আরও নমনীয়। কঠিনের আবরণ ছিঁড়তে আঘাত করতে হয়। কারণ তার অন্তর্মুখী পূর্ণতা বেশি। জলের অন্তর্মুখী পূর্ণতার চেয়ে বহির্মুখী পূর্ণতা ও ভারীত্ব কিছুটা বেশি বলেই সে নিচের দিকে গড়ায় প্রতি ক্ষেত্রে চাপ দিতে দিতে। গ্যাস আকাশে উঠে যায়, কারণ তার ভর কিছুটা থাকলে আবহাওয়ার তুলনায় ওজন তেমন নাই। আকাশে সে উঠে গেলেও, আবহাওয়া অতি আলতো ভাবে চারদিক থেকে চেপে রাখতে চায়, কিন্তু তেমন পারে না। তার বহির্মুখী চাপ উপর দিকে আপেক্ষিক শূন্যতা পাওয়ায় সেখানে আঘাত করতে থাকে। নিচের দিকে হলেও পথ সূক্ষ্ম হলে যে গতিতে যাবে, ভিজে হলে যাবে তার চেয়ে বেশি গতিতে। সেখানে পথের আপেক্ষিক শূন্যতাজনিত আকর্ষণ কম থাকে। ফলে ভর মূল গতির দিকে থাকায় তার পরে চাপ পড়ে বেশি। তাতে জল গড়াতে থাকে। এই গড়ানোর মূল কথা বর্তুলতা। বর্তুলতার কারণ চারদিকের সমান চাপ, এই সমান চাপের কারণ কেন্দ্র।

একই কেন্দ্রের বিভিন্ন কর্মের কারণ বলা হল। মাতৃজঠরে শিশু একটা নাড়ির সাহায্যে পুষ্ট হয়। সেই নাড়ি যেখানে সংযোজিত থাকে তাকে বলে নাভি। সেই নাভি হল শরীরের কেন্দ্র। প্রসবের পর যখন সেই নাভির নাড়ি কেটে দেওয়া হয়, তখন আমরা খাদ্য খেয়ে পুষ্টতা বজায় রাখি। তখন আর নাভির কাজ না থাকলেও তার কাছের পাকস্থলির কাজ থাকে। তখন বলব শরীর পাকস্থলি কেন্দ্রিক যতই হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক নিজের নিজের কাজ চালাক। পাকস্থলির খাদ্যরস না পেলে তারা বাঁচতে পারে না। কোন শক্তি একবার

ছাড়লে চিরদিন চলতে পারে না, চলার পথে পাকস্থলির কেন্দ্রের মত রসদ যোগাতে হয়। তাই ভেতরকে জানলে সব হবে না, ভেতরের সঙ্গে মানিয়ে বাইরকেও জানতে হবে। আমরা কোন খাদ্য গিলতে গেলে, অন্ননালীর সংকোচন প্রসারণের কাজ চলে খাদ্য অনুযায়ী। সেই খাদ্য গিয়ে পাকস্থলিতে পৌঁছানো পর্যন্ত এই পথের গুরুত্ব কমে না। সেখান থেকে খাদ্যরস অন্যত্র যেতেও অন্য পথের গুরুত্ব পায়। এমনি নিয়ম শরীরের বাইরের প্রকৃতি জগতেও চলছে। নাভি কেন্দ্রিক নাড়ির অবর্তমানে পাকস্থলী যে শরীরের কেন্দ্র আরও প্রমাণিত হয়, যখন ব্লাড ব্যাঙ্ক নাভির নিচের রক্ত না নিয়ে উপরি ভাগের রক্ত নেয়। এ ক্ষেত্রে তারা মস্তিষ্ক কিংবা হৃদপিণ্ডের গুরুত্ব দেয় না, যদিও তারা জীবনের ক্ষেত্রে ছোট নয়। নাভির নিচের ভারী হাওয়া মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যায়, উপরের হাওয়া ঢেকুর হয়ে বেরিয়ে যায়। এই হাওয়া জীবন বায়ু হয়ে ক্রমে আরও সূক্ষ্ম হতে হতে এমন স্থানে যায়, যেখানে পূর্বোক্ত হাওয়া যেতে পারে না। এইভাবে বস্তু আকাশের মত শূন্যতায় ওঠে। এইভাবে পৃথিবীর আকাশও সৃষ্টি।

আবার সেই পরমাণুর বিষয়ে ফিরে আসা যাক। সেই পরমাণুর মধ্যেও শূন্য সৃষ্টি হচ্ছে আবার বস্তু সৃষ্টি হচ্ছে। পদার্থ বিজ্ঞান রসায়ন বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান সহ সমস্ত বিজ্ঞান হাত ধরাধরি করে চলেছে কেন্দ্রের আজ্ঞায়। এর একটি বিভাগ নিয়ে পড়ে থাকলে একক ক্ষেত্র তত্ত্বে পৌছানো সম্ভব নয়। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক কেন্দ্রভিত্তিক বিচার করে দেখতে হবে। কোয়াণ্টাম তত্ত্বের মধ্যেও মূলকে পাওয়া যাবে না, কারণ সেখানে গুচ্ছ শক্তি কাজ করছে। তার মূল্য বহির্জগতে থাকলেও সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে মূলে। এই পাঁচ মেশালীও কিন্তু চলেছে নানা কেন্দ্রে বাঁধা পড়তে। তা না হলে মিলন শৃংখল সৃষ্টি হত না আবার এক হয়ে বহু হওয়ার জন্য।

প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন কেন্দ্রভিত্তিক ঘুরে পরমাণু সৃষ্টি হয়েছে। নিউট্রন কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণে বিকর্ষণে সৃষ্টি হলেও, সে আবার প্রয়োজনে বাকী কণাগুলোকে ও তাদের চারিত্রিক গ্যাসকে পুষ্ট করছে। সব সময় তার উপর চাহিদা রাখলে পুষ্ট হতে পারত না। অবশ্য তা ছাড়াও সরাসরি বাইরের সঙ্গে আকর্ষণে বিকর্ষণেও পরমাণুর কণাগুলো পুষ্ট হচ্ছে আবার ক্ষয়ও হচ্ছে। তাই সূর্যকে যদি সূর্য বলতে হয়, তবে পরমাণুর প্রোটনকে পরমাণুর সূর্য বলতে হবে। প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন ও তাদের গ্যাস নিয়ে যদি পরমাণু হয়, তবে গ্রহ উপগ্রহ এবং তাদের গ্যাসীয় আকাশ নিয়ে সূর্য হতে

হবে। বর্তমান সূর্যকে যদি সূর্য বলতে হয় তবে সৌরজগৎকে অন্য নামে পরিচয় দিতে হয়। যদি তার অন্য নাম না দেওয়া হয়, তবে বর্তমান পরমাণুকেও পরমাণু জগৎ বলতে হয়। এত কথা বললাম সেন্টারিজমের অব্যর্থতা বোঝাবার জন্য।

বর্তমান সূর্যের মত কোন জ্যোতিষ্ক না থাকলেও কেন্দ্র থাকতে পারে। ধরা যাক, গ্রহের সূর্য থাকলেও সূর্যের কোন মহাসূর্য নাই। তবে সূর্য কাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে? তবে কি কেন্দ্রবাদ মার খেয়ে যাবে? না। গ্রহের তুলনায় যেমন সূর্য বড়, সেই সূর্যের তুলনায় আরও বড় একটা মহাসূর্যের প্রয়োজন হতে পারে। সে অভাব পূরণ করছে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কেন্দ্র। তাকে ভিত্তি করে সব কিছু ঘুরছে, পুষ্টি হচ্ছে, এবং ক্ষয় হচ্ছে। আসলে বর্তমান সূর্যও তো এমনি। তার কেন্দ্রকে কি আমরা দেখতে পাই? পরমাণুর ইলেকট্রনে যদি মানুষ বাস করত সে সূর্যকে দেখতে পেত না। সে দেখত কেন্দ্রই তাদের সূর্য হয়ে চালাচ্ছে। এই কেন্দ্র গুলোই শক্তি অনুযায়ী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সূর্যের জ্যোতিসহ সূর্যকে ধরলে অনন্ত বিশ্বে ব্রহ্মাণ্ড তবে একটা অনন্ত সূর্য। সূর্যের কেন্দ্র না হলে যেমন গ্রহ জগৎ বাঁচে না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেও বাঁচতে একটা সূর্যের কেন্দ্র না হোক সমগ্রের কেন্দ্র প্রয়োজন।

পরমাণুর ভর যেমন প্রচণ্ড শক্তি প্রকাশ করে, তেমনি ভর আছে সৌর-জগতের। সে আরও বিরাট শক্তি প্রকাশ করতে পারে যদি তাকে পরমাণুর মত হাতুড়ি দিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া যায়।

সূর্যের মধ্যে গ্রহরা বাস করে। পরমাণুর ইলেকট্রনের মতন গ্রহদের মধ্যে তেমনি উপগ্রহরা বাস করে, তাদের অণুদের মধ্যে তেমনি পরমাণুরা বাস করে। আবার সেই পরমাণুর মধ্যে কণারা বাস করে, ভাবপারের গ্যাস বাস করে। সে গ্যাসে স্থূল আকারের পরমাণু না থাকলে সেই চরিত্রের কণাভাব বাস করে। তাদের মধ্যেও এমনি আরও কত সূক্ষ্মতা চলছে, তার অন্ত নাই, বিরাটের ও তেমনি অন্ত নাই। এই সূক্ষ্মতা থেকে বিরাটের জন্য কাজ করে চলেছে কেন্দ্ররা বস্তু ও শূন্যতা দিয়ে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর অস্তিত্ব কেন্দ্রের উপর নির্ভর করছে! সে শূন্যতা দিয়ে পরমাণু গড়ছে, আবার ভর দিয়ে বস্তু গড়ছে। ভরের চাপ প্রচণ্ড হলে অণু পরমাণুর আকাশ ভেঙ্গে ইলেকট্রনের পথ বন্ধ করে নীরেট করে দেয়।

পরমাণুর সেখানে দাম কোথায়? সেখানে কেন্দ্রের যোগাযোগ যদি না থাকে তবে বস্তুটাই একটা কেন্দ্র হয়ে তার বাইরের সঙ্গে আকর্ষণ বিকর্ষণ চালাবে। আবার সেই বস্তুকে জীর্ণ করে তার ভেতরে কেন্দ্র ঢুকতে থাকে তার শূন্যতা পূর্ণতা নিয়ে। প্রবল চাপে কেন্দ্র থেকে ধূমকেতুর মত আলো বেরিয়ে যায় তাকে আলাদা একটা জ্যোতিষ্ক মনে ভাবলেও টর্চের মত এক.ট উৎস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই উৎসের মধ্যে আমরা বাস করছি বলেই আমরা তার উৎস খুঁজে পাচ্ছি না। ধূমকেতুর উৎসের দিক বোঝা যায় পুচ্ছের গোড়ার দিকে শুরু বলে। আলো তো উৎস থেকে ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হয়ে চলে। এই আলো পৃথিবীর আলোর তুলনায় ভারী। সেই পথে স্পুটনিক চালালে, চলা সহজ হতে পারে। পৃথিবীর আলোর তুলনায় সে আলো বেশী বস্তু ঘেঁসা। তবে আমরা যে পৃথিবী থেকে তার আলো দেখি তা ছেঁকে আসায় পৃথিবীর উপযোগী।

বস্তুর উপর আলো ফেললে, ভেতরে যায় না। সেই বস্তুকে গ্যাসে পরিণত করলে আলো তার ভেতরেও প্রবেশ করে। সেখানে আলোক কণা ঢুকে সংঘর্ষ বাঁধানোতে আলো দেখতে পাই। সেই বস্তুকে আবার কঠিন করলে আর আলো ভেতরে দেখা যাবে না। সেখানে অন্ধকার। তাহলে দুয়ের সংঘর্ষের রূপ আলো, স্থিরতার রূপ অন্ধকার। এই স্থিরতা যত নিবিড় হতে থাকবে, ফলে বস্তুর ভেতর যত আলো কমতে থাকবে তত সে বস্তুটির অণুপরমাণুরা হুড়মুড় করে তার কেন্দ্রে ভেঙ্গে পড়বে কৃষ্ণ গহ্বরের মত। ভেতরে স্থিতিশক্তি ছাড়া বস্তু অস্তিত্ব রাখতে পারে না। শক্তির প্রসারিত রূপই তো আলো। কোন কিছু কেন্দ্রে না ভাঙ্গলে বস্তুর অভাবে কিন্তু বস্তু নিরেট হয় না। বাইরে ভাঙ্গলে নিরেট না হয়ে শক্তিতে প্রসারিত হয়। নিরেট বস্তুর অন্ধকারে আলো ঢুকতে পারে না অস্বচ্ছতার জন্য, নইলে আলো ঢুকতে বাধ্য। অন্ধকার ছাড়া আলো বাঁচে না।

অন্ধকার সংকোচনে বাঁধা পড়ে। সঙ্কুচিত অস্বচ্ছ বস্তুর আবরণ না থাকার জন্য অন্ধকার বাঁধা পড়ে। অন্ধকার তাই স্থায়ী হতে পারে। প্রসারণ না হলে আলো থাকে না, তাই তাকে স্থায়ী করা যায় না। তবে তার শক্তি বস্তুর চেহারাকে স্থায়ী ভাবে পাল্টিয়ে দিতে পারে। এমনি পাল্টানোর স্বভাবে একদিন না একদিন স্থায়ী অন্ধকারকেও অস্থায়ী করে দেয়। এই নিয়মে কৃষ্ণ গহ্বর একদিন আলোর রঙ ফিরে পায়। কৃষ্ণ গহ্বরের কেন্দ্রে সব কিছু

গ্রাসের অর্থ, অন্য পথে সৃষ্টি হওয়া। সে পথে নির্গমনজনিত তাপ সৃষ্টি হবে। কৃষ্ণ গহ্বরের আহরিত বস্তু যে পথে ছাড়তে হবে, এই পথে আরও বস্তুকে স্থান দেওয়ার জন্য। তা হলে একেরই দুই রূপ আলো ও অন্ধকার।

তাপ সম্প্রসারণে চলে। তাপ কমতে থাকলে সংকোচনে বস্তু অন্ধকারে ডুবে যায়। তাপকে ধরে রাখা না গেলেও তার গুণকে ধরে রাখা যায়, সে কথা বলেছি। তাপের কাজ শুষ্ক করা। তাপ যেমন জল টানতে পারে, তার কৃত শুষ্কতাও তাপের অবর্তমানে জল টানতে পারে। শীতের শুষ্কতাও তেমনি সূর্যের তাপ থেকে পাওয়া। তাপ শূন্যতা সৃষ্টি করছে। সেই শূন্যতা সব কিছুকে আকর্ষণ করে। সেই তাপের সৃষ্টি কেন্দ্রের মধ্যেই। কেন্দ্রের এই তাপ শূন্যতা সৃষ্টি করে ভেতরে আকর্ষণের দ্বারা শীতলতাকে আনে। এই আকর্ষণের শীতলতা বস্তু সৃষ্টি করে। সেই বস্তুর মধ্যে আবার কেন্দ্র সৃষ্টি হতে বাধ্য বহিরাগত ধারার আকর্ষণ বিকর্ষণের জন্য। সেই কেন্দ্র আবার পূর্বের কেন্দ্রের চরিত্রে চলে। কেন্দ্র ধ্রুব বলেই কেন্দ্র অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ। কেন্দ্রের তাপ যে জল শোষণ করে সে জল অন্যস্থানে বিতাড়িত হয়। সেই সব স্থানও কেন্দ্রভিত্তিক। সেই একক ক্ষেত্রতত্ত্বের জন্মদাতা কেন্দ্র ছাড়া কোন কিছুকে কল্পনা করা যায় না।

নানা প্রসারণ ও সংকোচনে সবকিছু সৃষ্টি হচ্ছে। বস্তুর চেয়ে তার শক্তি প্রসারশীল বেশী। বস্তু খানিকটা জড়ভাবে থাকতে চায়। বস্তু ও শক্তির অসমভাবে ঘা খাওয়ার ফলে কাঠে কাঠে ঘা লাগে না। অসমানভাবে ঘা লাগে। এর থেকে সৃষ্টি হয়েছে কৌণিক ভরবেগ (angular momentum)। এর ফলেই নানা বস্তু গঠিত হচ্ছে আর ভাঙছে। এই বিরামহীন সৃষ্টির মূলে সর্বদা কাজ করে চলেছে কিন্তু কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষন বিকর্ষণ জনিত শূন্যতা ও পূর্ণতা।

সূর্যের আকাশ স্তরে স্তরে বেষ্টনে ঘেরা। সেই আকাশের এক একটি বেষ্টনের মধ্যে এক একটি গ্রহ থাকে। প্রত্যেকে এই সব বেষ্টনের মধ্যে পড়ে ঘুরছে বলে গোলাকৃতি ধারণ করেছে। গোলাকার বেষ্টনে ঘা খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে এমন গোলাকার হয়ে গিয়েছে যে, তার থেকে সূর্যের মধ্যে বিরোধী গোলাকারে চালিত ধারায় ঘা খেয়েও চ্যাপটা হয় না। সূর্যের চারদিকে ঘোরার ফলে চ্যাপটা হওয়ার সময়ই পায় না। ঘোরার ফলে তারা যে ঝড় তুলে যাচ্ছে, তা সর্বক্ষণই চারদিকে ছড়িয়ে পৃথিবীকে রক্ষা করছে,

যেমন পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন রক্ষা পাচ্ছে। এই ঝড়ের মধ্যেই সব কিছু:ক একই নিয়মে আসতে হবে। কানটের নীহারিকা তত্ত্বেও এই সেণ্টার ভিত্তিক চরিত্র থাকতে বাধ্য। তাঁর মতে নীহারিকার বস্তুকণার বিবর্তনে জন্মেছে সূর্য ও তার গ্রহরা।

ইলেকট্রন যেমন রাসায়নিক যৌগ গঠনে দরকার হয়, তেমনি সূর্যের ইলেকট্রনসম গ্রহরাও সৌরজগতে রাসায়নিক যৌগ গঠন করে চলেছে। পরমাণুর ইলেকট্রন থাকে বলে গ্রহণ বর্জন হয়, কিন্তু তার থেকে ইলেকট্রন সরিয়ে নিলে শুধু সে গ্রহণ করতে চাইবে। এই ইলেকট্রনই জানায় পরমাণুর গঠন ও মৌলিক রাসায়নিক ধর্ম। সৌর জগতের গ্রহরাও এই চরিত্রের মত কাজ করে।

ইলেকট্রিক তারের প্রবাহিত শক্তি বাল্বের সূক্ষ্ম তারে আলো জ্বালে। আমাদের শরীরের শক্তি তেমনি আঙুল ইত্যাদির ডগাপথে প্রকাশ পায় বেশি। তাই অনেক সময় দেখা যায় উড়ন্ত মশার দিকে শরীর এগিয়ে নিয়ে গেলে ভয় না পেয়ে শরীরে বসে। আঙুল এগিয়ে নিয়ে গেলে অন্যত্র পালিয়ে যায়। পৃথিবীর কেন্দ্র সূক্ষ্ম স্থানে। তাই সেখানে সমগ্র পৃথিবীর শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে বাল্বের তারের মত পথ না পেয়ে পৃথিবীর শরীর পথে ছড়িয়ে উঠতে বাধ্য হয়। সেখানে শক্তি তার কমে যায়। এই শক্তি কমার মধ্যে বস্তু গড়ার ইঙ্গিত আছে। অল্প তাপ বিকিরণের শূন্য স্থানে যে পরিমাণ বস্তুর ধারা প্রবেশ করে তা বেরিয়ে আসতে না পেরে বস্তু সৃষ্টি করে।

গ্রীক পুরাণের একটা চরিত্রের নাম অনুসারে একটা গ্রহাণুর নাম ইরস (Eros)। সেটি অবস্থান করে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যবর্তী স্থানে। এই গ্রহাণু লম্বায় ২৪ কিমি আর চওড়ায় ও উচ্চতায় মাত্র ৪ কিমি। এই লম্বা প্রকৃতির গ্রহাণুর লম্বা দিকে সূর্যের আলো পড়লে বেশি উজ্জ্বল দেখায়। এই লম্বাদিক ছাড়া অন্য দিকে আলো পড়লে তেমন উজ্জ্বল হয় না।

এই অনুজ্জ্বল দিকে আকর্ষণ বেশি, উজ্জ্বল দিকে বিকর্ষণ বেশি। ফলে সেদিকের বাইরের বিরোধী শক্তি সংঘাতে আলো প্রকাশ করে বেশি। এই ইরসের দুই প্রান্ত নিশ্চয় দুই রকমের গোলাকার ও সূচালো। এই দুই ধরণের মুখে ইলেকট্রিক বাল্বের তারের মত আপেক্ষিক সরু হয়। সূর্য গ্রহ উপগ্রহদের সবদিক গোলালো বলেই সব দিক থেকে আলো বিকিরণ করে। তাদের সেণ্টার শারীরিক মধ্যস্থলে বলে সবদিকে সমান আকর্ষণ বিকর্ষণ চলে। গোলাকার

বস্তুর সবদিক উঁচু, কিন্তু চাকার মত পাতলা গোলাকার হলে সবদিক উঁচু সমান নয়। তারা শক্তি বিকিরণ করে গোলাকার প্রান্ত পথে। এর কারণ আলো পড়ার ফলে তাদের সেণ্টার চাকার আকারের মত চ্যাপ্টা। শরীরের হিসাবে তা চ্যাপ্টা হতে বাধ্য।

গ্রহের দুই মেরু চাপা বলে বিকর্ষণের চেয়ে আকর্ষণ হয় বেশি। বিকর্ষণ বেশি হলে উত্তাপ, আকর্ষণ বেশি হলে শীত। তাই বিষুব রেখায় গরম বেশি, দুই মেরুতে শীত বেশি। শীতকালে পৃথিবী সূর্যের কাছে থাকলেও আকর্ষণে শীত দেয় বেশি। গরম তখন পৃথিবীর মধ্যে চাপা থাকে সংকোচনের জন্য। কারণ বিকর্ষণের আর এক নাম উত্তাপ। পৃথিবী চাকার মত হলে শীত প্রকাশ করতে পারত না। শীতকালের ক্ষণিকের রৌদ্র তাকে উত্তপ্ত করে তুলত সেণ্টারে ধরে রাখার ক্ষমতা না থাকায়। কোন বস্তুর উঁচু স্থানে আলো পড়লে সংঘর্ষ হয় বেশি বলেই উজ্জল দেখায়। নিম্নস্থানে সংঘর্ষ তেমন হয় না। সেখানে অনুঘটক সংঘর্ষের সুযোগ পায় না বেশি।

যে কোন বস্তুতে অন্যান্য বস্তু থেকে আবহাওয়া এসে অনুঘটকরূপে প্রতিফলিত হয়। আবার তার প্রতিফলিত আবহাওয়া অন্যান্য বস্তুতে অন্যান্য আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে প্রতিফলিত হয়। আলোর চরিত্র এমনি সব শক্তির মধ্যেই বিরাজ করে।

বস্তুতে শক্তিশালী বল যা গ্রহণ করায়, দুর্বল বল তা সব বের করে দিতে পারে না বলেই বস্তু পুষ্ট হয়। এই টানা পোড়েনে বস্তু জরাজীর্ণ হলে সেই দুর্বল বল শক্তিশালী হয়ে বস্তুকে ক্ষয় করে। সবই কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণের কাজ। সেখানে যেই নাম সেই কৃষ্ণ। অর্থাৎ যে কোন নামই কৃষ্ণ। আলো বললেও কৃষ্ণ বোঝায় অন্য শক্তির নাম বললেও কৃষ্ণ বোঝায়। মূলে তিনি যে সেণ্টার।

সেণ্টারের ধর্মে মুখ দিয়ে সিগারেট টানলে শূন্যতার জন্য ধোঁয়া গালে আসে। আগুন জ্বাললে ধোঁয়া উপরে ক্রম শূন্যতায় ওঠে। জলে ফুটবল ডোবালে ক্রম শূন্যতায় উপরে ভেসে ওঠে। তলার জল ও উপরের জলের গুণ যদি সমান ধরে নেওয়া হয়, তবে নিশ্চয় নিচের থেকে ওঠা ধারা জলের ক্রমোর্দ্ধে শূন্যতা সৃষ্টি করে উঠেছে। ক্রম শূন্যতা যদি নিচের দিকে থাকত, তবে ফুটবল নিচের দিকে ডুবত। জলে ভারী বস্তু ডোবার কারণ জলের তলার ক্রম ভারিত্ব থেকে তা ভারী। তা হলেও সেখানকার উপর ঠেলা বস্তুটিকে কিছুটা হাল্কা করবে। যার জন্য বস্তু

ভেসে ওঠে, বহু গভীরে ছোট মাছটিও জলের ভারে মরে না। জলের স্তরে স্তরে বিভিন্ন শূন্যতা আছে বলেই নানা ওজনের বস্তু জলে ফেললে নানা স্তরে স্তরে ডোবে অথবা ভাসে।

পৃথিবীর ভেতরের স্তরে স্তরে, আকাশের স্তরে স্তরে এমনি কাজ চলছে। স্তরে স্তরে নানা ধরণের আকর্ষণ বিকর্ষণে নানা বস্তু ক্ষয় ও পূর্ণ হয়ে নানা স্তরের নানা বস্তু হয়ে ওঠে। এমনি স্তর পরমাণুর মধ্যেও আছে বলে কণারা ঠিক পথে চলে। সেণ্টারকে কেন্দ্র করে সব কিছু হয়। জগতের সবকিছু তাই সেণ্টারের পরিচালনায় গোলাকার ভাব ধারণ করে।

সেণ্টারে সবকিছু সৃষ্টি হলেও শূন্য ও বস্তু রাখার স্থান নাই। সেখানে অঙ্কেরও স্থান নাই। সেখান থেকে বেরিয়ে এলেও হিসাব চলবে তাকেই ভিত্তি করে। সেখানে বস্তু ও শূন্যতা থাকতে পারে না বলেই অঙ্ক থাকতে পারে না। তাই আইনস্টাইনের অঙ্কও তার গভীরতা মাপতে পারে না। জল শুষ্ক বস্তু আকর্ষণ করতে পারে তাঃ সেণ্টারের ক্রম শূন্যতায় আকর্ষিত হচ্ছে বলে। জলের পূর্ণতা ও শুষ্ক বস্তুর শূন্যতা পরস্পরের নিবিড়তার কারণ। এই ভাবেই সূর্য ও গ্রহদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কোথাও স্বাভাবিক ভাবে কোথাও শক্তির চাপে। সমগ্রে সবই ঘটছে সেখানে প্রাকৃতিক হিসাবের সেণ্টারের জন্য।

সেণ্টারের হিসাব কঠিন। সেণ্টার থেকে এক চুল সরে এলেই হিসাব আরম্ভ হয়ে যায়। বস্তু ও শূন্যতা আরম্ভ হয়ে যায়। সেণ্টার থেকে এক চুল সরলে সেণ্টার এক চুল দূরে চলে যায়। হাজার হাত সরে এলে হাজার হাত দূরে সরে যায়। এই হাজার হাত থেকে বাইরের হিসাব পূর্বোক্ত স্তরগুলোর সঙ্গে চলে। একটা চাকার সেণ্টারকে কেন্দ্র করে নানা স্তরের বেড় লাগালে তেমনি হিসাবের সুবিধা হয়। চাকাটি পূর্ণ একবার ঘোরালে সমস্ত বেড়সহ প্রান্ত একবার ঘোরে। এখানে প্রান্তকে বেশ বেগে ঘুরতে হয়, সেণ্টারের দিকে ক্রম বেড়দের ক্রমান্বয়ে কম গতিকে ঘুরতে হয়। প্রান্তদেশের তুলনায় অন্যান্য বেড়দের গতি দূরত্ব অনুযায়ী ভগ্নাংশে আসে। আবার কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্তের গতি পূর্ণতার দিকে যেতে থাকে। কেন্দ্রের গতি চরম শূন্য, প্রান্তের গতি চরম পূর্ণ।

চরম শূন্যতায় এবং চরম পূর্ণতায় সেণ্টার থাকতে পারে না। যে হেতু সমস্ত কাজের জন্য সেণ্টার দায়ী, সেই হেতু চরম শূন্যতা ও চরম পূর্ণতা ভাবা যায় না। যদি ভাবা যায়, তাদের সেণ্টার করে আবহাওয়া খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শূন্যতা ঢুকিয়ে দেবে। শূন্যতায় পূর্ণতা ঢুকিয়ে দেবে। একটা প্লেনের শক্তিতে চলার অর্থ, শক্তির

তুলনায় পথ শূন্য হয়ে যাওয়ার ফলে চলা। প্লেন চলতে থাকলে পাশের চাপের তুলনায় শূন্যতা সৃষ্টি হয় বেশি বলেই, হাওয়া তার গায়ে আছড়ে পড়ে। আর পেছনের হাওয়া তাকে তাড়া করে চলে। প্লেন যত জোরে ছুটতে থাকবে, তত প্লেনের জালানী শক্তি কম পুড়বে। কারণ শক্তি গতি যোগালেও গতির একটা নিজস্ব গতি আছে। তাই গতি অনুযায়ী লঘুত্বের জন্য জালানী কম পুড়বে। অল্প গতি হলে গতির তুলনায় জালানী বেশি পোড়ে। তাই প্লেনে স্টার্ট দেওয়ার সময় আরও বেশি জালানী পোড়ে।

যত গতি বাড়তে থাকবে তত হাওয়া চাপ সৃষ্টি করতে থাকবে এবং পেছনে তত জোর ঠেলা সৃষ্টি করতে থাকবে। গতি চরমে উঠলে তেল আর পুড়বে না, গ্রহের গতি পেয়ে প্লেন চলতেই থাকবে। সেখানে তখন জালানী হচ্ছে, পৃথিবীর সেণ্টার কেন্দ্রিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তি। সে গতি প্লেনকে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ মানুষের দেওয়া তেলের শক্তি সে গতি অতিক্রম করতে পারে না। আইনস্টাইনের মতে গতিকে চরমে তুললে মোগল যুগে ফিরে আসা যায়। সেণ্টার তা হতে দেবে না।

প্লেন চলার সময় দেখা গেল আবহাওয়ার চাপ কাটিয়ে উঠতে পারল না। গতিপ্রাপ্ত বস্তুও সেণ্টার রূপ ধারণ করে আবহাওয়ার আকর্ষণ-বিকর্ষণে। প্লেন চললে যে বিরোধী ও অনুগামী শক্তি কাজ করে তার চরম পরিণতি স্থিরতার স্থির কেন্দ্র, যদিও তাকে ভিত্তি করে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলছে।

আলোর উৎস যে একটা সেণ্টার তা প্রমাণ করে ক্রম প্রসারিত ফোকাস। উৎস থেকে সে ক্রমপ্রসারিত হয়ে এগুতে থাকে। কোন বস্তুর শরীর তার সেণ্টার থেকে ক্রমপ্রসারিত হয়। সূর্যের এমনি প্রসারিত শক্তি চার দিক থেকে সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই সব দিকে আঘাত করে সব দিকের নিজের নিজের প্রয়োজনীয় কণা ছিনিয়ে আনছে। তারাও আবার সব দিকে তেজ ছাড়ছে, কিছু বিনিময়ে ছিনিয়ে আনার জন্য।

পৃথিবীর বিপরীতে সূর্যের আলোর ঠেলা না বাড়লেও সৌরজগতে ঢুকে পড়া বাইরের ধারা সেখানে ঠেলা সৃষ্টি করে আছে। গ্রহ তাদের শক্তি অনুযায়ী স্থানে আছে, সেখানে চারদিকে প্রসারিত ধারার সীমায় সীমায় ফোর্স তীব্র হয়। সূর্যের ক্ষেত্রে তা আরও তীব্র হওয়ায় গ্রহ ঘুরতে থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের সব শক্তি একটু তেরছা ভাবে আসায় ঘুরতে সাহায্য করে। এই তেরছা হওয়ার কারণ, সব বস্তু নানা ভাবে শক্তি প্রকাশ করাচ্ছে প্রধান শক্তির আধিপত্যে।

সব বস্তুর কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ আছে। আকর্ষণের চরম রূপ অন্ধকার এবং বিকর্ষণের চরম রূপ আলো! চরম অন্ধকারে বস্তু দেখা যায় না। কারণ বস্তুতে তখন দেখার উপযোগী বিকর্ষণের চেয়ে আকর্ষণের প্রভাব বেশী থাকায় চোখের জ্যোতির সংঘর্ষ হয় না। চরম আলোতেও বস্তু দেখা যায় না। কারণ বস্তুতে তখন দেখার উপযোগী আকর্ষণের চেয়ে বিকর্ষণের প্রভাব বেশি থাকায় চোখের জ্যোতির সঙ্গে সংঘর্ষে জ্যোতি গতি হারায়। এই বিকর্ষিত আলোর গতির দিকে যদি চোখের জ্যোতি চালনা করা যায়, তাহলে কিন্তু সেই আলো আর চোখের বাধা হয় না। বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে যায়।

চোখের জ্যোতি বলতে চোখের নিজস্ব জ্যোতির কথা বলছি না। জ্যোতি সৃষ্টি হয় আলোর সংস্পর্শে। যেমন মসৃণ বস্তু চকচক করে আলোর সংস্পর্শে। ঘোলা জলে ছায়া পড়লে জলটাকে ঘোলাই দেখি। অর্থাৎ জলটাকে সেখানে দেখা যায়। সেখানে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হলে ঘোলা জল আর দেখা যাবে না। কারণ প্রতিফলিত আলো দৃষ্টিকে বাধা দিয়ে রাখে। সেই প্রতিফলিত আলোযুক্ত জলে কোন কিছুর ছায়া পড়লে দেখা যাবে ছায়াটা উল্টো দিকে মুখ করে ঘুরে গিয়েছে। যমুনায় তাজমহলের ছায়া যেমন দেখি। আসলে এসব ছায়া জলে পড়ে না, পড়ে আলোর প্রতিফলনে। প্রতিফলনে আমরা আয়নার কাঁচকে দেখতে পাই না বলে আয়নায় মুখ দেখতে পাই। এই প্রতিফলন হাওয়া ভরা বেলুনের মত ফাঁপা। আসলে কিন্তু তা ফাঁপা নয়। তার মধ্যে বিকর্ষণ ঠেলার কাজ চলছে হাওয়া ভরা বেলুনের মত, যাতে বাইরের চাপকে ঠেলে রাখতে পারে। সেই বেলুনের আবরণে আর শক্তির কণা থাকে না। আলাদা আলাদা কণারা একত্রে পরিমাণ হয়ে নিশ্ছিদ্র আবরণ সৃষ্টি করে। আমরা যে বলি সূর্যের নিজস্ব আলো আছে, তাও এইভাবে সংঘর্ষে সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিফলন বস্তুটাকে যে ঢেকে রাখে তার আরও একটা প্রমাণ আছে। মসৃণ বস্তুর যে রঙ থাকে, তাতে আলো প্রতিফলিত হলে সেই রঙ আর দেখা যায় না। প্রতিফলনের ঠেলার সঙ্গে চোখের মসৃণতার সংঘর্ষে যে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি হয় তার তুলনায় বস্তুটির রঙ নিষ্প্রভ। তাই রঙটি অন্ধকার। এই প্রতিফলিত আলো না থাকলে ঐ রঙটি আলো হয়ে ওঠে। তখন সেই রঙের আলো বস্তুটির রঙকে চেনায়। এই রঙের আলোয় আবার বস্তুটিকে

চেনা যায় না। এই রঙ সরে গেলে বস্তুট কি তা বোঝা যায়। এইভাবে বিচার করলে দেখা যায় প্রতিটি বস্তু আকর্ষণের অন্ধকার দ্বারা সৃষ্টি। বিকর্ষণের আলো দ্বারা তাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। দেহসহ একটা জীবও তাই নিশ্বাস প্রশ্বাসে বেঁচে থাকে। কেন্দ্রের বিচারে সবই এক। কালো বস্তুকে আমরা আলোর প্রতিফলন দেখতে পাই, আবার আলোকে আমরা কালো অন্ধকারের গভীরতা দিয়ে দেখতে পাই। আমাদের চোখের উজ্জ্বলতার প্রতিফলন ও গভীরতা দেখার কাজ চালায়।

যতই আমরা আলো দিয়ে বস্তু দেখিনা কেন, আলোকে ভেদ করে দেখতে হয়। বস্তু যত গভীর অন্ধকারে থাকবে, সেখানে দৃষ্টি আত্মস্থ থাকায় প্রসারিত হয় না। বস্তুও আত্মস্থ থাকায় আলো প্রসারিত হয় না। দুই আত্মকেন্দ্রিকতায় দেখার কাজ চালাতে পারে না। দেখতে হলে দুয়ের দূরত্ব রাখতে হবে, যাতে দুয়ের সংঘর্ষ হতে পারে। অল্প আঁধারে দেখা যায় কিছুটা আলোর দূরত্ব আছে বলে। আলো থাকলেই দূরত্ব মানতে হবে। অন্ধকার থাকলেই নিকটত্ব মানতে হবে। দূরত্ব না থাকলে আলোর আবরণ সৃষ্টির স্থান থাকে না, যেখানে শক্তির চলাফেরা চলে। ঝড়ের আগেও তেমনি গুমোটের আবরণ সৃষ্টি হয়। হাওয়া গরম হয়ে উর্ধ্বমুখী হতে থাকে। ফলে তার আপেক্ষিক শূন্যতা সমুদ্রের জলকে শুষে নিয়ে বৃষ্টি নামায়। জল একেবারে মহাকাশে উঠে যেতে পারে না আবরণ সৃষ্টি হওয়ার জন্য।

আমরা ছবিতে গভীরতা বুঝতে কালো রঙ দেখি, প্রকাশ বলতে আলো দেখি, তা আমাদের অলক্ষ্যে সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতির দেখা না দেখার কারণে। আলো সব সময় প্রসারশীল, অন্ধকার সব সময় স্থিতিশীল। শক্তির সংঘর্ষে আলো হয়। বৈদ্যুতিক শক্তিও তাই সম্প্রসারণশীল বলে তামার তারে সম্প্রসারিত হয়। আমাদের শরীরের আবরণের মধ্যেও যে শক্তি চালিত হচ্ছে তাদের পদচিহ্ন আমাদের হস্তরেখায়, লোমকূপে, নাশারন্ধ্র ইত্যাদিতে প্রকাশ পায়। তা বুঝতে পারলে জাতক ভবিষ্যতে কেমন হবে, সুস্থ হবে কি অসুস্থ হবে জানতে পারা যাবে। ভবিষ্যতে মানুষের এগিয়ে চলা ও জীবনে শক্তির প্রকাশ।

এক খণ্ড কয়লা। সে বস্তু। তার চলার ক্ষমতা নাই। কিন্তু তার ভেতরের অণু পরমাণুদের চলার ক্ষমতা আছে। তাতে আগুন দিলে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। শক্তি বা অ্যানার্জি তাররূপী বস্তুকে

আশ্রয় করে চলে। এই অ্যানার্জি বস্তুতে ঘা খেতে খেতে চলতে চলতে আলো প্রকাশ করে। এই আলো আবার বস্তুকে আশ্রয় করে চলতে পারে না। সে ভাবরূপ আকাশকে আশ্রয় করে। পূর্বের শক্তিকে বলা হল বস্তুর শক্তি, এই শক্তি ভাবের শক্তি শক্তি এখানে দুই ভাগে বিভক্ত হল। সূর্যের তাপ আকাশের ভাবের সঙ্গে সংঘর্ষে সৃষ্ট বলে তাকে ভাবশক্তি বলব। সূর্যের শক্তি সূর্য থেকে পৃথিবীর আবহাওয়া পর্যন্ত আসতে তেমন সংঘর্ষের অভাবে আলো দিতে পারে না। সেটা সূর্যের বস্তুশক্তি। পৃথিবীর আবহাওয়ার সংঘর্ষে যখন রৌদ্র দেখা যায়, তখন সেটা ভাবশক্তি। এই ভাবের উদ্ভূত শক্তি থেকে গাছের পাতা আলোক-সংশ্লেষণে খাদ্য তৈরি করে। শরীর পুষ্ট করে কাঠ রূপ বস্তু সৃষ্টি করে। এখানে ভাব বস্তুতে রূপান্তরিত হচ্ছে। জগতে সত্য ও মিথ্যা দুই আছে। বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, এই কথা সত্য, না শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হয় এই কথা সত্য? দুটোকেই যদি সত্য বলতে হয়, তবে তাদের একটা সত্য কেন্দ্র আছে মেনে নিতে হবে। সবকিছুর কেন্দ্রের চরিত্র এক। সে সূর্যের হোক আর একটা পরমাণুর হোক। সেই এক সত্যের জন্য দুই সত্য সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষ যদি মোগল যুগে ফিরে যায়, সেই মোগল যুগ বর্তমান হবে। তার নিজস্ব অতীত ও ভবিষ্যৎ থাকবে। তা মানতে হলে সেণ্টারিজমের ভাববাদ এবং বস্তুবাদকে মানতে হবে। ভাবের সম্প্রসারণ সংকোচিত হতে থাকলে অতীতের মোগল যুগে ফিরে যাওয়া যায়। যেমন বস্তু শক্তির পথ ধরে ভাবে পৌঁছে আবার বস্তু সৃষ্টি করতে পারল গাছের ক্ষেত্রে। সেই গাছের কাঠ পোড়ালে আবার সেই বস্তু রূপী কয়লা হল। সেণ্টার আছে বলে তা সম্ভব হল।

শক্তি বা অ্যানার্জি বলে এত সব ঘটনাকে এক ছাঁচে ফেললে চলবে না। শক্তি চলার রকমারিত্বে নানা রূপ পাল্টায়। আলো আবহাওয়ায় এক রকম, জলের মধ্যে আর এক রকম চলে। পূর্বে জলের উপর আলোর প্রতিফলনের কথা হয়েছে। জলের মধ্যেও আলো নিজের শক্তিতে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে চলে বলেই সেখানে আলো পৌঁছায়। আলো তৈরি হওয়া শক্তি নয়, প্রতি মুহূর্তে সংঘর্ষে তৈরি হতে হয়। জলে আলো প্রতিফলিত হয়। তা আমরা প্রতিফলনের মুখোমুখি হলে দেখতে পাই] সেখান থেকে সরে দাঁড়িয়ে জলের উপরে পড়া রৌদ্রের আলো দেখলে তেমন চড়া মনে হবে না, যতটা অন্য বস্তুতে মনে হয়। জলের স্বচ্ছতা রৌদ্রকে গিলে ফেলে। এই আলোকে জলের গভীরে ঢুকতে হয় প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম করতে করতে। সেখানে যদি একটা মাছ এসে দাঁড়ায় জলের চেয়ে

তাকেই বেশি উজ্জল মনে হবে। তার কারণ, জলের গভীরে যাওয়ার শক্তি অগভীরের মাছে আলোক সম্পূর্ণ ক্ষয় করল। সেই সংঘর্ষের প্রতিফলন জলের মধ্য দিয়ে চোখে বেশি মাত্রায় আসতে পারল।

আকাশে আলোর প্রতিফলন কম, কিন্তু আলোর গতি বেশি। জলে তার উল্টো। সেখানে আলোর প্রতিফলন বেশি কিন্তু তার গতি কম। তাই জল ভরা কাঁচের গ্লাসে একটা পয়সা ফেললে প্রতিফলনের দরুণ কিছুটা উঁচুতে মনে হবে। একটা লাঠির অর্ধেকটা জলে ডোবালে বাঁকা বলে মনে হবে। তার কারণ, আলোককে যথেষ্ট সংগ্রাম করে এগোতে হচ্ছে, তার সংঘর্ষের আলো তার চেয়ে বেশি প্রতিফলিত হচ্ছে। দৃষ্টি তখন পয়সা পর্যন্ত না গিয়ে পয়সায় প্রতিফলনে আবদ্ধ হচ্ছে। সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু তেমনি আলোর মত ধারা যাচ্ছে এবং প্রতিফলনের মত কেন্দ্রভিত্তিক বিকর্ষণ হচ্ছে।

ছয়

একটা শিশু, সে থাকে পিতা মাতার স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ। শিশুরও তা প্রয়োজন আছে, কারণ সে জ্ঞানের স্বাধীনতায় পৌছাতে পারেনি, শক্তির স্বাধীনতায় পৌছাতে পারেনি। সে কর্ম করতে জানে না, আবার ভক্তি করতেও জানে না। তবে সে ভালবাসা বোঝে। তাই কল্পনার জগতে রূপকথার রাজত্বে পৌছালেও সে আবার পিতা মাতার স্নেহের বন্ধনে বন্দী হতে চায়। সেখানে সে সব কিছু জানতে চায়। পিতামাতা যেন তার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, অভাব অভিযোগ নিবারক।

একটা মূর্খের জ্ঞানের জগৎ যতটুকু, ঈশ্বর ততটুকুর স্রষ্টা। তার বিপদ যতটুকু ততটুকুর বিপদ নিবারক। জ্ঞানীর জ্ঞানের জগৎ আরও বিরাট হলেও সেই বিরাটের মধ্যে জ্ঞানী ততটুকুই পায়। প্রত্যেকে নিজের দিক থেকে একই জিনিস ঈশ্বরের কাছে আশা করে। সে জিনিস আরও চাই আরও চাই। এই আরও চাই, আরও চাই করতে করতে অপারগ হয়ে আমরা আত্মসমর্পণ করি। যার কাছে আত্মসমর্পণ করি, তিনি হলেন ঈশ্বর। এই চাই চাই করতে করতে জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বরকে ভুলে নিজের স্বার্থের ঈশ্বরকে চাই।

ঈশ্বর তাই দুই রকম হয়ে গিয়েছেন, এক জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বর, দুই স্বার্থের ঈশ্বর।

জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বর পরমাত্মা, স্বার্থের ঈশ্বর জীবাত্মা। একটা সংসারী মানুষ যেমন সংসারের জীবাত্মার কল্যাণের চিন্তা করে, তেমনি সে সমাজের বা জগতের স্রষ্টা পরমাত্মার চিন্তা করে। সংসারকে বাঁচাতে তার সমাজের কাছে হাত পাততেই হবে। সমস্ত সংসার নিয়েই তো সমাজ—জগৎ।

পরমাণুর কেন্দ্র বা আত্মা আছে। পৃথিবীর মূলেও কেন্দ্র বা আত্মা আছে। সূর্যের মূলেও কেন্দ্র বা পরমাত্মা আছে। পরমাণু না হলে যেমন বিশ্ব জগৎ হয় না, বিশ্ব জগৎ না হলে তেমনি পরমাণু হয় না, আকাশ হয় না, আরও সূক্ষ্ম ভাব জগৎও হয় না। পৃথিবী না থাকলে তার আকাশ হয় না, আকাশ না থাকলে তার পৃথিবী হয় না।

একটা সাধারণ সংসারী মানুষের কাছে একজন মহাপুরুষ ভগবান হতে পারেন। বিশ্বস্রষ্টা না হয়েও অথবা ভগবান বিশ্বাস না করেও বুদ্ধদেব গৌরবার্থে ভগবান বুদ্ধ হয়েছিলেন। পরলোকগত মানুষের নামের আগে আমরা ঈশ্বর নাম প্রয়োগ করি। অথচ আমরা কিন্তু জানি তিনি জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বর নন। এসব নিয়ে আমাদের ঝগড়া করবার কিছু নাই। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন যে মানুষ ভগবানকে মানতেন না, তা নিয়েও ঝগড়া করার কিছু নাই। মানুষ ভগবান বিশ্ব সৃষ্টি না করলেও যে ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষ না হলেও তাঁর কেন্দ্রের আকর্ষণ বিকর্ষণ দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় চালিয়ে যাচ্ছেন। একটা মানুষের জীবাত্মায় বা একটা পরমাণুর কেন্দ্রে সেই আকর্ষণ বিকর্ষণ চলছে। তার ফলে সাধ্যমত সৃষ্টিও চলছে। সূর্য, পৃথিবী, জীবজন্তু, গাছপালা, পাথর মাটি, পরমাণু কেউই বাঁচত না নিজের নিজের কেন্দ্রের আকর্ষণ বিকর্ষণ ছাড়া। যার যতটুকু জ্ঞান তার ততটুকু ঈশ্বর। তা নিয়ে জ্ঞানীর বড়াই করা সাজে না। তিনি তাঁর জ্ঞানের অধিক ঈশ্বরকে চিন্তা করতে পারেন না। আইনস্টাইন জ্ঞানে অগ্রসর ছিলেন বলে তিনি মানুষকে ঈশ্বর মানেন নি। তিনি বলতেন, স্পিনোজার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর।

স্পিনোজার ঈশ্বর হলেন, যে সত্তা (Being) আদি অন্তহীন এবং অনন্ত। কারো উপর নির্ভরশীল নয়। অনন্তকাল ধরে পরম রূপে (absolute) বিরাজিত। যার শাশ্বত অসীম অস্তিত্ব প্রকাশিত হচ্ছে অসংখ্য শরীর, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদির মধ্যে। সেখানে বাইরে থেকে কোন ক্রিয়া ঘটানো যায় না, কারণ তার বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। যা নিজের নিয়মে নিজেই চলে, সৃষ্টির সমস্ত কারণ অন্তর উপলব্ধিতে ঘটে যাওয়া। যার সত্য হল সবকিছুর সত্য।

আইনস্টাইন এই ঈশ্বর বা প্রকৃতিকেই মানতেন। তিনি প্রকৃতি বলতে বুঝতেন এমন গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য যা বস্তু ও তার গুণ পরিবর্তনকারী শুধু নয়, অপর কিছুর গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির এই গুণের সঙ্গে ঈশ্বরের গুণের কোন পার্থক্য নাই। তাই মানুষ এই অসীম প্রকৃতিকে যত জানতে পারবে তত সে ঈশ্বর সম্বন্ধে জানতে পারবে।

প্রায় সব ধর্মে ঈশ্বরকে মানুষের আকার ধারী বা Personal God ভাবা হয়েছে। এই মতবাদকে বলা হয় নরত্বারোপ বা anthropomorphism। এই ঈশ্বরকে জগৎ থেকে আলাদা করে ভাবা হয়েছে বলে তিনি জগৎ যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি ভাঙতেও পারেন। এই ঈশ্বরকে আবার যারা মানুষরূপে চিন্তা করেছে, তাদের ইচ্ছায় আবার ঈশ্বর পৃথিবীর মানুষের মধ্যে থেকে কাজ করে চলেছেন। তখনও বলা হচ্ছে, ঈশ্বর ও জগৎ সংসার আলাদা। এইসব টানা পোড়েনে বিজ্ঞানের সঙ্গে অধ্যাত্মের ঝগড়া চলেছে। বিশৃঙ্খলা চলেছে।

আইনস্টাইন দেখেছেন পরমাণু জগতেও বিশৃঙ্খলা চলেছে। কিসের অভাব হেতু এই বিশৃঙ্খলা? আবার বাইরের প্রকৃতিতে দেখা যায় সব বেশ শৃঙ্খলায় চলছে। ধার্মিক যেমন সংসারের বিশৃংখলা খুঁজতে এক ঈশ্বরের দিকে যেতে চান, তিনিও তাই চেয়েছেন। বিজ্ঞানী হিসাবেও তিনি বিজ্ঞানের বিশৃংখলা বুঝতে একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের কথা বলেছেন। এই চিন্তার মূলে ধর্ম কাজ করেছে। বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কারের জন্য গ্যালিলিও ও কেপলার সৃষ্টির কার্য-কারণ ছকে বাঁধতে প্রাচীন চিন্তা ধারার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। এই ছক বাঁধতে গিয়ে তাঁরা গণিতকে অস্বীকার করতে পারলেন না। পরে আইনস্টাইনও স্বীকার করলেন প্রকৃতির রহস্য জানতে হলে গণিত রূপী চাবি কাঠির প্রয়োজন।

আইনস্টাইন বলেছেন, প্রকৃতিতে যদি বস্তু না থাকে, ঘটনা না ঘটে সময় বলে কিছু থাকে না। এই সময় ও মহাকাশ অবিচ্ছিন্ন।

স্পিনোজাও বস্তুর ভেতরের প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছেন। তিনি ঐ প্রতিক্রিয়াগুলোকে খাপ খাওয়ানো যায় না বলে বাদ দিতে বলেছেন। আইনস্টাইন তাই সেই প্রতিক্রিয়ার শৃংখলার কথায় না গিয়ে ফল স্বরূপ সময়ের কথা বলেছেন। বস্তুর প্রতিক্রিয়ার মত এই সময়কেও খাপ খাওয়াতে পারেন নি। আসলে স্পিনোজা ছিলেন ইহুদী পুরাণবিদ। সেই মতই তিনি তাঁর দর্শনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইহুদী আইনস্টাইন অনন্ত সংস্কারের স্বার্থে তাঁকে আদর্শ হিসাবে নিয়েছিলেন।

ইহুদী ধর্ম অনুযায়ী ঈশ্বর ও প্রকৃতি অভিন্ন। স্পিনোজা Ethics পুস্তকে বলেছেন, True ideas always agree with those things of which they are ideas.

এই নিয়ম মেনে আইনস্টাইন ঠিকমত কল্পনার দ্বারা কোন বিষয়ের মীমাংসায় আসতেন। তাঁর আপেক্ষিকতাবাদে স্পিনোজার অনেক মত কার্যকরী হয়েছে। সেই সব মতে বলা হয়েছে, কোন বস্তুকে সীমিত (Limited) বলতে হলে অনুরূপ ধরণের অপর একটি বস্তুর সঙ্গে তুলনা করতে হবে। একটার সঙ্গে অন্যটার তুলনা না করলে ছোট কি বড় বলতে পারি না। এমনি ভাবে একটা চিন্তার সঙ্গে অন্য একটা চিন্তার আপেক্ষিকতা ধরা যায়। তাই বলে বস্তুর সঙ্গে চিন্তার আপেক্ষিকতা ধরা যায় না।

স্পিনোজা আরও বলেছেন, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দিয়ে কোন একটা বস্তুর ধারণা করতে হয়। তার জন্য অন্য বস্তুর ধারণার প্রয়োজন হয় না। একটা নির্ধারিত কারণ থেকে অপরিহার্য ভাবে একটা কাজের ফল পাওয়া যায়। কোন নির্ধারিত কারণ ছাড়া কোন ফল লাভ করা যায় না। প্রাকৃতিক জগতে সম্ভাব্যতা বলে কিছু নাই, স্পিনোজার এই মতকে আইনস্টাইন মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বাস করে গেছেন।

বস্তু থেকে যেমন গুণকে আলাদা করা যায় না, ঈশ্বর থেকেও তেমনি প্রকৃতিকে আলাদা করা যায় না। একটা মানুষ শক্তির দ্বারা বাঘ মারল। তার মানে এই নয় যে মানুষটা অন্য কারো কাছ থেকে শক্তি ধার করে নিয়ে বাঘ মারল। আবার শক্তি তার নিজের হলেও রোগগ্রস্ত হলে সেই নিজের শক্তি ধরে রাখারও ক্ষমতা নাই। একের মধ্যে পুরুষ প্রকৃতি এক হয়ে থাকে। উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। প্রকৃতি না থাকলে ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর না থাকলেও প্রকৃতি নাই। তাই আইনস্টাইনও জানতেন, প্রকৃতিকে জানলে ঈশ্বরকে জানা হয়ে যায়।

সৌরজগৎ সৃষ্টির প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন গণিতজ্ঞ ল্যাপলাস। তখন ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, বিশ্বের জন্ম যদি ধূলিকণা ও গ্যাসের পরমাণু থেকে নৈসর্গিক উপায়ে হয়ে থাকে তবে সেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ কোথায় ?

তার উত্তরে ল্যাপলাস বলেন, সম্রাট, তবে আমার ঐরূপ ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। চারশত খ্রীষ্টপূর্বাব্দেও প্লেটো বলেছিলেন, আগুন, জল, মাটি এবং

বাতাস এই সমস্তই প্রকৃতিতে কারো কোন কৌশল বা দক্ষতা ছাড়াই বিরাজ করছে।

প্লাঙ্ক সনাতন পদার্থবিদ্যার নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে একটা কল্পনা দাঁড় করান। তাতে বলা হয়, কোন উৎস থেকে শক্তি নির্গত (Emitted) কিংবা কোন বস্তুর দ্বারা শোষিত হওয়ার সময় অবিশ্রাম ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে না হয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে ঝাঁক ঝাঁক ক্ষুদ্রতম শক্তির মোড়কে বা কণার আকারে হয়। এই শক্তিকণা হল ঐ বিচ্ছিন্ন শক্তির ক্ষুদ্রতম অংশ, যেমন ইলেকট্রন বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ। এইসব কণার যার যত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হবে তার তত শক্তি কম। যার যত তরঙ্গ দৈর্ঘ কম হবে তার ততশক্তি বেশি। দৃশ্যমান তরঙ্গগুলোর মধ্যে বেগুনী রঙের আলোক কণার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় লাল রঙের আলোক কণিকার চেয়ে শক্তি বেশি। কারণ লাল রঙের আলোক কণিকার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনও তাঁর আলোক-বিদ্যুৎ সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় প্লাঙ্কের ঐ মতটিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি বললেন, আলোর মত বিকীর্ণ শক্তি উৎস থেকে নির্গমণের সময়ও কোন কিছুতে শোষিত হওয়ার সময় বিচ্ছিন্নভাবে বা কণারূপে হয় না। চলার পথে মহাকাশে কণারূপে প্রবাহিত হয়। আগে ধারণা ছিল, ধূলাবালির দ্বারা এই বিশ্ব গঠিত। এখন সেই ধূলাবালির কণা পরীক্ষা করে বিজ্ঞান তাদের চলা ফেরা লক্ষ্য করে কত অজানাকে জানতে পারছে।

এইসব ধূলিকণারা সত্যকে প্রকাশ করতে চাইছে। এই ধূলিকণার রাজ্যে এসেও আইনস্টাইন ভগবানকে ভোলেন নি। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা ভুলতে চাইছেন। যতসময় একীভূত ক্ষেত্র তত্বে না যাওয়া যাচ্ছে, তত সময় মানুষকে সাধনা করতে হবে। সেই সাধনাকে ঈশ্বরের সাধনা বললে দোষ কি? বিজ্ঞানী, অধ্যাত্মবাদী সবাই তো অসম্পূর্ণ। আইনস্টাইনও বলেছেন, জগতে পরম (absolute) বলে কিছু নাই। তাই বিজ্ঞানও পরমে পৌঁছাতে পারছে না, অধ্যাত্মও পরমে পৌঁছাতে পারছে না। একই ব্যাপার বিভিন্ন মাধ্যমের দর্শকদের কাছে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ তিনি বিভিন্ন জীবাত্মাদের নানা দেখাকে সত্য ভাবতেন, পরমাত্মাকে নয়। অবশ্য স্পিনোজার ঈশ্বরকে তিনি ধর্মের খাতিরে হয়তো মানতেন। সেই মানা প্রকৃতির মধ্য দিয়ে সম্ভব। সেখানে আবার নিশ্চয় আলাদা ভূমিকা আছে।

জগতে পরম বলে কিছু নাই। তা বোঝবার জন্য তিনি দর্শনপ্রার্থীদের

আনাতোল ফ্রাঁসের একটা গল্প শোনাতেন। তা সংক্ষেপে হল এই, একজন সৎ ব্যক্তি পৃথিবীর বহু দেশে ঘুরতে লাগলেন সত্যের অন্বেষণের জন্য। তিনি মনগড়া ভিত্তিহীন সত্যকে জানতে চান না, তিনি জানতে চান জীবন, মৃত্যু, ভাল, মন্দ এসবের মূল বাস্তব পরম সত্যকে। তাঁর এই সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে এক দেবদূত তাকে দেখা দিলেন। তিনি তাঁকে নিয়ে যান পৃথিবীর মাটির তলার এক গোপন স্থানে। সেখানে গিয়ে সাধু একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন। একটা অতি বিশালকায় চাকার প্রতিটি অরে (spoke of the Wheel) বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন বর্ণের নরনারী প্রত্যেকে দুহাতে ধরে ঝুলছেন। তাঁদের প্রত্যেকে দেবদূত ও তাঁর সঙ্গী সাধু ব্যক্তিটিকে দেখে বলতে আরম্ভ করলেন, আমি একমাত্র সত্য কথা বলছি, আর সবাই মিথ্যা কথা বলছে। পরম সত্য শুধু আমারই জানা আছে, আর অন্যরা যা জানে সব ভুল।

সাধু ব্যক্তিটি এসব দেখে ঘাবড়ে গেলেন। দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রত্যেকে বলছে, আমি সত্য কথা বলছি, অন্যান্যরা যা বলছে তা ভুল। তবে কে পরম সত্য কথা বলছে?

দেবদূত তখন বললেন, কেউই প্রকৃত সত্য জানে না।

তবে কি পরম সত্য বলে কিছু নেই?

দেবদূতও পাল্টা প্রশ্ন করলেন পরমসত্য কার জানা আছে? আচ্ছা তবে শোনো। এই বলে তিনি প্রাণপণ শক্তিতে চাকাটিকে ঘুরিয়ে যেতে লাগলেন। ঘূর্ণনের বেগ ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকল। প্রথম অবস্থায় তাদের সবার কথা আলাদা আলাদা শোনা যেতে লাগল। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে বলছে, আমি একমাত্র সত্য কথা বলছি, আর সবাই মিথ্যা কথা বলছে। পরম সত্য শুধু আমারই জানা আছে, আর অন্যরা যা জানে সব ভুল।

পরে ঘূর্ণনের বেগ এত বেড়ে গেল যে, প্রত্যেকের কথা আর আলাদা আলাদা শোনা গেল না। শুধু একটি শব্দ শোনা যেতে লাগল। এবং সেটি হল সত্য। এই শব্দ শুনে সাধু দেবদূতকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, পরম সত্য যে আছে, তা আমি জানতে পেরেছি।

দেবদূত মৃদু হাস্যে বললেন, তুমি যদি বিশ্বাস কর যে আছে, তাহলে আছে।

সাধু বললেন, আমি এখন যা দেখছি ও শুনছি, তা কি পরম সত্য নয়? পরম সত্যের জ্যোতির্ময় বলয় যে আমি দেখতে পাচ্ছি।

দেবদূত বললেন, হতে পারে। তবে আমরা পরম সত্যের যত নিকটে আসা যায়, এসেছি।

তবে আইনস্টাইনের একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব সফল হলে কি পরম সত্যকে পাওয়া যাবে না? তবে পরম সত্যকে শুধু মাত্র পদার্থ বিজ্ঞানে পাওয়া সম্ভব নয়, এক সঙ্গে সবকিছুর মূলকে জানতে হবে। বিজ্ঞানী মাখ আপেক্ষিকতাবাদকে কোন আমলই দেননি। রসায়ন ও পদার্থবিদ নের্নস্ট—(Nernst) বলেন, আইনস্টাইনের ব্রাউনীয় বিচলন তত্ত্ব আপেক্ষিকতাবাদের চেয়ে অনেক বেশি উঁচু দরের। তাঁর মতে আপেক্ষিকতাবাদ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হতে পারে না, তবে দার্শনিক মতবাদ হতে পারে। লেনার্ডও আইনস্টাইনীয় তত্ত্বের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

আইনস্টাইনের তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক কি দার্শনিক সেই বিচার না করলেও তাঁর তত্ত্বের বিচার ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানকে অনেক কাছাকাছি এনেছে। অর্থাৎ সত্যের কাছাকাছি এনেছে। কিন্তু সামাজিক অনেক সমস্যা তাঁকে ঠিক সত্যে পৌঁছাতে দেয় নি। তিনি যে দেবদূত ও সাধু ব্যক্তির গল্প বলতেন, তাও সত্যের কাছাকাছির গল্প। তিনি তা স্বীকারও করেছেন। বহু অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে না পেরে সত্যের দ্বার খুঁজে পান নি তিনি। অনেক সত্য কথা সামাজিক বন্ধনের ভয়ে বলতে না পারলে সত্যে ঢোকা যায় না। সত্য নিয়ে আলোচনা করা যায় না। কথায় কথা বাড়ে ঠিকই কিন্তু তাতে সেই সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়, যে সত্য দুই তার্কিক আধাআধি জানত। এমনি জার্মানির অনেক অন্যায় তাঁকে মুখ বুঁজে সহ্য করতে হয়েছে বলে ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকটা আসে নি। অন্যায়ের প্রতিবাদ ঠিক মত করতে না পারলে ব্যক্তির কি ক্ষতি হতে পারে তা প্লাঙ্কের জীবনে দেখা গিয়েছে। প্লাঙ্ক নিজে অস্ট্রিয়ান হয়েও শেষ জীবনে হিটলারের অত্যাচার ও বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা না থাকায় মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। এমন কি তার জন্য মানসিক হাসপাতালে লোকচক্ষুর অন্তরালে বহু বছর কাটিয়ে ১৯৪৯ সালে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হন।

চিন্তাশীল ব্যক্তি সঙ্কট মুহূর্তে যদি দেশকে রক্ষা করতে না পারেন, তার জন্য তাঁর মানসিক ব্যাধি হতে পারে। কারণ দেশের অধিকাংশ লোক সরল সাদাসিদা। তারাই অধিকাংশ সময়ে সংখ্যালঘু কয়েকজনের কাছে শোষিত হতে থাকে। অথচ তাদের জন্য পূর্বপুরুষরা কত চিন্তার ফসল রেখে গেছেন,

যাতে তারা মানুষের মত খেয়ে দেয়ে বাঁচতে পারে। আইনস্টাইনও তাঁর The World As I See It পুস্তকে লিখেছেন, "প্রতিদিন শতবার আমি চিন্তা করি, আমার অন্তর ও বাহির দুই জীবনই অপর জীবিত কি মৃত লোকদের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। এবং আমি চেষ্টা করি যতটা পেয়েছি ও এখনও পাচ্ছি সেই পরিমাণ দান করতে।"

দেশে বিশৃঙ্খলা এলে চিন্তাশীল ব্যক্তির মস্তিষ্কে আগে শৃঙ্খলার বিপ্লব দেখা দেয়। সেই বিপ্লব সাধারণ মানুষের শক্তির সঙ্গে যোগ হয়ে মহাবিপ্লব সৃষ্টি করে। অশুভ শক্তি যতই প্রবল হোক, শুভ শক্তির কাছে জনগণ এসে শুভ শক্তিকে আরও প্রবল করে তোলে। শুভ শক্তির কাছে তাদের আসতেই হবে। আইনস্টাইন বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের এক কল্পনাতে যেমন বলেছেন কতকটা তেমনি। তিনি বলেছেন, অতি ভারী বস্তুর একটা মহাকর্ষীয় বল থাকে। আলোর রশ্মি ঐ মহাকর্ষীয় বলের ক্ষেত্র ভেদ করে যাওয়ার সময় বস্তুটির দিকে বেঁকে যাবে। আলোক রশ্মির ভর এত কম যে পৃথিবীর দিকে বেঁকে যাওয়ার মাপ ধরা যায় না। পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের ভর বেশি বলে আলোক রশ্মি সূর্যের কাছ থেকে যাওয়ার সময় সূর্যের দিকে বেঁকে যাবে। ততখানি পৃথিবীর কাছে বেঁকে না। তবে সূর্যের পাশ দিয়ে পৃথিবীর দিকে আসা কোন নক্ষত্রের আলো পর্যবেক্ষণ করা পূর্ণ সূর্য গ্রহণের সময় সম্ভব—যেহেতু তখন সূর্যের উজ্জ্বলতা চাঁদের আড়ালে ঢাকা থাকে। তখন তারকা থেকে আসা ক্ষীণ আলোকরশ্মি ফটোগ্রাফী প্লেটে ধরা সহজ হবে। তার কয়েক মাস পরে সূর্য আগের জায়গা থেকে সরে যাওয়ার পর সেই তারকাটির আলো ফটোগ্রাফী প্লেটে ধরলে দেখা যাবে প্রথমবারের তারকাটির আলো সূর্যের দিকে বেঁকে গিয়েছিল।

বিশৃঙ্খলা এমনি ভাবে চিরদিন শৃঙ্খলহীন থাকে না। গভীরের শৃঙ্খলায় শৃঙ্খল পরে। সেই হিসাবে সব মানুষের দর্শন এক। পৃথিবীর মূল সভ্যতা একদিন এক ছিল বলে, আজও পৃথিবীর সকল মানুষের মূল দর্শন এক। দেশের সঙ্গে দেশের ব্যবধান বাড়াতে মূল এক দর্শনকে স্বার্থান্বেষীরা টুকরো টুকরো করেছে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ-প্রকাশিত দ্বিজেশচন্দ্র রায় রচিত 'অ্যালবার্ট আইনস্টাইন' পুস্তকে দেখানো হয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণার সঙ্গে আইনস্টাইনের ধারণার মিল ছিল। বিবেকানন্দ বলেছেন, "যিনি এই বহুত্বপূর্ণ জগতে সেই অখণ্ড স্বরূপকে দেখতে পান, যিনি এই মরজগতে এক অনন্ত

জীবন দেখতে পান, যিনি এই জড়তা ও অজ্ঞানতাপূর্ণ জগতে সেই এক স্বরূপকে দেখতে পান, তাঁরই শাশ্বত শান্তি, আর কারও নয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "সচ্চিদানন্দ হল সৎ বা সত্য, চিৎ বা চিৎশক্তি বা চেতনা ও আনন্দ। বাস্তব জগতে আছে নৈসর্গিক ঘটনাবলীর সত্যতা, যা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়। এই জগৎ জড়পিণ্ডের সমষ্টি, জাগতিক বস্তু নানাবিধ, ভিন্ন প্রকৃতি, বিবিধ গুণবিশিষ্ট। কিন্তু এত বিভিন্নতার ভিতরেও অর্থাৎ বিশৃঙ্খলার ভেতরে আছে শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলার অস্তিত্বের কারণ হল প্রকৃতিতে এক অনির্বচনীয় শক্তি, যাকে স্পেন্সর (Spencer) বলেছেন, Inscrutable power in Nature। এই শক্তি থেকেই সমস্ত কিছুই জন্মাচ্ছে, চলছে, নিয়ত উৎপন্ন হচ্ছে ও তাতেই সব বিলীন হচ্ছে। ঐ অনন্ত শক্তির প্রকাশ পায় নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে, আর এই সব ঘটনার প্রত্যেকটিতে আছে সুষ্ঠু কার্য-কারণ সম্বন্ধ। প্রতিটি মানুষ যেমন তার চৈতন্য অনুযায়ী কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে, তেমনি বিশ্বের সব লীলায় প্রকাশ পাচ্ছে যেন এক বিশ্বব্যাপী চৈতন্য, আর এই চৈতন্যরূপিনী যে শক্তি, তাকেই বলা হয়েছে চিৎশক্তি। এই চিৎশক্তির বা চিৎ-এর অবস্থানের জন্যেই জাগতিক শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলা আছে বলেই জীবনের উপযোগিতা বা জীবের সুখ, যাকে বলা হয়েছে আনন্দ। এই তিন মিলেই সচ্চিদানন্দ। এই সচ্চিদানন্দকে জানতে পারলেই জগৎকে জানা যায়। আইনস্টাইনের চিন্তাধারা থেকে বোঝা যায় যে এই সচ্চিদানন্দের জ্ঞান তাঁর পূর্ণ মাত্রায় ছিল।"

এই চিন্তাধারা ইউরোপে ও আমেরিকায় অস্পষ্টভাবে ছিল প্রাচ্য থেকে দূরত্বের জন্য। তাই সেখানে আইনস্টাইনের কৃতিত্ব বলে একীভূত ক্ষেত্র-তত্ত্বের চিন্তাধারা প্রসারলাভ করেছিল বেশি। এই চিন্তাধারার সমাধান না হলেও তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের চেয়েও বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই চিন্তাধারা দর্শনে সীমাবদ্ধ থাকায় ইউরোপ ও আমেরিকা তেমন গুরুত্ব দেয় নি। তার গায়ে বিজ্ঞানের লেবেল লাগানোতে বিজ্ঞান সাধক মহাদেশ দুটি লুফে নিয়েছিল। আইনস্টাইনের এইটাই সবচেয়ে বড় দান যে, প্রাচ্যের দর্শনকে তিনি পাশ্চাত্যে প্রচার করেছেন। প্রাচ্যবাদী স্পিনোজার চিন্তার মধ্যে যে আপেক্ষিকতাবাদ ছিল তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। বিজ্ঞানেও যদি ধর্ম ও দর্শনের ছাপ মারা যায় তবে প্রাচ্যের শিক্ষিত সমাজ তা লুফে নেবে। এই ভাবে দেওয়া নেওয়ায় নূতন জিনিসের উদ্ভব হয়ে থাকে।

কোন বস্তুতে অন্য বস্তু মেশালে একটা তৃতীয় বস্তু হয়। পরমাণুতেও ইলেকট্রন কম বেশি হলে রূপ পাল্টায়। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন থাকলেও ইলেকট্রনের পরমাণুর আচরণ নাই। অণুর মধ্যে পরমাণু থাকলেও পরমাণুতে অণুর আচরণ নাই। বস্তুর মধ্যে অণু থাকলেও অণুতে বস্তুর আচরণ নাই। তাদের আচরণ পাল্টে যায়। এই সব গুণের জন্য জল, বায়ু, মাটি, গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য নানা পরিমাণ মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে। এত বস্তু সৃষ্টি হলেও মূলে তাদের চরিত্র এক। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কেন্দ্র থাকলেও তাদের চরিত্র এক। তাদের সবার গুণ আকর্ষণ বিকর্ষণ। প্রতিটি বস্তু রূপান্তরিত হওয়ার জন্য আকর্ষণে অপর থেকে নিচ্ছে, বিকর্ষণে অপরকে দিচ্ছে। মূলত সবই এক বস্তুতে সৃষ্টি হলেও কেন্দ্রের গুণে নানা রকম হয়েছে। এক বস্তুর সৃষ্ট সব বস্তু এক হলে কেন্দ্রের আকর্ষণ বিকর্ষণ থাকত না। নদীর জল নিচের দিকে যায় বলেই সমুদ্রে যায়। তাই বলে জল জলকে আকর্ষণ করে না। চুম্বকের দক্ষিণ মেরু, অন্য একটা চুম্বকের দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করে না। কিন্তু দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুকে আকর্ষণ করে। দুই চুম্বক বস্তু হিসাবে এক হলেও মেরুর পার্থক্যে আকর্ষণ করে। এখানে শূন্যতায় আকর্ষণ, পূর্ণতায় বিকর্ষণ। তাই শূন্যতায় আকর্ষণ না হলে বস্তু হয় না, পূর্ণতায় বিকর্ষণ না হলে আকাশ হয় না।'

তাই আকাশ সৃষ্টি হতে বস্তুর পরমাণু, ইলেকট্রন ইত্যাদিকেও ভেঙে ভাবাকারে আসতে হয়েছে।' আবার বস্তু সৃষ্টি হতে আকাশকে গড়ে বস্তুর আকারে আসতে হয়েছে। বায়ুশূন্য কৌটা যেমন বাইরের চাপে ও ভেতরের শূন্যতার আকর্ষণে খোলা যায় না। তেমনি আকর্ষণও বস্তুর পরে আকাশ দিয়ে রেখেছে, তার বস্তু এনে অন্যদের পুষ্ট করার জন্য। আবার এই পুষ্ট বস্তুরা বিকর্ষণ শূন্যতায় দিয়ে রেখেছে নিজে কিছুটা শূন্য হওয়ার জন্য, যার ফলে সে অন্যধারা হজম করে পুষ্ট হতে পারে। সব বস্তু শূন্য হলে বিশ্বের স্থান হয় না, আবার সব শূন্য বস্তু হলে বিশ্বে শূন্যের অভাব ঘটে। অতএব তাদের ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে সামঞ্জস্য রাখতেই হবে।

প্রায় দুই হাজার বছর ধরে ধারণা ছিল, বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ হল পরমাণু। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন আবিষ্কার করে বিজ্ঞানীরা দেখলেন পরমাণু অবিভাজ্য নয়। আর এই ইলেকট্রন ইত্যাদি কণারাও যে অবিভাজ্য নয় তা প্রমাণ করেছে আকাশ। বস্তুর ভাবলোকের কণায় আকাশ সৃষ্ট।

পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন ঋণাত্মক, প্রোটন হল ধনাত্মক। পরমাণু এই দুটি গুণ পেয়েছে তার কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণের জন্য। এই দুটি বস্তু পরমাণুতে সংখ্যায় সমান থাকায় আধান নিরপেক্ষ (neutral) হয়। ১৮৯৭ থেকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে টমসন, রাদারফোর্ড ও বোরের মত বিজ্ঞানীদের গবেষণায় জানা গেল যে, পরমাণুর কেন্দ্রে আছে জমাট কঠিন কেন্দ্রীণ (nucleus)। তা পরমাণুটির প্রায় সমস্ত ভরের সমান। এই ধনাত্মক বিদ্যুতাহিত কেন্দ্রীণের চারদিকে ইলেকট্রনগুলি আবর্তন করছে। এই ইলেকট্রন পরমাণুর আকারের চেয়ে এক লক্ষ গুণ ছোট ও আয়তনও প্রায় দশ কোটিরও কোটি ভাগ ছোট। গ্রহ যেমন সূর্যের চারদিকে ঘোরে এই ইলেকট্রন তেমনি কেন্দ্রীণের চারদিকে ঘোরে। তবে গ্রহ বিদ্যুতাহিত নয়, তবে কেন্দ্রীণটি ও ইলেকট্রনগুলি বিদ্যুতাহিত। এই ইলেকট্রণের আবার শক্তি অনুযায়ী বহু সংখ্যক কক্ষপথ আছে। কেন্দ্রীন থেকে এই কক্ষপথ গুলির যেটির দূরত্ব বেশি শক্তির মাত্রাও তত বেশি।

পরমাণুর মধ্যে কেন্দ্রীণের ও যে কোন ইলেকট্রনের বিপরীতধর্মী বিদ্যুতাধান থাকায় তাদের মধ্যে একটি আকর্ষণ শক্তি কাজ করছে। যদি ইলেকট্রনটি থেমে যেত তবে কেন্দ্রীণের টানে তার উপরে প্রচণ্ড বেগে পতিত হয়ে পরমাণুটিকেই ধ্বংস করে ফেলত।

বোরের মতে কোন বস্তুর উষ্ণতা বাড়তে থাকলে বিভিন্ন বর্ণের আলো ফুটে ওঠে। তবে তিনি যে বললেন, কোন একটা কক্ষপথে ইলেকট্রনের আবর্তনে কোন শক্তি নির্গত হয় না, ম্যাক্সওয়েলতত্ত্ব তা মেনে নেয়নি। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে, ইলেকট্রন কোন দোলনপথে (oscillatory circuit) দ্রুত ঘুরতে থাকলে বিদ্যুচ্চোম্বক তরঙ্গের আকারে শক্তি আলোর বেগে বেরিয়ে আসে।

বোর বলেন, বাইরে থেকে আসা কোন প্রক্রিয়ার ফলে পরমাণু শক্তি শোষণ করলে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পরমাণুর সেই উত্তেজনায় ইলেকট্রন লাফিয়ে শক্তি অনুযায়ী উচ্চতর কক্ষপথে উঠে এক সেকেণ্ডের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সময়ে নিজের কক্ষে অথবা তখনকার শক্তি অনুযায়ী কাছাকাছি কক্ষপথে ফিরে আসে। এই প্রক্রিয়ায় দুটি কক্ষপথের শক্তির মানের পার্থক্যের শক্তি কণিকা বা ফোটন পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসে। প্লাঙ্কের কণা সূত্রের দ্বারা এই কণিকার কম্পাঙ্ক কিংবা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণীত হয়ে থাকে।

একটা বস্তুতে কোটি কোটি পরমাণু থাকলেও সব গুলোর ভেতর থেকে শক্তি নির্গত হয় না। পরমাণু গুলির শোষিত শক্তি উত্তেজনার উপর ফোটনের

সংখ্যা নির্ভর করে। আবার সব সময় পরমাণু উত্তেজিত হলেও ইলেকট্রন যথাযোগ্য শক্তির কক্ষপথে লাফিয়ে ওঠে না। পরমাণু থেকে নির্গত শক্তির ফোটনের কম্পাঙ্কের মান অনুযায়ী নানা রঙের আলো ফুটে ওঠে। পরমাণু অধিক থেকে অধিকতর শক্তি শোষণ করলে প্রথমে দেখা যাবে লাল রঙ, ক্রমে অন্যান্য রঙ।

বোরের এই পরমাণু গঠনের কল্পনার সঙ্গে নিজের ফোটনের কল্পনা মিলিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন আইনস্টাইন। তারপরে খাড়া করলেন উদ্দীপিত বিকিরণ তত্ত্ব (Stimulated Emission Theory)। এতে প্লাঙ্কের তত্ত্বের যেন নতুন ব্যাখ্যা হল।

পরমাণু থেকে নির্গত বিকিরণের অনিশ্চয়তার জন্য আইনস্টাইন বিশেষ চিন্তিত হলেন। চিন্তা করে দেখলেন পরমাণু থেকে বিকিরণের সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে হলে পারিসাংখ্যিক (statistical) নিয়মের উপর নির্ভর করতেই হয়। পারিসাংখ্যিক নিয়ম চলে অধিক সংখ্যার উপর, অল্প সংখ্যার উপর চলে না। একটা মুদ্রা দুবার টস (toss) করলে দুবারই হয়তো হেড পড়তে পারে। অথবা দুবারই টেইল পড়তে পারে। আবার একবার হেড অন্যবার টেইল পড়তে পারে। অল্পবার টসে শতকরা পঞ্চাশ বার হেড আর পঞ্চাশবার টেইল না-ও পড়তে পারে। যদি চার হাজার বার টস করা যায়, তবে ধরে নেওয়া যায় দুহাজার বার হেড আর দুহাজার বার টেইল পড়বে। এইভাবে অনিশ্চয়তাকে মানিয়ে নেওয়া যায়।

আলোর এই চলার মধ্যে কিন্তু অন্ধকার লুকিয়ে আছে। একটা পরমাণু থেকে সমস্ত ইলেকট্রন শক্তি বিকিরণ করলে সেখানে অন্ধকার থাকতে পারে না। কিন্তু তা সম্ভব নয় স্বাভাবিক কারণের জন্য। যদি ধরে নেওয়া যায়, ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুর সকল পরমাণুর সকল ইলেকট্রন শক্তি প্রকাশ করে, সে শক্তি রাখবার স্থান ব্রহ্মাণ্ডের নাই। তাই তা সম্ভবও নয়। কিছুটা বস্তু রূপে থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সীমাকে রক্ষা করতে হবে। ধরা যাক একটা ছোট ঘরে একটি বড় বাক্স আছে মাত্র। বাকী স্থান সব ফাঁকা। ঐ একটি বাক্সে ভর্তি হয়ে আছে বহু কাগজের পাখা। সেই বাক্সের সমস্ত পাখা যদি প্রসারিত করে, ছড়িয়ে বা ঝুলিয়ে রাখতে চাওয়া যায়, সমস্ত পাখার স্থান সংকুলান হবে না। কিছু সংখ্যক পাখাকে গোটানো অবস্থাতেই রাখতে হবে। তেমনি একটা সীমার মধ্যে সমস্ত বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তর ঘটিয়ে প্রসারিত করা সম্ভব নয়। স্থানের অভাবেই

সব বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত হতে বাধা দেবে। অবশ্য প্রকৃতির ক্ষেত্রে এমনটি ঘটছে। প্রকৃতিকে না মেনে সমস্ত বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে বোমার মত আধারের সীমাকে ফাটিয়ে শক্তি বাইরে বেরিয়ে যাবে।

অসীমের মধ্যে এমনিভাবে পরমাণু, অণু, বস্তু, গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য সবই নিজের নিজের সীমার মধ্যে বাস করছে। একজনের সীমা ভাঙলে অন্যের সীমায় আঘাত লাগে। এমনি অনন্ত সীমা নিয়ে অনন্ত জগৎ সৃষ্টি। জগতে সব কিছুর আকর্ষণ বিকর্ষণ চলছে কেন্দ্রভিত্তিক। একটা পরমাণুর ততটুকুই আকর্ষণ, যতটুকু তার সীমা। সে আকর্ষণের কারণও অন্যের বিকর্ষণ। আবার সেই অন্যের বিকর্ষণের পর আকর্ষণ হতে বাধ্য পূর্বোক্তের বিকর্ষণের ধারাকে স্থান দেওয়ার জন্য। এইভাবে প্রত্যেকে আকর্ষণ বিকর্ষণ চালাচ্ছে। ধরা যাক একটা ঘরে এক বাক্স বেলুন আছে। সেই ঘরে বায়ুর প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে সেই বাক্সের বেলুনগুলিকে সেই ঘরেই যদি হাওয়া প্রবেশ করিয়ে ফেলানো যায় ঘরটা ফোলানো বেলুনে ভর্তি হয়ে যাবে। ঘরের অধিকাংশ হাওয়া বেলুন গুলোতে গ্রাস করল কিন্তু বায়ুর অভাব রইল না। সেই ফোলানো বেলুন গুলোর কয়েকটিকে যদি ফাটিয়ে দেওয়া যায়, সেই কয়েকটি বেলুনের অভাবে ভারসাম্য ঠিকই থাকে। সেই কয়েকটি বেলুন মৃত রবার হয়ে পড়ে থাকে, আর তাদের হাওয়া বাইরের হাওয়ায় মিশে থাকে। এমনি এক ঈশ্বরও বহু হয়ে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় চালাচ্ছেন। সেই ঈশ্বর নরাকারের হলেও ক্ষতি নাই, কারণ তিনি তার সৃষ্টির মধ্যেই আছেন, আবার নিরাকার হলেও ক্ষতি নাই, কারণ তাঁর সীমা রক্ষা হতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কাজ করে যাচ্ছে।

সৃষ্টি যে অখণ্ড অনন্ত, তা প্রমাণ করেছে সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তুর আকর্ষণ বিকর্ষণ। আকর্ষণ বিকর্ষণ হলেই ধরে নিতে হবে সবাই সবার সঙ্গে বিনিময়ের খেলা খেলছে। সবকিছুকে নিয়ে সৃষ্টি অনন্ত বলেই আকর্ষণ বিকর্ষণের জন্য অন্য অনন্তের প্রয়োজন হচ্ছে না। এবং তা সম্ভবও নয়। যদি সম্ভবও ভাবা হয়, দুই অনন্ত পাশাপাশি হলে দুয়ের সীমায় সীমায়িত হচ্ছে। আর অনন্ত থাকছে না।

বস্তুর সব ইলেকট্রন আলো দেয় না বলেই আমরা আলো পাই। উত্তপ্ত বস্তুর উত্তেজনায় বিকর্ষণে ইলেকট্রন নিজের কক্ষ থেকে বেরিয়ে বস্তুর কেন্দ্র থেকে আরও দূরে সরে আসে। এবং সেখান থেকে আলো ছাড়ে। আবার অনেক ইলেকট্রন আলো না দিয়েই নিজের কক্ষে ফিরে যায়। এই ফিরে

যাওয়ার কারণ কিন্তু বাইরে থেকে আসা শক্তি। আবার যে ইলেকট্রন আলো দিল তাও কিন্তু সেই বাইরে থেকে আসা শক্তির সংঘর্ষে। বাইরের শক্তিতে নিজের কক্ষে ফিরে যাওয়া ইলেকট্রন বস্তুর কেন্দ্রে বাইরের শক্তির সঙ্গে যোগ দিয়ে চাপ সৃষ্টি করে বলেই সংকীর্ণ কেন্দ্রের ঠেলায় আরও ইলেকট্রন বেরিয়ে এসে কেউ আলো দেয় কেউ আলো না দিয়ে ফিরে যায়। এই সংঘর্ষে আলো সৃষ্টি হয় ও অন্ধকার সৃষ্টি হয়। এই কারণে আলোক তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। সেখানেও ফিরে আসা ও এগিয়ে যাওয়া আছে। পিছিয়ে এলে সংঘর্ষের অভাবে অন্ধকার সৃষ্টি হচ্ছে, এগিয়ে গেলে সংঘর্ষের প্রচণ্ডতায় আলো সৃষ্টি হচ্ছে। তাই জগতের যে কোন আলো নিখাদ আলো নয়, তার সঙ্গে অন্ধকার মিশে আছে, কোন অন্ধকার নিখাদ অন্ধকার নয়, তার সঙ্গে আলো মিশে আছে। তাই শক্তিশালী আলোর তরঙ্গ কম বলেই আবহাওয়ার সঙ্গে সংঘর্ষে এগুতে পারে বেশি। দুর্বল আলোর তরঙ্গ বেশি বলে আবহাওয়ার সংঘর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে অন্ধকার মিশ্রিত থাকে বেশি।

এই শক্তির গতি যত কম হবে শক্তি বস্তুতে পরিণত হতে থাকবে। সেই বস্তুতে আবার পরমাণু ইলেকট্রন ইত্যাদি সৃষ্টি হবে আবার ভবিষ্যতের আলো সৃষ্টির জন্য। কেন্দ্র না হলে বস্তু হয় না। বস্তু থেকে বিকর্ষণে ভেঙ্গে আসা অসীম চূর্ণ ভাবাকাশ কেন্দ্রের সংকীর্ণতার চাপে জমা হয়ে বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। এই বস্তু থেকে আবার বিকর্ষণে ভাবাকাশ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ আকাশ সৃষ্টি হয়। আকাশের সম্প্রসারণ বস্তুর কাছে সংকীর্ণ হয়ে এসে ঢোকে, আবার বস্তু থেকে সংকীর্ণ হয়ে বেরিয়ে ভাবাকাশে সম্প্রসারিত হয়। বড় আলোর কাছেও ছোট আলো আকর্ষিত হয়। দুই আলোর মধ্যে পার্থক্য থাকার জন্য তা সম্ভব। পার্থক্য না থাকলে কেউ কাউকে আকর্ষণ করে না। সব জল নিচুর দিকে যায় বলেই সব জল এক সঙ্গে মেশে। তাছাড়া জল জলকে আকর্ষণ করে না পার্থক্য নেই বলে। এখানে রাসায়নিক সংমিশ্রণ হয় না। রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটাতে হলে দুয়ের পার্থক্য থাকা চাই।

সূর্যের আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে বলেই তার খাঁজ বা এবড়ো খেবড়ো ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। এই ক্ষেত্রকে সৃষ্টি করেছে কেন্দ্র। সব কিছুর কেন্দ্রই তাই সব কিছুকে একীভূত করতে পারে। কারণ সব কেন্দ্রের চরিত্র এক। সব কিছুর ক্ষেত্র সব কিছুকে একীভূত করতে পারে না। কারণ সব ক্ষেত্রের চরিত্র এক নয়। তাই কেন্দ্র ছাড়া একক ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্ভব নয়। ভোগ ভোগের যোগ্য হলে ভোগ্য, আর্য অর্থে শ্রেষ্ঠ হলে শ্রেষ্ঠের যোগ্যকে আর্য্য বলা

উচিত। এখানে আর্য কোন জাতিকে বোঝায় না। এমনিভাবে কথাকে ভেদ করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাবার কেন্দ্রে যেতে পারি। এমনিভাবে বিশ্লেষণ না করতে পারলে, ল্যাবরেটরী সব কিছুর হদিস দিতে পারে না। ধর্ম, বিজ্ঞান সবাইকে প্রথমে দার্শনিক বিচার মানতেই হবে। দার্শনিক না হলে আইনস্টাইন বিজ্ঞানী হতে পারতেন না, যতই বিজ্ঞানীরা কটাক্ষ করুন।

মূলে সবাইকে যেতে হবে, যদি সব কিছুকে একসূত্রে বাঁধতে হয়। দূরের নক্ষত্রের আলো সূর্যের কাছ থেকে আসার সময় সূর্যের আকর্ষণ-বিকর্ষণের খাদে বেঁকে যায়, যেমন দুর্বল আলো সবল আলোর কাছে বেঁকে যায় বাইরের আসা হাওয়ার দাপটে। আগুন যে আবহাওয়ায় শূন্যতা সৃষ্টি করছে তাকে পুরণের জন্য এই হাওয়া ও দুর্বল আলোকের ঝুঁকে যাওয়া। সেই নক্ষত্রের আলো পৃথিবীর কাছে এলেও নাও বেঁকতে পারে।

নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বে বলা হয়েছে, দুটি বস্তুর ভিতর মহাকর্ষজ বলের উদ্ভব হয়। আইনস্টাইনের তত্ত্বে বলা হয়েছে, মহাকাশে যে কোন বস্তু নিজের চারদিকে একটা বিকৃত বা এবড়ো খেবড়ো ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। জ্যামিতিক এই গুণের জন্য মহাকাশের দুটি বস্তু পরস্পরের দিকে গড়িয়ে যায়। এই দুটি মতের প্রকৃত ব্যাখ্যা হল, দুটি বস্তু পরস্পরের কাছাকাছি আসে ঠিকই। তার জন্য দায়ী বস্তু নয়, বস্তুরও জন্মদাতা কেন্দ্র। সূর্যের এবড়ো খেবড়ো পথে যদি গ্রহরা সেই ভাবে গড়িয়ে চলত, তবে গ্রহদের পরস্পরের মধ্যে শৃঙ্খলাহীন সম্বন্ধ থাকত। বিভিন্ন গ্রহের বিভিন্ন কৈন্দ্রিক চরিত্রের জন্য সূর্যের কেন্দ্রের থেকে বিভিন্ন দূরত্বে চালিত হচ্ছে। নইলে সূর্যের একটি মাত্র কেন্দ্র তাদের একই নিয়মে চালাত। সূর্য ও গ্রহদের চরিত্র এক। কৈন্দ্রিক শক্তির পার্থক্যে এমনটি হচ্ছে। এই কৈন্দ্রিক শক্তির জন্য সূর্যের আকাশের বক্রতা, গ্রহদের আকাশের বক্রতা, উপগ্রহদের আকাশের বক্রতা। এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মহাকাশের খণ্ডতার জন্য মহাকাশ অনন্ত নয়। প্রত্যেকের গতির বক্রতার কারণে আলোর রশ্মিও বেঁকে চলে। তবে সূর্যের ধারার শক্তির কাছে আলোর শক্তি কম, তাই সূর্যের আকর্ষণে সে বেঁকে যায়। তবে প্রশ্ন আসতে পারে, সূর্যের কেন্দ্রের যখন আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে, তখন সূর্যের দিকে না বেঁকে নক্ষত্রের আলো বিপরীত দিকে বেঁকে গেল না কেন? তার পাল্টা আরও প্রশ্ন করা যায়, একটা বস্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে পড়ে যায় কিন্তু হাইড্রোজেন বেলুন আকাশে উঠে যায় কেন? এইসব প্রশ্নের

উত্তরে বলা যায়, সুতীর চাদরের মত সূর্যের আবহাওয়া, তাই আলো সেইদিকে বেঁকে যায়। আলোর কণার চেয়ে বড় কণা হলে বেঁকত না। বাইরে বেরিয়ে যেত। সেই সূর্যের গ্রহের আবহাওয়া প্লাস্টিকের চাদরের মত প্রায়, তাই আলো তেমন বাঁকে না। আলোর কণিকা আরও ছোট হলে বেঁকে আসত। উপগ্রহের আবহাওয়ার চাদর পুরো প্লাস্টিকের মত, তাই সেখানে নক্ষত্রের-আলো ঘা খেয়ে বিপরীত দিকে বেরিয়ে যায় না। দুর্বল কেন্দ্রের জন্য সেই চাদর ছিঁড়ে প্রবেশ করতে পারে। তার বিপরীতের আবহাওয়া আবার সুতীর চাদরের মত ছিদ্রযুক্ত। এই কারণে চাঁদে সবকিছু হাল্কা হয়ে যায়। সেখানে সূর্যের মত অত আকর্ষণ বিকর্ষণ নাই। কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণের বিভিন্নতায় সমস্ত চলা নির্ভর করে। সূর্যের শক্তির সঙ্গে সেই নক্ষত্রের আলোর যতখানি পার্থক্য উপগ্রহের শক্তির সঙ্গে অতি দুর্বল আলোর ততখানি পার্থক্য থাকলে সে আলো উপগ্রহের দিকে বেঁকে আসত।

তখন কেন্দ্রবাদ সম্বন্ধে চিন্তা না থাকায় আইনস্টাইন অনেক কিছুর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখেছেন। সেই অনেক কিছুর পরিণতি যখন শৃঙ্খলা প্রকাশ করে, তখন ধরে নিতে হবে সেখানেও বিশৃঙ্খলা নাই। বিশৃঙ্খলা আমাদের চিন্তার। আপেক্ষিকতাবাদে একটির সঙ্গে অপরটির তুলনা করা যাচ্ছে। তার ফলে দুটিকে সমতায় আনা যাচ্ছে না। আপেক্ষিকতা রাখতে হলে দুটি বস্তুকে আলাদা রাখতেই হবে। আপেক্ষিকতার মধ্য দিয়ে তাই সমগ্র সৃষ্টির গোড়ায় যাওয়া যাবে না। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর আপেক্ষিকতা হয় আকাশের আপেক্ষিকতা হয় না। এখানেই আপেক্ষিকতাবাদ মার খেয়ে গেল। সেখানে কেন্দ্রবাদ কাজ করে। কেন্দ্রের জন্যই বস্তু, সময় ও আকাশ সৃষ্টি হয়েছে। তবুও সৃষ্টির মধ্যে আপেক্ষিকতবাদের যথেষ্ট মূল্য আছে। অসীম একটি ছাড়া দুটি হয় না। তাই অসীমের ক্ষেত্রে তার মূল্য নাই।

আপেক্ষিকতাবাদ সমস্ত মানব জাতিকে এক করতে পারে না। তাই যে আইনস্টাইন একদিন বিশ্বনাগরিক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই আইনস্টাইন আবার জার্মানির অত্যাচারে প্যালেস্টাইনপন্থী হয়ে উঠেছিলেন। যার জন্য তিনি আমেরিকায় অর্থ সাহায্যের আশায় যান, যাতে প্যালেস্টাইনে উন্নত মানের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও বিদ্যালয় স্থাপিত হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে যখন নিউইয়র্ক বন্দরে পৌছান একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ডঃ আইনস্টাইন, আপনি কি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে পূর্বে বলেন নি ?

আইনস্টাইন জোরের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "যদি আমাদের সদ্গুণশূন্য, পরমতবিদ্বেষী, সঙ্কীর্ণচেতা এবং হিংস্রক জাতির সঙ্গে বাস করতে হত, তবে আমি আমার সমস্ত জাতীয়তাবাদ ত্যাগ করতে বলতাম।

আর একজনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "পৃথিবীর সব জায়গায় এখন নানা ধরণের আন্দোলন চলছে, নানা বিষয়ে জাগরণ আসছে। এই সময়ে আমরা যদি আলাদা আলাদা বা একাকী নিজের মতে চলি, তবে তা ঠিক হবে না। এখন সময় এসেছে সমগ্র জাতির একত্রিত হয়ে মানুষের নানাবিধ সমস্যা সমাধান করবার।"

আইনস্টাইনের এই দুটি উত্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। রাজনীতির চাপে তাঁকে নিজের আদর্শ হারিয়ে দুরকম কথা বলতে হয়েছে। এমনিভাবে মহত্ত্ব রাজনীতির চাপে বার বার মার খাচ্ছে। রাজনীতি এইভাবে মানবতায় বিশৃঙ্খলা এনে বিশ্বনাগরিকদের শৃঙ্খল পরাচ্ছে। তবে এ শৃঙ্খল অটুট নয়।

উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া রাজনীতি মানুষের মঙ্গল করতে পারে না। এই রাজনীতিতে অনেক মানবতাবাদী মহাপুরুষের অনেক ভাল কথাকে বাদ দিয়ে কোন কারণে তাঁর অন্য কথাকে কাজে লাগাতে তৎপর হয়। দার্শনিক হেগেল মনে করতেন যে, প্রাণিজগতে যেমন দুর্বলরা সহজে মৃত্যু বরণ করে, অথবা সবলের হাতে নিহত হয়। প্রকৃতিতে যোগ্যতমেরই উদ্বর্তন (survival of the fittest) হয়। অর্থাৎ জগতে যারা বেঁচে থাকার উপযুক্ত তারাই শুধু বেঁচে থাকে, এবং তারাই উন্নত জাতি গড়ে। সেই উপযুক্ত জাতি হল জার্মান। তারা আর্য বলেই সব চেয়ে বলবান, সুদর্শন এবং বুদ্ধিমান।

আর্যরা শুধু জার্মান জাতিকে নয় ভারতকেও গড়েছে। জাতির মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন, তারাই আর্য। তখন সম্মানী ব্যক্তিকে আর্য বলে সম্বোধন করা হত। আজও অনেক জাতিকে দেখতে পাই তারা তাদের জাতি সংগঠক নেতাকে নিয়ে গর্ব করে বলে, আমরা অমুক শ্রেষ্ঠ (আর্য) পুরুষের বংশধর। শ্রেষ্ঠরাই জাতি গড়ে। সেই শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবে জাতি আর্য হয়। সেই এক আদর্শের আর্য জার্মানরা যেমন, ভারতীয়রাও তেমনি। তাই উভয়ের সম্পর্কীয় দেশগুলোও আর্যভাষা থেকে সংস্কৃতির সন্ধান করে। তাই ভারতের মত জার্মানীতেও সংস্কৃত পণ্ডিত আছে। জার্মানীবাসীর গায়ের রঙ সাদা আর ভারতবাসীর গায়ের রঙ কালো, তাতে কিছু যায় আসে না। পুরাণে আর্যদের রঙ সাদা কালো দুই দেখা যায়। অনার্য কোন একটা জাতি নয়। জাতি

ভাগ করা হয় অঞ্চলের নামে। আসলে অনার্য বলতে বোঝাত সাধারণ মানুষকে।

অস্ট্রিয়ার একটা দরিদ্র পরিবারে হিটলারের জন্ম। তাই তিনি অর্থাভাবে লেখাপড়া শিখতে পারেন নি। তাই স্বাভাবিকভাবে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও ধর্মের গোঁড়ামি তাঁর মধ্যে পুষ্টতা লাভ করে। হেগেল জাতি গঠনের কথা বলেছিলেন, হিটলার তার অপব্যাখ্যা করে জাতি গড়তে ইহুদি জাতিকে ধ্বংস করতে লাগলেন। একই দেশে একই সমস্যায় সুখে দুখে একটা জাতি গড়ে ওঠে। আসলে মূল সভ্য জাতি তো একটাই ছিল সভ্যতা একস্থানে গড়ে উঠেছিল বলে। আইনস্টাইন জার্মান জাতিকে ভৎর্সনা করেছেন তাদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে। ভৎর্সনা পাওয়ার যোগ্য হিটলার প্রমুখ রাজনৈতিক নেতারা। যতই হিটলার নিজেকে আর্য বলুন, জ্ঞানে তিনি অনার্য বলেই দেশকে ধ্বংস করে গেছেন।

মূল মানব সভ্যতার জন্ম একস্থানে বলেই কোন জাতির মূল আদর্শ দুই হতে পারে না। এই দুই হওয়ার জন্য দায়ী নেতারা। এই নেতাদের শাসিত জাতিগুলোর মধ্যে কোন্দলের উদ্দেশ্যে আপেক্ষিকতা চলছে। মূল কেন্দ্রের সঙ্গে আপেক্ষিকতা না হলে কোনকিছুর বিচার হয় না।

বস্তুর সঙ্গে বস্তুর আপেক্ষিকতা যদি হয়, কেন্দ্রের সঙ্গে কেন্দ্রের আপেক্ষিকতা হবে না কেন? সব বস্তুর কেন্দ্র আছে, তাই কেন্দ্রের সঙ্গে কেন্দ্রের আপেক্ষিকতা গড়লে বস্তুর আপেক্ষিকতা হতে বাধ্য। পৃথিবীর নানা স্থানের আপেক্ষিকতা আছে। এইসব স্থানের পরস্পরের পার্থক্য কিন্তু পৃথিবীর একটা কেন্দ্রেই বাঁধা। এখানে একটা পৃথিবীর বিচার করতে অন্য পৃথিবীর প্রয়োজন হয় না। কেন্দ্র হল এক ব্রহ্ম। পৃথিবীর কেন্দ্রের বিচারে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু, আকাশ, আলো, অন্ধকার, সময় সবকিছুর বিচার হবে।

কেন্দ্রের নানা শক্তি নানা বস্তু সৃষ্টি করে। আবার নানা বস্তু নানা শক্তি সৃষ্টি করে। সেই সব নানা বস্তু ও নানা শক্তির নানা গুণের জন্য নানা নাম দিয়ে থাকি। আসলে কিন্তু সবই কেন্দ্রের বা ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে। কোনটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ কোনটা শব্দ তরঙ্গ, কোনটা সমুদ্রের তরঙ্গ, কোনটা যান্ত্রিক তরঙ্গ। যে কোন বস্তুর চলন্ত অবস্থায় তরঙ্গ হয়। ইলেকট্রন বস্তু, তাই চলন্ত অবস্থায় তরঙ্গ হয়। তরঙ্গ হলেই বুঝতে হবে সে বাঁধা ঠেলে চলেছে। আঘাত খেতে খেতে চলছে বলে আলো প্রকাশ করছে। প্রতি ক্ষেত্রে ইলেকট্রন চলার সময়

আবহাওয়ার সঙ্গে সংঘর্ষে আলো দিয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছে, আবার পেছনের শক্তির ঠেলায় এগিয়ে গিয়ে সংঘর্ষে আলো সৃষ্টি করছে। টর্চ জ্বাললে পেছনের শক্তির ঠেলা সংঘর্ষ করতে সাহায্য করে। এই ঠেলা না থাকলে সংঘর্ষ অভাবে আলো জ্বলতে পারে না। ইলেকট্রন হল তাই বস্তু। সে ঠেলা পেলে তরঙ্গ সৃষ্টি করে। উপযুক্ত স্থান পেলে সে তরঙ্গ না হয়ে স্থির হয়ে অবস্থান করতে পারে। তুলো যেমন হাওয়ায় উড়তে থাকে, কিন্তু হাওয়া না থাকলে একস্থানে অবস্থান করে। হাইড্রোজেন বেলুনও একস্থানে অবস্থান করতে পারে, কিন্তু তার এই আবহাওয়ায় অবস্থানের স্থান নাই বলে উপরে উঠতে থাকে। বেগুনি আলোক কণিকার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হওয়ার কারণ চলার পথে বাধা কম। তাই তার গতি শক্তিও বেশি। যে বস্তু অবস্থান করছে, তার চলার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য না থাকলেও কৈন্দ্রিক আকর্ষণ বিকর্ষণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকে। সে তরঙ্গ ছিন্ন হয় না বলে বস্তুটি অবস্থান করে। তার গতি বাড়লে যত তরঙ্গ ছিন্ন হতে থাকে, তত তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছিন্ন হয়ে গতি বাড়তে সাহায্য করবে। যেমন চলন্ত গাড়ির গতি আরও গতি বাড়াতে সাহায্য করে। তাই গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চরম গতি হয় না। এই কারণে দশ তলা বাড়ি থেকে ঝাপিয়ে পড়লে মানুষ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু দশ হাত উঁচু থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লে চূর্ণ হতে হয় না। অথচ পৃথিবীর কাছে বেশি মাধ্যাকর্ষণ থকায় দশ হাত উঁচু থেকে পড়লে চূর্ণ হওয়া উচিত ছিল। আসলে মাধ্যাকর্ষণ সামগ্রিক ভাবে ছড়ানো। আসলে গতির দূরত্ব বাড়লে শক্তির কারণে চূর্ণ হতে হয়। কারণ শক্তিকে সে ধরে রাখতে পারে না বলে আবরণ ভেদ করে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বস্তু তখন শক্তির আকারে বেরিয়ে আসে। এই শক্তিকে ধরে রাখতে লোহা পাথরের মত কঠিন পদার্থও পারে না। তাকে উত্তপ্ত করলে তাপ বিকিরণ করে। একটা মানুষ যখন হাটে স্বাভাবিকতার জন্য উৎপন্ন শক্তি ধরে রাখতে পারে। সে যখন ছুটতে থাকে, তখন এমন শক্তি উৎপন্ন হয়, তা ধরে রাখতে না পেরে হাঁফাতে থাকে।

একের শক্তি অন্যে সঞ্চারিত হয়ে তাকে পুষ্ট করে। একের বিকর্ষিত শক্তি অন্যে আকর্ষিত হয়, কারণ তাকেও বিকর্ষণে নিজেকে শূন্য করতে হয়েছে। শূন্যতা আকর্ষণ করবেই, কারণ সৃষ্টিতে শূন্যতা রাখা অপরাধ। প্রতি মুহূর্তে তাই আকর্ষণ বিকর্ষণ চলেছে। সমপ্রভাবে সমান উত্তপ্ত হলে অনন্তের আকর্ষণ বিকর্ষণ থাকত না। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে তা সম্ভবও না। পার্থক্য থাকলেই তো আকর্ষণ বিকর্ষণ হবে। এই পার্থক্যের আকর্ষণ বিকর্ষণে সবার সঙ্গে সবার যোগ

থাকায় অন্তরা অনন্ত হয়ে গিয়েছে। যে কোন একটা জ্যোতিষ্ক অন্তর্যুক্ত। আবার অসংখ্যার সঙ্গে যোগে সে অনন্ত। একটা গ্রহ সবদিক থেকে সমানভাবে প্রভাব পায় না। তাই নানা দিকের নানা প্রভাব পার্থক্য এনে অণু পরমাণুদের চালিত করছে। সবদিকে সমান প্রভাব নাই বলে একটু একপেশে শক্তি কাজ করায় গ্রহরা একটু ত্যারছা ভাবে কেন্দ্রভিত্তিক শক্তি পাচ্ছে, তার জন্য তারা সেই ভাবে ঘুরছে। এই ঘোরার জন্য তারা গোলাকার হয়েছে। যে কোন একটা গোলাকার বস্তু গরম করলে উপরের তাপ কেন্দ্রে যাবে। কেন্দ্রে স্থান না থাকায় তা ফিরিয়ে দিয়ে প্রতি মুহূর্তে সমতা সৃষ্টি করছে আর প্রতি মুহূর্তে গরম হচ্ছে।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের "ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন" পত্রিকায় লুই ছ ব্রগলি (Louis de Broglie) একটা নিবন্ধ লেখেন। তাতে বলা হয়েছে, যে কোন বস্তু, সেটি গ্রহ, পাথর, ধূলিকণা কিংবা ইলেকট্রন যে কোন বস্তুই হোক না কেন, চলন্ত অবস্থায় তারা হবে একটা তরঙ্গের সমষ্টি। বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গগুলি যেমন সম্পূর্ণ শূন্যস্থান অতিক্রম করতে পারে, তেমনি বস্তু তরঙ্গগুলিও মাধ্যম ছাড়াই প্রবাহিত হতে পারে। একে তিনি যান্ত্রিক তরঙ্গ নাম দিয়েছেন। এই তরঙ্গ সৃষ্টিতে বিদ্যুতাধানের কোন প্রয়োজন নাই। এই বস্তুগুলি বিদ্যুতাহিত হোক আর না হোক গতিতে থাকলে তরঙ্গ সৃষ্টি করবে। তিনি এক গাণিতিক সূত্রে বললেন, চলন্ত বস্তুটির ভর ও বেগ জানা থাকলে, বস্তুটির তরঙ্গের দৈর্ঘ্য জানা যাবে। তার ভর ও বেগের যে কোন একটি যত বেশি হবে, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তত ক্ষুদ্র হবে।

ব্রগলি তাই ইলেকট্রনকে তরঙ্গ রূপে ভেবেছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আইনস্টাইন বলেছিলেন, ইলেকট্রন হল কণিকা। এই দুটি রূপই এখন মানা হয়। সৃষ্টির বহু সেণ্টারের বহু রূপ আছে। বহুকে একে বাঁধতে ইউনিফায়েড সেণ্টার থিওরিকে মানতে হবে। জলকে বাইরে থেকে ঝাঁকা দিলে ঢেউ হয়, আবার উত্তাপে ফোটালে ঢেউ হয়। বাইরের আঘাতের ঢেউতে জল সমপ্রভাবে আন্দোলিত হয় না। কারণ তখন জলের মধ্যে ঠাণ্ডা ও গরমের পার্থক্যের খেলা চলে না। তবে আরও গভীরে গেলে দেখা যাবে জলকে আন্দোলিত করলে সে শক্তি পাচ্ছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে নিজের মধ্যে। সেখানে প্রাকৃতিক যন্ত্র কাজ করছে। জলকে আগুনে ফোটালে ঢেউ সৃষ্টি করতে সামগ্রিকভাবে শক্তি পায়। এই সামগ্রিক শক্তি মূলে না হয় পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। জল বরফ

নিচের উত্তাপে ফোটে তখন বুঝতে হবে জল নিচে প্রতি মুহূর্তে গরম হয়ে উপরে উঠছে, আর উপরের জল ঠাণ্ডা হয়ে নিচে নামছে।

বস্তুকে গরম করলে ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে তাই হয়। প্রাকৃতিক আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তিতে ইলেকট্রন তো ঘুরছেই, তার পরে উত্তাপে তাদের কেউ কক্ষচ্যুত হয়ে উপরে উঠে নেমে আসছে আবার কেউ উপরে উঠে আলো প্রকাশ করছে। ফুটন্ত জলকে বিচার করে দেখা যাবে ইলেকট্রনের উপরে উঠে নিচে নেমে যাওয়াও অন্যান্য ইলেকট্রনের শক্তি প্রকাশের কারণ। পূর্বে বলেছি, এখানেই আঁধার ও আলোর সৃষ্টি। তাই ঢেউ উঠলে আমরা ঢেউয়ের উপর দিককে দেখতে পেলেও নিচের দিককে দেখতে পাই না।

টর্চের উৎস থেকে আলো বেরিয়ে স্বচ্ছ কাচের বদ্ধতায় আলোর ঢেউয়ের আঁধার সংকোচিত হয়ে যায়। ফলে আলোক কণিকারা সেখানে আরও কাছাকাছি আসায়, সংখ্যা মিলিত হয়ে পরিমাণে রূপান্তরিত হয়। তার রুক্ষতাহীন সমতা আবহাওয়ায় সমতা সৃষ্টি করে। তাই চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল আলো দেখে। কারণ ঘটনা অনুসারে প্রকৃতি সাড়া দেয়। আগুন যখন সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে, হাওয়াও তখন সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টিও তখন আঁধার আলোর খেলায় বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে। ইলেকট্রন বস্তু হয়ে চলে বলেই, আর হাওয়া সেই মত তরঙ্গ প্রকাশ করে।

প্রত্যেকের চলার উপযোগী পথ আবহাওয়া দেয়। ইলেকট্রনের চলার পথ আবহাওয়ায় আছে। তাতে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় না। তরঙ্গ সৃষ্টির কারণ অন্যান্যের উপযোগী পথ। একটা ভিড়ের মধ্য দিয়ে ছোট শিশু সহজে বেরিয়ে যেতে পারলেও, তারও বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। এই বাঁধা ততটা আমাদের নজরে পড়ে না, যতটা নজরে পড়ে সেই পথে একটা মোটা লোক চললে। এখানে দেখা গেল প্রত্যেকের উপযোগী পথ আছে। সেই পথের বাঁধার কোনটা চোখে পড়ে কোনটা পড়ে না। বস্তু যেমন তরঙ্গ সমষ্টি, তেমনি কণিকার সমষ্টি। বস্তুর মধ্যে তরঙ্গ আছে বলেই, কণিকা সৃষ্টি হতে পেরেছে। কণিকা না থাকলে তরঙ্গ সৃষ্টি হত না। এই ঘটনার মূল ভূমিকা কেন্দ্রের আকর্ষণ বিকর্ষণ নেয়। এই তরঙ্গ শূন্যে দেখা গেলেও, শূন্য এই তরঙ্গ সৃষ্টি করে না। এই শূন্যকেও সৃষ্টি করেছে বস্তু, গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য ইত্যাদি।

কোন কোন বিজ্ঞানী এই ঘটনার মূলের ব্যাখ্যা দিতে না পেরে বললেন, একটা ইলেকট্রন নিয়ে চিন্তা করার কোন মানে হয় না, বিজ্ঞানীরা তো ইলেকট্রনের রশ্মি

নিয়ে কাজ করেন, যাতে থাকে কোটি কোটি ইলেকট্রন। ইলেকট্রন কণিকা বা তরঙ্গ যে ভাবেই থাকুক না কেন, তাদের রশ্মির ক্ষেত্রে গ্যাসের অণুদের মত পরিসংখ্যানের (statistics) ও সম্ভাব্যতার (probability) কথা ভাবতে হবে। যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র বাস্তবে সম্ভব হয়নি, তা দিয়েও ইলেকট্রনের মত অতি ক্ষুদ্র কণিকার অবস্থান ও বেগকে নিখুঁতভাবে দেখা যাবে না। তাই কোন কোন বিজ্ঞানী অত সূক্ষ্মতায় না গিয়ে বিশ্বকে বলেছেন তরঙ্গ ও কণিকার মিশ্রণ। তবু এই কণিকা-জগতের গতিবিধি অবলম্বনে বোরের নেতৃত্বে হাইজেনবার্গ, শ্রোয়েডিঙ্গার, বর্ণ, ডিরাক ও ব্রগলি গড়ে তুললেন কণা-বলবিদ্যা (quantum mechanics)। এই কণা-বলবিদ্যা সম্পর্কে বোর আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে তিনি বললেন, ঈশ্বর বা প্রকৃতি পাশা খেলেন না যে, যার দান ফেলায় এটি হতে পারে আবার ওটিও হতে পারে।

বদ্ধতার মধ্যে যেমন আগুন জ্বলে না, পরমাণুর বদ্ধতার মধ্যে তেমনি ইলেকট্রন চলে না। কেন্দ্র ভিত্তিক বাইরের সঙ্গে আকর্ষণ বিকর্ষণে আগুন জ্বলে বা ইলেকট্রন চলে। আইনস্টাইন বলেছেন, সূর্যের অবস্থিতির পরে নির্ভর করে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। সেখানে বল বা আকর্ষণ বলে কিছু নাই। সূর্যের চারদিকে মহাকাশের কিছু পরিমাণ অংশ এবড়ো-খেবড়ো হয়ে থাকে। সেই ক্ষেত্রে গ্রহরা সহজ পথ ধরে চলে। সেটি হল আবর্তনের কক্ষপথ। ১৯১৯ সালে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় তা প্রমাণিত হয়।

বিশ্বে বস্তু আছে বলেই অবিচ্ছিন্নভাবে মহাকাশ ও সময় রয়েছে। একেই বলা হয় মহাকাশ সময় সন্ততি (Space Time Continuum)। আবার ম্যাক্সওয়েল তত্ত্বে বলা হয়েছে, কোন বিদ্যুতাধান শূন্যে দোলায়িত হতে থাকলে তরঙ্গের আকারে বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। এর ফল স্বরূপ আমরা পেয়েছি বেতার যোগাযোগ। একই সন্ততির দুটি রূপ কি ভাবে সম্ভব, তা আইনস্টাইন তত্ত্বীয় জ্ঞানে বুঝে উঠতে পারেন নি। মহাকাশের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র ও অপরটি বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্র ছাড়াও পারমাণবিক জগতে আরও দুটি ক্ষেত্র আছে, সে দুটি হল পরমাণু কেন্দ্রীনে শক্তিশালী ক্ষেত্র ও কেন্দ্রিনের বাইরে দুর্বল ক্ষেত্র। আইনস্টাইনের একীভূত ক্ষেত্রের স্বপ্ন বাস্তব হতে পারে এই চারটি ক্ষেত্রকে মেলাতে পারলে। কিন্তু একীভূত কেন্দ্রতত্ত্ব ছাড়া তা সম্ভব নয়।

এই চারটিকে ধরে বেঁধে এনে মেলানো যায় না। এই চারটির পরস্পরের মধ্যে কেন্দ্রভিত্তিক পূর্ণতা শূন্যতা কাজ করছে। এই চারটির প্রত্যেকের যেমন কেন্দ্র

আছে, আবার এইসব কেন্দ্রগুলির একটা প্রধান কেন্দ্র আছে। এই প্রত্যেক কেন্দ্রের সঙ্গে প্রত্যেক কেন্দ্রের পার্থক্য আছে। নিউটন বলেছিলেন, যে কোন দুটি বস্তু তারা যে কোন স্থানে থাকুক না কেন পরস্পরকে আকর্ষণ করে একটি বলের দ্বারা। আইনস্টাইন এই বল বা আকর্ষণ উপেক্ষা করে বললেন, সূর্যের চারদিকে গ্রহদের ঘোরার কারণ, সূর্যের অবস্থিতি। দুটি মতই অসম্পূর্ণ। পরস্পরের যোগাযোগের যান স্বরূপ ইথারের কথা বলা হয়েছিল তাও অসম্পূর্ণ। প্রত্যেকে আপেক্ষিক শূন্যতায় চালিত হয়। একটা ঢিল ছুঁড়লেও সে চলে আপেক্ষিক শূন্যতায়। তাকে যে শক্তি দিয়ে দেওয়া হল, সেই শক্তি পথের বাধার চেয়ে জোরালো। এখানে চলা পাওয়া গেলেও, সেই চলার যান কে হল, আর সে বাধার সম্মুখীন হল কি ভাবে ?

বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সেই শক্তিকে আমরা বুঝতে পারি। তাতে এটাও জানতে পারি শক্তি তাহলে শূন্য নয়। এই শক্তি আবার শূন্যতায় রূপান্তরিত হয় বহু পদার্থ, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহদের বিকীর্ণ শক্তির ভাবপারের জটলায়। একে আমরা বলি শূন্য বা আকাশ। ঢিল ছুঁড়ে দিলে এই শূন্যতা একমুখী হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই শক্তি যে কেন্দ্রে ধরা দেবে, সেখানে বস্তুতে রূপান্তরিত হবে। এখানে ভাব বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। সমগ্রে বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয় সম্পূর্ণ সত্য নয়, সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে ভাব বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। কারণ বস্তুর পৃথিবী ও ভাবের আকাশ স্থায়ী। বিজ্ঞান এই আকাশকেই বাদ দিয়ে বসে আছে। পরমাণুতে যেমন কেন্দ্রভিত্তিক ইলেকট্রন ও আকাশ আছে, তেমনি সৌর-জগতে গ্রহ ও আকাশ আছে। এই আকাশের সঙ্গে বস্তুও যদি আকাশ হয়, তবে সেখানে এত প্রসারিত স্থান হবে না। তাছাড়া সেখানে কেন্দ্র না থাকলে বিকর্ষণে স্থান সৃষ্টি করবে কে ? সব যদি বস্তু হয়, সেখানেও সমস্যা দেখা দেবে। তার কেন্দ্র আকর্ষণের পর বিকর্ষণ চালাবে কোথায় ? আকাশ না থাকলে সেই সংকোচিত বস্তু দাঁড়াবেই বা কোথায় ? তাই প্রত্যেকের নির্দিষ্ট স্থান রাখতে বস্তুর পাশে আকাশকে ভাবতেই হবে। এই দুইকে বাঁধতে হবে এক কেন্দ্রে। সেই কেন্দ্রই বস্তু সৃষ্টি করে, আকাশ সৃষ্টি করে। এখানে চলার জন্য ইথারের অভাব মিটছে, গ্রহদের চলার জন্য আইনস্টাইনের পরিকল্পিত সূর্যের চারদিকে এবড়ো খেবড়ো পথের অভাবও মিটছে।

ইলেকট্রন বস্তুর একটা অংশ। কোটি কোটি ইলেকট্রনের ধারা আবহাওয়ার সংঘর্ষে হয় আলোর রশ্মি। এই রশ্মি আবার আকাশ হচ্ছে।

ইলেকট্রনকে তাই আমাদের জানতে হবে। এই ইলেকট্রন ক্ষয় হলে বস্তুও ক্ষয় হয়। যে কোন বস্তু কেন্দ্রভিত্তিক বিকর্ষণে ক্ষয় হয়। বিকর্ষণ হলেই আকর্ষণ মেনে নিতে হবে পুরোনের জন্য। শূন্য আর বস্তু তার ফলস্বরূপ। একটা বোমা ফাটলে বিকর্ষণে সমস্তটাই ক্ষয় হচ্ছে। তবে তারও একটা আকর্ষণ আছে। সে আকর্ষণ গ্রহণ করছে বোমার বিকর্ষণ যে স্থানকে আপেক্ষিক শূন্য করে দিয়েছিল সেই স্থান।

মূল কেন্দ্র যদি ঠিক থাকে, বস্তুও ঠিক থাকবে। পরমাণুর ক্ষেত্রেও তার কেন্দ্র ঠিক থাকলে প্রোটন ঠিক থাকবে। তার রাসায়নিক গুণাবলীর-ও পরিবর্তন হবে না। নিউট্রন কম বেশি হলেও যায় আসে না। নিউট্রনের সংখ্যার পরিবর্তন হলে পরমাণুটির ভৌত ধর্ম (Physical Properties) যেমন ভর, ঘনত্বের পরিবর্তন হবে। পর্যায় সরণীতে পরমাণুটির রাসায়নিক গুণাবলী (Chemical properties) ঠিকই থাকবে। যেসব মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রীনে সমসংখ্যক প্রোটন থাকলেও নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন, সেগুলোকে বলে আইসো-টোপ (isotope)। গ্রীক ভাষায় isos অর্থ সম এবং topos অর্থ স্থান। এই পদার্থগুলি পর্যায় সরণীতে একই ঘরে অবস্থান করে বা সমস্থানিক।

মানব সভ্যতা গড়তে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি ভাগ পর্যন্ত শিল্পে এবং অন্যান্য কাজে মানুষ নিজের শক্তি, ঘোড়া, গরু ইত্যাদি জন্তুর শক্তি, বায়ুর শক্তি, নদীর স্রোত বা অবরুদ্ধ জলের বেগকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হয়েছে। পরে রাসায়নিক বিক্রিয়ার শক্তি যেমন, বাষ্প চালিত যন্ত্র, পেট্রল বা ডিজেল চালিত যন্ত্র, পারমাণবিক শক্তি চালিত যন্ত্র প্রাধান্য পায়। আইন-স্টাইনের অনুসিদ্ধান্ত মত এক গ্রাম কয়লার সব পরমাণুর ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে যে শক্তি উৎপাদিত হয়, তা কয়লা থেকে সাধারণভাবে উৎপাদিত শক্তির থেকে বহু কোটি গুণ বেশি। বস্তু ও ভাবের সমন্বয় ছাড়া শক্তি উৎপাদিত হয় না বলে পৃথিবীর সব বস্তুর পরমাণু পুড়িয়ে এ শক্তি উৎপাদন করা যায় না। কিছু বস্তুকে থাকতে হবে শক্তি উৎপাদনের জন্য সংঘর্ষ যোগাতে।

কেন্দ্রবাদের জন্য একটা বস্তুও পূর্ণ নয়, ভাবও পূর্ণ নয়। কেন্দ্রভিত্তিক উভয় মিলে পূর্ণ। উভয়ে পরস্পরের থেকে দূরে থাকলেও পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের ফলশ্রুতি হল গ্রহ-উপগ্রহরা একটু ঝুকে চলে। শুধু একটা বস্তু মাত্র শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে না কারো সাহায্য না নিয়ে।

একটা বিস্ফোরণ সৃষ্ট শূন্যতায় বাইরের আবহাওয়ার পতন যে শক্তি সৃষ্টি করল, তার শক্তি অতি প্রচণ্ড। এখানে বস্তু ও শূন্যতার সহযোগিতায় শক্তি উৎপাদিত হল। একা বস্তু বা একা শূন্যতা শক্তিতে পরিণত হল না। কেন্দ্রের দুই গুণই শক্তি সৃষ্টি করল। বস্তু দিল তাকে উত্থান শক্তি, শূন্যতা দিল আকর্ষণের পতন শক্তি কেন্দ্রের নেতৃত্বে। মানুষের সৃষ্ট শক্তি অধিকাংশ পতনপ্রধান। বাকী সব প্রাকৃতিক শক্তি কিছুটা সামঞ্জস্যপ্রধান। পুরোটা নয়। কারণ পুরোটার সামঞ্জস্য থাকলে জগতে কোন সৃষ্টিই হত না।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বস্তু আছে বলে পতনশক্তি প্রশমিত হয়। বোমা যদি না ফেটে ধীরে ধীরে শক্তি প্রকাশ করত, তবে তার পতনশক্তি সেই বোমা হজম করে নিত। এই হজম শক্তির জন্য প্রচণ্ড শক্তিতে গ্রহ উপগ্রহরা চললেও তারা নাশকশক্তিকে হজম করে নিচ্ছে। আবার বিকর্ষণে শক্তি প্রকাশ করছে। তাই আকাশ বজায় আছে। নইলে সূর্য বিস্ফোরণে ফেটে গেলে আকাশের শূন্যতা এমন পতনশক্তি প্রকাশ করত যে, সৌর জগৎ ধ্বংশ হয়ে যেত। তার প্রভাব অবশ্যম্ভাবীভাবে পড়ত অন্যান্য তারকা রাজ্যে। কারণ সবারই কৈন্দ্রিক চরিত্র একে বাঁধা। আর এই শক্তি প্রকাশের কাজ করে শূন্য। শূন্যে আকর্ষিত হয়ে অন্য তারকারাজ্যের বস্তু ভেসে আসত। এই বস্তু ও আকাশ-জনিত কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে বলেই প্রতিটি গ্রহ উপগ্রহ সূর্য অণুপরমাণু নিজের নিজের সীমা নিয়ে বেঁচে আছে। তাই সে চুপসেও যাচ্ছে না, বিস্ফোরিতও হচ্ছে না। প্রত্যেকের মধ্যে তাই বস্তু-শক্তির চরমে আকাশ হচ্ছে, সেই আকাশ পতনের ফলে বস্তু হচ্ছে। যে হেতু সব বস্তু হলে তাদের প্রসারণের চুপসে যেতে হত, তাই আকাশকে বজায় রাখতে হচ্ছে, সব আকাশ তাদের বিস্ফোরিত হতে প্রসারণ দিলে বিস্ফোরিত হতে হত, তাই বস্তুকে বজায় রাখতে হচ্ছে।

সাত

আইনস্টাইনের প্রথম জীবন কেটেছে যেমন বাধাবিপত্তির উত্তেজনায়, পরবর্তী জীবন কেটেছে তেমনি সম্মানও হৈ-হল্লোড়ের উত্তেজনায়। উত্তেজনার উত্তাপ মানুষকে কখনও গভীরে আনতে পারে না। বিজ্ঞানী মাত্রই জানেন, উত্তাপের কাজ বিকিরণ

করা। সমাজের ক্ষেত্রে সেণ্টার তেমনি কাজ করলেও উদ্‌ভ্রান্ত লোক সেণ্টার থেকে দূরে এসে বিকীর্ণ পারিপার্শ্বিক রশ্মির জটলায় নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে। সামাজিক চাপে তিনি ঠেকে অনেক শিখলেও ভিত্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি ধর্মেরও কাছাকাছি এসেছেন অনেক সময়, কিন্তু তার কেন্দ্রে যেতে পারেন নি।

আমি এখানে ধর্ম বলতে মূর্তি পূজার কথা বা কুসংস্কারের কথা বলছি না। যিনি একে স্থির হতে কর্তব্য পালন করেন তিনি ধার্মিক। এই হিসাবে একজন বৈজ্ঞানিকও ধার্মিক। একটা কর্তব্য পালন করতে হলে পূর্বে বিচার বিতর্ক করে নিতে হয় অন্তত মনে মনে, তারপর প্রচলিত ধর্মকেও সেই বিচারের দ্বারা সংস্কার করতে হবে। যদি কেউ মনে করেন এ ধর্ম বাদ দিলেও চলে, তবে তাঁরা ভুল করবেন। তাঁরা যে সমাজে বাস করেন, সেই সমাজের অধিকাংশ লোক সেই ধর্ম নানা ভাবে পালন করে চলেছে। পৃথিবীর হাজার হাজার বছরের ইতিহাসও ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। আপনার এখানে উচিত সেই ধর্মে ঢুকে তার ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ চিন্তা ইত্যাদিকে নূতন ব্যাখ্যায় মানুষের ভেতর প্রচার করা। নানা চিন্তার ঝড়ে বিজ্ঞানীরা সেই কেন্দ্রে ডুবতে পারছেন না। উত্তেজনায় ভেসেই আছেন। সেখানে তাই আপেক্ষিকতাবাদ কাজ করলেও, কেন্দ্রবাদ কাজ করছে না। কেন্দ্রবাদ একে যাওয়া। আপেক্ষিকতাবাদ দুয়ে যাওয়া। দুয়ের মধ্যে তুলনা না হলে আপেক্ষিকতাবাদ হয় না। সেই তুলনা যদি কেন্দ্রভিত্তিক হয়, অনন্তের অখণ্ডতা বজায় থাকে। কারণ যে কোন বস্তুর কেন্দ্রের চরিত্র এক। কেন্দ্রকে মেনে দুই ভাবলেও অনন্তের ক্ষতি হয় না।

আসলে আইনস্টাইন কেন্দ্রের ঈশ্বরে আসতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি ঈশ্বরকে বলেছিলেন ইউনিভার্সাল গড়। এই ইউনিভার্সাল গডেই একক ক্ষেত্রতত্ত্ব বা ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি। এক স্থানে সবার মিলতে হলে সবাইকে নানা পথে নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এসে মিলতে হয়। তেমনি ধার্মিক বিজ্ঞানীদেরও মিলতে হবে ধর্মের বাধা এবং বিজ্ঞানের কিছুকিছু অনুমানের বাধা অতিক্রম করে এক সেণ্টারে।

মনে রাখতে হবে বিজ্ঞানের ধর্ম আমাদের হাজার হাজার বছরের পিতৃ-পিতামহদের ইতিহাস ধরে রাখেনি, ধরে রেখেছে ধর্মের বিজ্ঞান। নারকেলের ছোবড়ার মধ্যে দুখানা রুটি ও এক গেলাস সরবৎ থাকে। অর্থাৎ ছোবড়ার মধ্যে অন্ন জল থাকে। সে ছোবড়ারও আবার ছোবড়া নয়, তার মধ্যে আছে সমাজ বন্ধনের দড়ি। তাতে আধুনিক জগতের উপযোগী কাপড় না বোনা গেলেও,

বোনা যায় চটের মত কাপড়। কাপড় শিল্প উন্নত হওয়ায় ছোবড়ার কাপড় পরিত্যাগ করা যেতে পারে। ধর্মের কুসংস্কারে দরিদ্র অশিক্ষিতরা গুরুদের হাতে শোষিত হয় বলে এই কুসংস্কার অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে।

প্যারাসাইকোলজি বা পরামনোবিদ্যা অনুযায়ী অনেকে বলেন, মনের জোরে পাহাড় ভেঙে দেওয়া যায়। এই কথা বিজ্ঞান সম্মত নয়। তবে মনের ইচ্ছায় যে প্রচেষ্টা চলে, তার দ্বারা গাঁইতি দিয়ে পাহাড় ভাঙ্গা যায়। একে অতীন্দ্রিয় কাজ বলে না, ইন্দ্রিয়ের কাজ বলে। এখানে চিন্তা বস্তু না হলেও ঘটনাটা বাস্তব। আলোর পরমাণু না থাকলেও তার উৎসে তেলের পরমাণু আছে। আবার সূক্ষ্ম জলকণা আকাশে গিয়ে বরফ সৃষ্টি করে। আবার মার্কিন স্পেসল্যাব—১ মহাশূন্যে ভারী জল দেখতে পেয়েছে। কথা বললে, মানুষ কানে শুনতে পায়। হাওয়া নানা দিকে চলে। সেই হাওয়ার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম কণা আছে, যা আমাদের ইন্দ্রিয় ধরতে পারে না। ইলেকট্রনিকের সূক্ষ্মতার কথাও অনেকে জানে না। এসব ঘটনা পঞ্চেন্দ্রিয় ধরতে পারেনা বলেই অতীন্দ্রিয় কাজ বলে। তাই অতীন্দ্রিয়তা অবাস্তব কিছু নয়।

যাকে আমরা অতীন্দ্রিয় ঘটনা বলি, সেখানে আমরা পৌঁছাতে পারিনি বলে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মিলন আনতে পারছি না। তবে বিজ্ঞান ইলেকট্রনিক ব্রেনের সাহায্যে সেখানে যাচ্ছে। ধর্মও সেই পথের পথিক। কিন্তু ঠিক স্থানে পৌঁছাতে পারেনি বলেই ধর্ম কোন গাঁইতি না নিয়ে মনের জোরে পাহাড় ভাঙ্গার কথা বলে চলেছে।

ধর্ম দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদীরা এক ঈশ্বরকে মানে। সেই এক ঈশ্বর দ্বৈতবাদীদের কাছে পুরুষ ও প্রকৃতি। বৌদ্ধ ধর্ম তো ঈশ্বরই মানে না। বিজ্ঞান বস্তুবাদী। সে প্রয়োজনের জন্য যা কিছু আবিষ্কার করছে তাকেই বিশ্বাস করছে। তবে লক্ষণীয় যে, সে আজ অদ্বৈতবাদে যেতে চাইছে একক ক্ষেত্রতত্ত্বের মধ্যে দিয়ে। সবই কল্যাণের জন্য। কেউ যদি ভাল কাজ করে, সবাই তাকে ভাল বলে। এখানে সবার মতবাদ একস্থানে মিলিত হয়। তবে কেন বিজ্ঞান ধর্মের ভালটাকে বেছে নেয় না, ধর্ম বিজ্ঞানের ভালটাকে বেছে নেয় না? সবাই তো একই নিয়মে শোনে, একই নিয়মে দেখে, তবে কেন মনের এত বিভেদ।

কালো চোখ দিয়ে আমরা আলো দেখি। কালো চোখ দিয়ে কালো আবহাওয়ার অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আমরা দূরের আলোকে দেখি। এই

আবহাওয়ায় যদি অন্ধকার না থেকে ঐ আলোর চেয়ে আরও উজ্জ্বল আলো থাকত, তবে দূরের আলোকে দেখতে পেতাম না। দূরের আলোকে দেখার চোখ কাছের আলো নিজের দিকে টেনে অন্ধ করে দিত। দূরের আলোর কাছেও এই অন্ধচোখ অন্ধকারাচ্ছন্ন। মধ্যের উজ্জ্বল আলো দুয়ের মধ্যের যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়ে নিজের দিকে টেনে নিয়েছে। যেমন করে অনেক সুন্দরীর মধ্যে বিশেষ সুন্দরী সবার দৃষ্টিকে টেনে নেয়।

আমরা কালোর মাধ্যমে দেখি বলেই আলোকে দেখতে পাই, নানা রঙকে দেখতে পাই। কালোর মাধ্যমে আমরা সাদাকে সবচেয়ে ভাল দেখি। এই সাদাকে দেখা গেলেও সাদা কিন্তু মাধ্যম হতে পারে না। সাদা কালো ছাপা পর্দার আড়াল দিয়ে দেখলে কালো ছাপার মধ্য দিয়ে বাইরের বস্তু যতখানি স্পষ্ট দেখা যায়, সাদার মধ্য দিয়ে চাইলে ততখানি স্পষ্ট দেখা যায় না। এখানেও কালো রঙ মাধ্যম, সাদা রঙ দর্শনীয়। কালো ছাড়া অন্যান্য রঙও দর্শনীয়, তবে সাদার মত নয়।

আবার এক পোঁচ কালোরঙ সব রঙকে ঢাকতে পারে, কিন্তু অন্য কোন রঙ তেমন ভাবে কালোকে ঢাকতে পারে না। কালোর গুরুত্ব অতি গভীর। ছবি আঁকতে গভীরতা বোঝাতে পাশে নানা রঙের কাজ করতে করতে গভীর প্রদেশ আঁকতে হয় কালো রঙ দিয়ে। অন্ধকার আঁকতেও কালোরঙের কাজ করতে হয়। গভীরতা আঁকতে গাঢ়তা অনুযায়ী কালোর দিকে যেতে হয়। গভীরতায় উজ্জ্বল সাদা রঙ চলে না। সাদা রঙ চলে উচ্চতা বোঝাতে, কালো রঙ চলে গভীরতা বোঝাতে। এই কালো ও সাদার মধ্যে সব রঙের সৃষ্টি।

গভীর জগতের মানুষ তাই একক ক্ষেত্রতত্ত্বের গভীর কেন্দ্রে যেতে পারে, রঙের দেশের মানুষ তা পারে না। কালোর গভীরতায় সেণ্টারকে পাওয়া যাবে। গভীরের কালো রঙ এবং অন্ধকার যেমন নিশ্চল তেমনি উর্ধ্বের সাদাসহ অন্যান্য রঙ চঞ্চল। কালো সব রঙের জনক জননী। সেণ্টারে তারা এক হয়ে থাকে। তাই কেউ বলে তাকে মহাপুরুষ, আবার কেউ বলে তাকে পরমা প্রকৃতি। দুয়ের অর্ধ সত্য মিলে সেণ্টার এক। এই এক কেন্দ্র থেকে আকর্ষণ বিকর্ষণের দুই রূপ পুরুষ ও প্রকৃতি। তাদের থেকেই অসংখ্য রূপ পেয়েছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। তাদের পরম সেণ্টার পরমাত্মা, আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বহুর সেণ্টার হল জীবাত্মা, ভাবাত্মা, বস্তুর আত্মা। সবই মূল পরমাত্মার থেকে পাওয়া, একক ক্ষেত্র তত্ত্বের সেণ্টার থেকে পাওয়া। এরা ছোট হলেও এদের ব্যক্তিত্ব

সেই পরমাত্মা থেকে পাওয়া। পরমাত্মা যেমন নিজের মত কাজ করে, এরাও তেমনি নিজের মত কাজ করে, তাতে পরমাত্মার বিরোধী হওয়া উচিত নয়। তার জন্য চাই শিক্ষা।

ধাতু থেকে আলোর আঘাতে ইলেকট্রন ছুটে গেলেও সে আবহাওয়া অনুযায়ী নিজের গতিতে চলে। আলো ও ইলেকট্রনের গোড়ায় একই গতি কাজ করছে, তবে তাদের গতি ক্ষমতা অনুযায়ী আলাদা। এই গতির জন্য পরমাত্মার বিরোধিতা হয় না, তবু বহু বৈচিত্র্যের জন্ম হয়। পরমাত্মা তো বলেছিলেন, আমি বহু হব। বহু হতে গিয়ে বিকর্ষণে বহু পূর্ণতার ফল ত্যাগ করতে হচ্ছে। এই ত্যাগ থেকে শক্তির বিকর্ষণ, আলোর বিকর্ষণ।

বহু হওয়ার জন্য সে সেণ্টার-ভাণ্ডদের ছোট হতে হয়েছে, যাতে পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ে নূতন নূতন সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ভাণ্ডদের দান করতে পারে। দান করলে আবার পুরণ হতে হয়। নিজেকে পুরণ করতে আকর্ষণে আবার তাদের পরিত্যক্তকে টেনে নিতে হয়। কেন্দ্র কি তবে অন্যের বস্তু নিয়ে ভিখারী হয়েছে? তাও না। সবই তো তারই গুণ। তাকে ভিত্তি করেই তো আকর্ষণ বিকর্ষণ চলছে। ধার ও শোধ দেওয়ার সেই মালিক। এই কাজ চালানোর জন্য পদার্থের রসায়ন ও রসায়নের পদার্থ সৃষ্টি করা হচ্ছে বিক্রিয়া দিয়ে। বিক্রিয়ায় ভাণ্ড পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছে, আবার তাই অন্যত্র গিয়ে অন্য বস্তু সৃষ্টি করছে।

গভীরতা ঠাণ্ডা এবং কালো। সে সেণ্টারে বাঁধা বলেই তীব্রতায় বিদ্ধ হয়েও অনড়। একটা আপেলকে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে ভোতা অস্ত্রে শক্তি প্রয়োগ করেও বিদ্ধ করা যাবে না। বার বার শক্তিতে সে চঞ্চল হয়ে দুলতে থাকবে। শক্তিতে সে ভাঙলেও বিদ্ধ হয় না। শক্তির সঙ্গে চাই তীরের তীক্ষ্ণতা। ধনুকে সেই তীর যুক্ত করে শক্তি প্রয়োগ করলে অতি সহজে বিদ্ধ হয়ে যাবে। তাতে কিন্তু পূর্বের মত আপেলটি চঞ্চল হয় না। অল্প চাঞ্চল্যেই কাজটা হয়ে গেল। তীরটি আরও শক্ত ও তীক্ষ্ণ হলে আপেলটি আরও কম চঞ্চল হত। তা পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র ভাবপারের কণার মত তীক্ষ্ণ হলে আপেলটি মোটেই চঞ্চল হত না। সে বুঝতেও পারত না যে, সে বিদ্ধ হয়েছে। এই বিদ্ধ হওয়ার তীব্রতা আবহাওয়া হজম করে নেয় বলেই আপেল স্থির। সেই স্থিরতাই কেন্দ্রের থাকে। এখান থেকে অঙ্ক কষলে অঙ্ক নির্ভুল হতে বাধ্য। আন্দাজে একটা কেন্দ্র ধরে, সেখান থেকে হিসাব কষলে ভুল হতে

বাধ্য। কারণ সে কেন্দ্রের তো স্থিরতা নাই। আইনস্টাইনের চতুর্থ মাত্রাও সেখানে নির্ভুল হতে পারে না।

শক্তির সঙ্গে তীক্ষ্ণতা যোগ থাকে বলেই, ব্লেডে হাত কাটা মাত্র যন্ত্রণা বোঝা যায় না। সেই তীক্ষ্ণতা যদি হাজার গুণ বেশি হয়, তা মৃত্যুর কারণ হয় না বরং জীবনের কারণ হয়। সে তীক্ষ্ণতার আর শক্তি দিতে হয় না, প্রকৃতির শক্তি তাকে চালায়। যেমন হাইড্রোজেন বেলুন আকাশে ভেসে ওঠে, জলের নীচে ফুটবল ডুবিয়ে ছেড়ে দিলে ভেসে ওঠে, নিউট্রিনো যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে ইত্যাদি। আবার আমরা বাইরের সঙ্গে আকর্ষণ বিকর্ষণের তীক্ষ্ণ খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি বলেই বেঁচে থাকার চেতনা পাই। এই তীক্ষ্ণতায় আমরা ব্যথা না পেয়ে আনন্দ পাই। এই শক্তির উৎস যেমন সেই কেন্দ্র, আপেলে তীর ছোড়ার তীরন্দাজের শক্তিরও উৎস সেই কেন্দ্র। তীরন্দাজ যদি বলে এ শক্তি তার নিজের, সে কথা মানতে হবে কারণ তার নিজের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব আছে। এই ব্যক্তিত্বের মূলে যে পরম ব্যক্তিত্ব কাজ করছে, তাকে আমরা দেখতে না পেলেও বুঝতে পারি। সেই অদৃশ্যই অদৃষ্ট। এই অদৃষ্টের লিখনকে বিজ্ঞান অস্বীকার করতে পারে না।

যা বিজ্ঞানীদের অদৃষ্ট তাকে ধরার জন্য তো বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। তাঁদের ধর্মগুরুরা অস্বীকার করতে পারেন না। সবাই অনিশ্চয়তার পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই ভবিষ্যৎকে বিজ্ঞানীরা দেখতে না পেলেও অ্যানার্জি বা শক্তি বলে মানছেন, ধর্মগুরুরাও তাকে দেখতে না পেয়ে মহাশক্তিরূপী কালী বলে মানছেন। তাকে সবাই শক্তি বলছেন।

যে অসীম শক্তির খোঁজে ভবিষ্যতে এগিয়ে চলেছি গবেষণাগারে ও মন্দিরে সাধনা করে করে, সেই শক্তি কিন্তু আমাদের শরীরের মধ্যে সর্বক্ষণ কাজ করে চলেছে। অর্থাৎ সেই শক্তিকে ধরার সুযোগ দিতে সেই শক্তি নিজেই কাজ করে চলেছে। সেই শক্তি তো আবার অতীত থেকেই এসেছে। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ আমাদের মধ্যে সর্বসময় বিরাজ করছে। একটা লোকের অতীত বর্তমান বিচার করে তার লক্ষ্য কি বিচার করলে তার ভবিষ্যৎও জানা সম্ভব। তবে পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা সম্ভব নয়।

মস্তিষ্কের নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে। যদি তার অদৃষ্টে একজন সহায় হয়ে এসে দৃষ্ট হয় তাও কিন্তু নিজের মস্তিষ্কের তাড়নায় চেষ্টার ফলে। জ্যোতিষীরা বিজ্ঞানের সাহায্য নেয় না বলেই বিজ্ঞানীদের কাছে হেয় হয়ে আছে। চেষ্টার

ফলে সহায় আসতেও পারে, না আসতেও পারে, এইটাই অদৃষ্ট। কোন্ পরমাণুর কি গুণ, তা পারিপার্শ্বিকের আকর্ষণ বিকর্ষণে শরীরে প্রকাশ পায়। শরীরে তার সেইমত পথ বা দাগ থাকে। শরীরে তাদের পরিবর্তন দেখা যাবেই। মানুষের পূর্বপুরুষ জীবরা সঙ্করত্বের পরিবর্তন পেলেও উন্নতির জন্য ইন্দ্রিয়দের পরিচালনায় যেভাবে শরীর চালনা করেছে, খাদ্য খেয়েছে বংশানুক্রমে সেইভাবে শরীরের পরিবর্তন হয়েছে। শরীরের রেখা সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে মানব জাতির ভবিষ্যৎ। মানুষের সেই পূর্বপুরুষরা কিভাবে কাজ করত তা শরীরের রেখা বিচার করে বলতে পারা যায়। এই মানব জাতির ভবিষ্যতে চলতে আরও কি কি কাজে কোন কোন অঙ্গ চালনা হচ্ছে, তাও সুদূর ভবিষ্যতেও বলতে পারা যাবে রেখা দেখে।

ব্যক্তির জন্মের সময় কোন কোন নক্ষত্রের প্রভাব নিশ্চয় পড়ে। আমরা তো নক্ষত্রের নীচে বাস করছি। শুধু আমরা কেন সূর্য গ্রহ উপগ্রহদের মধ্যে প্রভাব চালাচালির প্রভাব কীটাণুদের মধ্যেও পড়ছে। সেই প্রভাবে শরীরের মধ্যে আলোড়ন চলছে। মস্তিস্কে আলোড়ন চলছে। কেন্দ্রভিত্তিক পাকস্থলির খাদ্যরসে পুষ্ট হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক ইত্যাদি কর্তব্য পালন্ করছে। সেই মস্তিষ্কের চালনায় মানুষ ভবিষ্যৎ গড়ছে। দেখতে জানলে সে রেখা হাতে পায়ে কপালেও দেখতে পাওয়া যায়। অবিজ্ঞানী জ্যোতিষীরা তা দেখতে জানে না। জ্যোতির্বিজ্ঞানও তা জানতে চেষ্টা করে না। অথচ তারা স্বীকার করছে সবার প্রভাব সবার মধ্যে পড়ে।

জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখিয়ে পাথর নিলেও কাজ হয় না। তাতে স্টারের প্রভাব পড়লেও, সে ভবিষ্যৎ পাল্টিয়ে দিতে পারে না। হয়তো ব্রেনে কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারে, ইলেকট্রনিক ব্রেনের কায়দায়। আসলে ব্রেনের আজ্ঞায় কাজ না করে, পাথর নিয়ে বসে থাকলে শুধু হতাশাতেই ভুগতে হবে। জ্যোতিষীরাও বিবেক অনুযায়ী কাজের কথা বলে না। তাদের বক্তব্য, পাথর নিলেই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তারা ঈশ্বর না হয়ে কি করে জানল যে অমুক গ্রহের প্রভাব অমুক পাথরে পড়ে, অমুক পাথরে পড়ে না? আসলে প্রভাব প্রতিফলিত হয় ব্রেনে।

স্বল্পতার প্রভাব অনেক। আমরা পৃথিবীর আবহাওয়ায় শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারি, মহাকাশে পারি না কেন? অথচ ঐ দুই স্থানে শক্ত হয়ে দাঁড়ানোর কোন খুঁটি নাই। সবই শূন্যব সূক্ষ্ম ধারার জন্য। শুধু বাইরে নয়, আমাদের শরীরের

মধ্যে থেকেও সে কাজ করে চলেছে। ধরা যাক লসিকা রসের কথা। এই রস থাকে গ্রাণ্ডে। এই লসিকা বা লিম্প সূক্ষ্মতার জন্য চামড়া ও চামড়ার নিচের সব স্থানেই বইছে রক্ত সংবহনতন্ত্রের পাশাপাশি। এই লসিকা বা লিম্পেরও লসিকাতন্ত্র আছে। তা দেখতে সেলাই করা লেসের মত। এই লসিকা রস সেই স্বচ্ছ নালীপথে শরীরের স্থানে স্থানে গ্রাণ্ড তৈরি করেছে। রক্তের চেয়ে এই রস সূক্ষ্ম বলে তার রঙ পাঁশুটে হলদে। এই ভাবে সূক্ষ্মতা অনুযায়ী রঙ সাজানো দেখা যায় সূর্য কেন্দ্রিক রামধনুতে। সবই কেন্দ্র ভিত্তিক হওয়ার ফলে এক অন্যের সূক্ষ্মরূপ। এই সূক্ষ্মরূপ আবার অন্যের স্থূলরূপ।

রামধনুর রঙগুলো বাইরে প্রভাব ফেলছে, সূর্যের শক্তি গ্রহণ করে। শরীরের কোথাও কেটে গেলে রক্ত পড়ে। লসিকা রসের সঙ্গে থাকে বিশেষ ধরণের কোষ। সেই কোষ রক্তের সাদা কণিকাকে সাহায্য করে, যাতে ঐ ক্ষতে কোন বীজাণু এলে মেরে ফেলতে পারে। এই বীজাণু যাতে শরীরের ভেতর প্রবেশ করতে না পারে, লসিকা চালায় তার জন্যও আপোসহীন সংগ্রাম। তাদের মেরে ফেলার জন্য গ্রাণ্ড দুর্গেও চলে অবিরাম যুদ্ধ। এই সরষের দানার মত ছোট দুর্গে তৈরি করে তারা এক ধরণের শ্বেত-কণিকা, যার নাম লিম্পোসাইট। এরা যুদ্ধে বড় ভূমিকা নেয়।

বগলে গলায় কুঁচকিতে ও অন্ত্রের গ্রাণ্ডে থেকে লসিকা সমস্ত শত্রুকে ছেঁকে ফেলে দেয়। সে রক্ত সংবহন তন্ত্রে জন্ম নিয়ে এসে ছাঁকনির কাজ সেরে আবার সেখানে ফিরে গিয়ে রক্তে মেশে। গ্রহ উপগ্রহদের মধ্যে যেমন যোগাযোগের কাল্পনিক জাল আছে তেমনি শরীরের সর্বক্ষেত্রে আছে লসিকার জাল। সেই জাল সারা শরীরের প্রোটিনদের বেঁধে রেখেছে।

লসিকা গ্রন্থির লসিকা নালীগুলো প্রোটিনগুলোকে আকর্ষণে শুষে নিয়ে রক্ত সংবহন তন্ত্রের রক্তের মত তারাও চলতে থাকে শরীরের কেন্দ্র পাকস্থলীর দিকে। পেটের অন্ত্রের হজম রসকে তারা বদলে দেয় আর সেখানে যে দুধের মত সাদা স্নেহ জাতীয় নির্যাস সৃষ্টি হয় তাও শুষে নিয়ে মিশবে রক্তস্রোতে। লসিকা এই নির্যাস ও প্রোটিন নিয়ে লসিকা নালীর দেওয়ালের পায়ের ভাল্বের ঠেলায় একমুখে চলতে চলতে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায়। সবই চলে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার প্রসারণ ও সংকোচনের ফলে। এই ভাবে লসিকা চালাতে চালাতে লসিকা নালীগুলো একটার সঙ্গে একটা মিশে মহাধমনীর গায়ে জড়ায়। সেখান থেকে মহাধমনীর সংকোচনে প্রসারণে এগিয়ে যায় হৃদপিণ্ডের উপরের বড় শিরায়। এইভাবে তারা

হজম করা ভাল জিনিসগুলো রক্তে মেশায় শরীর গড়ার জন্য। আসলে পাঁশুটে হলদে রস লসিকা হল শরীরের ছাঁকনি। কোন রকমে যদি এক ধরণের সরু সুতার মত কৃমি লসিকা নালীর পথ বন্ধ করে দেয়, তখন লসিকা মাংস পেশীতে ঢুকে মোটা করে ফেলে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই ক্ষার জাতীয় পাঁশুটে হলদে লসিকা কী সুন্দর ভাবে শরীরে সমতা রক্ষা করে চলেছে।

গ্রহ উপগ্রহদের ভেতরের ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে শরীরের ভেতরের ক্রিয়া কাণ্ডের কত মিল। এখানে রসায়ন বিদ্যার গভীরে গেলে পদার্থ বিদ্যায় যাওয়া যায়, পদার্থ বিদ্যার গভীরে গেলে রসায়ন বিদ্যার গভীরে যাওয়া যায়। আধ্যাত্মের পরমাত্মা ও বিজ্ঞানের পরম কেন্দ্র একই চরিত্রের। তাই বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও ভেবেছিলেন একক ক্ষেত্রতত্ত্বের কথা। তাই বুঝি নিউইয়র্কের রীভার সাইড গীর্জায় ধর্মীয় স্বীকৃতির জন্য তার প্রতিমূর্তি স্থান পেয়েছিল। সেখানে বিজ্ঞানকে কত সম্মান জানাল ধর্ম। শুধু আইনস্টাইন নন, সেখানে চোদ্দজন সুবিখ্যাত বিজ্ঞানীকে স্থান দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে বিজ্ঞানীদের গবেষণা-গারে কি স্থান হবে পরমাত্মা বিশ্বাসী ধর্মগুরুদের? সেখানে কি গবেষণা হবে পরমাত্মার স্বরূপ নিয়ে?

ধর্মের কুসংস্কার সাম্প্রদায়িকতা টেনে আনছে। তা রোধের চেষ্টা না করায় কুসংস্কার জেঁকে বসছে। তার প্রভাব দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র। এই পাপ দূর করতে কেউই এগিয়ে আসছে না। সবাই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। বহু জ্ঞানী গুণী পৃথিবীতে জন্মেছেন। তাঁদের গুণের অপব্যাখ্যা হবে বলে তাঁরা সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে মাথা ঘামাতে সাহস পান না। আবার দায়সারা গোছের মুখে মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে কাজ সেরে যাচ্ছেন যাতে অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিদেরও শ্রদ্ধা সংগ্রহ করা যায়। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোক যে এই সাম্প্রদায়িক ব্যাধিতে ভুগছে, সেদিকে তাঁরা নজর না দিয়ে গুটিকয়েক লোকের উপকার করে খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান করে নিয়েছেন। তাঁদের পাপের ফল উত্তরসূরী হিসাবে বিশ্বনাগরিক আইনস্টাইনকেও ভুগতে হয়েছিল।

এই সাম্প্রদায়িকতার বশে হিটলারও লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে মেরে ছিলেন। এমনকি আইনস্টাইনের উপরও কড়া নজর রাখা হয়েছিল। তিনি যখন ইউরোপ ভ্রমণে গেলেন, সেখানেও তাঁকে সন্দেহ করা হয়েছে, যখন

আমেরিকায় গেলেন তখনও তাঁকে সন্দেহ করা হয়েছে। অবশ্য শেষ মেশ তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব পেলেন। এই বিপদে পড়ে তিনি বুঝলেন যে, আসলে তিনি একজন বিজ্ঞানী নন, জার্মান নন, ইহুদী মাত্র। এত বাঁধা বিপত্তির জন্য তিনি আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বেশিদূর এগুতে পারেন নি। এত সাম্প্রদায়িকতা থাকতে বিজ্ঞান কেন সবাইকে এক বাঁধতে সচেষ্ট হচ্ছে না?

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বিশ্বের সাম্প্রদায়িকতার কাছে হার মেনে ছিলেন। সাম্প্রদায়িক হিটলারকে জব্দ করতে গিয়ে তিনি পরমাণু বোমা-উৎপাদনে উৎসাহ দিয়েছিলেন। আবার সেই পরমাণু বোমার ভয়াবহ রূপ দেখে তা প্রতিরোধের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগলেন। এই দুমুখো চরিত্রের জন্য দায়ী শুধু আইনস্টাইন নন। সমস্ত বিজ্ঞানী, সমস্ত ধার্মিক, সমস্ত রাজনীতিজ্ঞ। আসলে মূলে কারো বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী নাই।

অগ্নিশিখাকে ফুঁ দিয়ে বাড়িয়ে তোলা যায়। ইচ্ছামত তাকে এদিক ওদিক করা যায়। আবার হাওয়া চালিয়ে নিভিয়েও দেওয়া যায়। এখানে অগ্নিশিখাকে কাজে লাগাতে হাওয়ার মাত্রাজ্ঞান থাকা চাই। এই মাত্রাজ্ঞানে অগ্নির দ্বারা স্থায়ী কাজ হয়। কিন্তু তাকে ফুঁ দিয়ে বরাবরের জন্য বেঁকিয়ে রাখা যায় না। ফুঁ শেষ হলেই আবার শিখা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। এই শিখাকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া গেলেও, বেঁকিয়ে রাখা যায় না। তেমনি মানুষকে মেরে ফেলা গেলেও আদর্শের কথায় সৎ করা যায় না। পৃথিবীতে কৃষ্ণের জন্ম হল, বুদ্ধের জন্ম হল, যীশুর জন্ম হল, মোহম্মদের জন্ম হল, চৈতন্যের জন্ম হল, কিন্তু মানুষের মধ্যে স্থায়ী সততার জন্ম হল না। কয়েকজন লোক সৎ হয়ে সবাইকে সৎ করতে পারে না।

তাঁদের উত্তরসূরী গুরুরা সততা দান করবেন বলে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে মন্দির গীর্জা মসজিদ গড়ে গেছেন। তাতে বিনা উৎপাদনে শুধু মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে মানুষ মারার দুর্ভিক্ষ আনতে। নানা সম্প্রদায় বেড়েছে মানুষে মানুষে বিভেদ আনতে। তবু মানুষ সৎ হতে পারল না। উত্তরসূরী গুরুরা মনুষ্যত্ব দানের নামে পয়সা পাচ্ছেন, কিন্তু মনুষ্যত্ব দান করতে পারছেন না। আসলে তাঁরা মনুষ্যত্ব বিক্রি করতে চান, তাই তার বিনিময়ে দামের প্রশ্ন ওঠে। দাম নিয়েও তাঁরা মনুষ্যত্ব বিক্রি করতে পারছেন না। তাই এদাম দামও নয়, ফাঁকী দেওয়া পয়সা। এই পয়সায় আগুনের শিখার মত

চরিত্রকে চিরদিনের মত নিভিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু চিরদিনের মত বেঁকিয়ে দেওয়া যায় না। তাই পৃথিবীতে মহাপুরুষের সংখ্যা বাড়লেও মানুষের মনুষ্যত্ব বাড়ে নি।

ফুলের কাজ গন্ধ বিস্তার করা। সেই গন্ধ দিয়ে ফুলকে পাল্টিয়ে দেওয়া যায় না। আদর্শ মানুষের তেমনি একটা গুণ। তার সৌরভে মানুষ মোহিত হতে পারে, কিন্তু মানুষকে পাল্টিয়ে দিতে পারে না। তাই সুসভ্য মানুষ আজও সৎ হতে পারল না। বস্তুর যেমন এক এক পরিবেশে আকর্ষণে বিকর্ষণে গুণ পাল্টায়, মানুষের চরিত্র তেমনি নানা পরিবেশে পরিবর্তিত হয়। একটা মানুষ যখন কোন মহাপুরুষের জীবনী ও বাণী শোনে তখন সে নিজের যথাসর্বস্ব দান করে দিতে পারে। পরের মুহূর্তে তার কর্মক্ষেত্রে যখন ঘুস খাওয়ার সুযোগ আসে, তখন সে ঘুস খেতে ছাড়ে না। একটা সাধারণ মানুষ মদ খেলে তার পরোপকারের কথা মনে হয়, আবার আদর্শের নেশাতেও পরোপকারের কথা মনে হয়। তা হলে মদ ও আদর্শ দুটোই নেশা। দুই নেশা থেকে সে যখন স্বাভাবিক অবস্থায় আসবে স্বার্থপর হয়ে উঠবে। ধরে নেব সাধারণ মানুষ আসলে স্বার্থপর। তবে কি ঈশ্বর তাদের স্বার্থপর করে সৃষ্টি করেছেন? তবে ঈশ্বরের মহত্ত্ব কোথায়?

সাধারণ মানুষের স্থায়ী চরিত্র মদ বা আদর্শের ভাবালুতায় নাই। তার স্থায়ী চরিত্র আছে স্বার্থপরতায়। কোন অভিনয়ে যদি শোষক শোষিতের চরিত্র ফোটানো হয়, তবে যার স্বার্থে শোষণ প্রয়োজন সে দেখবে কি ভাবে শোষণ করেও শোষিতের হাত থেকে বাঁচা যায়। যার স্বার্থে বাঁচা প্রয়োজন সে দেখবে কি ভাবে রুজি রোজগার ঠিক রেখে শোষকের হাত থেকে বাঁচা যায়। অবশ্য দুই পক্ষই জানে শোষণ করা অন্যায়। আসলে সমস্ত ন্যায় অন্যায়কে নিয়ন্ত্রণ করে স্বার্থ। তাই অভিনয়ের সুরে আদর্শের বুলি আউড়ে বাহবা পাওয়া গেলেও ধর্ম নেতারা মানুষের চরিত্র পাল্টিয়ে দিতে পারেন না। সেই আদর্শ সমাজের শরীর মার্জনা করে দিতে পারে মাত্র। তাই বর্তমান সভ্যতা মার্জনার চাকচিক্য ছাড়া আত্মিক বিপ্লব আনতে পারে নি।

মানুষ আত্মার স্থানে ঘা খেলে আর অভিনয় থাকে না। অভিনয় দেখে নানা জনে নানা রকম উপলব্ধি নিয়ে আত্মিক ব্যথা নানা জন পেলেও এক রকম হবে। খিদের জ্বালাও সবার কাছে একরকম। দেশে যখন শোষণের কারণে দুর্ভিক্ষ আসে তখন সবাই একাত্ম হয়ে বিপ্লব করে। বিপ্লবে জয়

হলে আবার শোষকরা নেতৃত্বের নামে ক্রমে ক্রমে শৃংখল পরাতে থাকে। এমনি ভাবে পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লব হাতবদল হয়ে গিয়েছে। যদি হাতবদল না হত, সমাজের নিচু স্বার্থ মহৎ স্বার্থ হয়ে উঠত। আইনস্টাইনের মত বৈজ্ঞানিককেও এক মুখে কখনও পরমাণু বোমার স্বপক্ষে কখনও বিপক্ষে বলতে হত না। গোড়ায় গলদ জিয়িয়ে রাখা হয়েছে বলে মানুষকেও মিথ্যা কথা বলতে হয়। তা হলে এই মিথ্যার হাত থেকে জগতকে বাঁচানোর পথ কোথায়?

পথ আছে বিজ্ঞানের কেন্দ্রবাদে, ধর্মের কেন্দ্রবাদে, গণনীতির কেন্দ্রবাদে। প্রত্যেকের একটা করে ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র থাকলে, তাদের মূল পরম কেন্দ্র সবকিছুর উৎস। মূল কেন্দ্রে সব এক ব্রহ্মের মত সঙ্ঘবদ্ধ থাকলেও তার বিচ্ছুরণ নানাদিকে নানা স্বার্থে নানা চরিত্র প্রকাশ করে। মনের বিচ্ছুরণ তাই হাতের কাজে পাই, কাণের শোনার কাজে পাই, নাকের ঘ্রাণের কাজে পাই ইত্যাদি। শরীরের সবকিছু সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আছে মনে। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো বাদ দিলে মনের অস্তিত্ব নাই। মন ঠিক না থাকলে চোখের দেখামত হাত কাজ করতে পারে না। গভীরের স্বার্থে আঘাত না করলে স্থায়ী পরিবর্তন হয় না।

জগতের যতকিছু স্থায়ী পরিবর্তন, গভীরের আত্মার স্বার্থের পরিবর্তনের জন্য সম্ভব হয়েছে। পরমাণুর কেন্দ্রের উত্তেজনায় যেমন শক্তি পাই, শরীরের কেন্দ্রের উত্তেজনায় তেমনি শক্তি পাই। তার জন্য শরীরকে ক্ষয় হতে হয়। শরীর দুর্বল হলে স্টেরয়েড গ্রহণ করে শক্তি নিঙড়িয়ে প্রকাশ করি। ফলে হয়তো লিভারের ক্ষতি, মুখের স্ফীতি এবং অণ্ডকোষের সংকোচন ইত্যাদি রোগ দেখা দিতে পারে। এই ঔষধ পেশীতন্তুকে শুকিয়ে যেতে সাহায্য করে। মেয়েরা যদি এই ওষুধ নেয়, তাদের হরমোন পুরুষালি হয়ে ওঠে, শরীরে অবাঞ্ছিত লোম দেখা দেয়, গলার স্বর ভারী হয়ে ওঠে। মার্কিন দেশের বহু খেলয়াড় শরীরে উত্তেজনা আনবার জন্য এই হরমন গ্রহণ করে। নানা ভাবে দেখানো গেল কোন পরিবর্তন আনতে হলে আগে শরীরের মধ্যে আনতে হবে, বাইরের আদর্শে তা সম্ভব নয়। বাইরের চাপ মালমসলা দিলেও ভেতরের ঠেলা নিজের মত করে প্রকাশ করে। কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে প্রকাশ কম বলেই সব ধরে রাখতে পেরেছে। তরলে পারে কম, গ্যাসীয়তে আরও কম।

গভীরের স্বার্থ মহৎ গুণ। স্বার্থকে নিচু করেছে, বর্তমান রাজনৈতিক অর্থনৈতিক শোষণ। সেখানে গণতান্ত্রিক সাম্যবাদের বিজ্ঞান থাকতে পারে

না। ধরাযাক একজন কারখানার মালিক দশজন শ্রমিককে খাটিয়ে তার উপযুক্ত পয়সা না দিয়ে বেশি লাভ করছে। এই শোষণে শ্রমিক ও মালিককে মিত্রতায় বাঁধা যায় না। কারখানাকে নিজের না ভাবায় শ্রমিক উৎপাদন কমাতে থাকবে। ফলে মালিকের লাভ ঠিক রেখে শ্রমিকের হাতে পয়সা কম আসতে থাকবে। ক্রমে উৎপাদন আরও কমতে থাকায় শ্রমিকের আয়ের সঙ্গে সঙ্গে মালিকেরও আয় কমতে থাকবে। তবুও লাভের জন্য রাজনৈতিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে শ্রমিকদের মোকাবেলার জন্য তাদের নেতাদের অনুগত করতে বা কিনতে মালিকের আরও কিছু টাকা বেরিয়ে যায়। মালিক এখানে যতই লাভ করুক আয় তার কমতেই থাকবে শ্রমিক অসন্তোষের ফলে। এক্ষেত্রে ধার্মিক হয়ে যদি বলা হয়, ঈশ্বর মালিক হয়ে শোষণ করছেন, আবার শ্রমিক হয়ে শোষিত হচ্ছেন, সেখানে আমাদের কি করবার আছে? বিজ্ঞান এই সমস্যা থেকে সরে যেতে পারে না। সে রাজনীতি ছেড়ে অবশ্যই গণনীতি ধরবে।

এমন কারখানা চাই, যেখানে আয়ের অংশ শতকরা হিসাবে মালিক ও শ্রমিককে ভাগ করে দিতে হবে। মালিক তার উপযুক্ত প্রাপ্য পাবে, শ্রমিকও তাদের উপযুক্ত প্রাপ্য পাবে। এই থিওরিতে চলতে পারলে সবাই সেই কারখানার অংশীদার হতে পারবে। পাইকারী দোকানেও সমস্ত ক্রেতা লাভের অংশ পাবে। এইভাবে চললে নিচুস্তরের সবাই সমান দামে মাল কিনতে পারবে। একে বলে ক্রেতা-মালিকানা সমবায়। এই সম্বন্ধে 'দলাদিষ্ট রাজনীতি বনাম ভৌমোথিত গণনীতি' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই চিন্তাধারা মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করতে পারে। ধার্মিক মানুষ তখন কর্মক্ষেত্রে ঘুস খাওয়ার সুযোগ পাবে না আজকের মত। এমনি দুই চরিত্র না থাকায় মানুষ সৎ হবে। মানব সভ্যতার তখন শুধু বাইরের ঔজ্জ্বল্য বাড়বে না, ভেতরের ঔজ্জ্বল্যও বাড়বে। তাই বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রবাদ ছাড়া সব আদর্শ মূল্যহীন। জগতের মহাপুরুষরা সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য কত মহৎ বাণী রেখে গেছেন। আজ তা মানুষকে উন্নত করতে তো পারছেই না। বরং তা শোষণের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে মন্দির, গীর্জা, মসজিদ ইত্যাদি ধর্মস্থানে। কেন্দ্রবাদে কিন্তু সেই শোষকরা পালক হয়ে উঠবে; মহাপুরুষদের বাণী সার্থক করে তুলতে। তখনই একক ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্ভব হবে।

এই একক ক্ষেত্রতত্ত্ব একক কেন্দ্রত্বের উপর নির্ভর করে। এই কেন্দ্রই

সেন্টার শক্তি, ধর্মের আত্মশক্তি, এবং গণনীতির সমস্যা কেন্দ্রিক শক্তি। মানুষ যে মিথ্যা কথা বলে, সে যা চায় তা পায় না বলে। তার আত্মা যা খেয়ে বাঁচতে চায়, তা শোষকেরও প্রয়োজন। শোষকের এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য শোষক শ্রমিকের আত্মাকে বিশ্বাস করে না বলেই তাদের মধ্যে এত শঠতা, মিথ্যাচার। এই আত্মা বড় বড় মহাপুরুষের বাণীতে ভোলে না। বড় বড় ধর্মগুরুরা যতই মানুষ তৈরি করার স্তোক বাক্য দিয়ে বাহ্বা পেয়ে অমর হয়ে থাকুন না কেন, সে কথা জীবাত্মার অবমাননার আগুনে আজ পুড়ে গিয়েছে। যাদের আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান নাই তারাই বলে আদর্শের দ্বারা মানুষ বড় হয়। স্বার্থ মূলত সৎ। স্বার্থপরতাও সৎ। স্বার্থপরতার ভেতর পাপ ঢুকে গিয়েছে আত্মস্বার্থকে ছেড়ে বড় বড় বাণীর পথ ধরে এগিয়ে চলার পরামর্শে। তাই একটা পথ সৃষ্টি হয়েছে নীচ স্বার্থ। এই পাপের বেশির ভাগ দায়ভার শোষক সৃষ্ট অর্থনৈতিক সমস্যায়। সেখানে আত্মজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের আদর্শের বাণী আন্তরিক ভাবে বললেও ফুৎকারে উড়ে যায়।

পরমাণুর তেজ প্রকাশ পায় আঘাতে। মানুষের জীবনের প্রকাশও সমস্যার আঘাতে। সমস্যা না থাকলে আমরা একপাও চলতে পারি না। মানব সমাজ সমস্যায় চলতে চলতে সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। একটি মানুষের যেমন একটা আত্মিক চোখ আছে, প্রত্যেকের সমস্যার যোগে মানব সমাজেরও একটি পরমাত্মিক চোখ আছে। সেই সবার চোখকে দেখার অধিকার না দিয়ে একটা সরকার বা একটা মালিক একচেটিয়া অধিকার পেলে প্রত্যেকের চোখের গুরুত্ব থাকে না। সেখানে শোষণ অথবা চুরি হতে বাধ্য। সেই চোখই যদি না থাকে আদর্শের বুলি দিয়ে মানুষ তৈরি করা যায় না। যদি সব কারখানার মালিক কর্মচারীদের লভ্যাংশের মালিক করে, মালিকানার চোখ অর্থাৎ তাদের আত্মিক চোখ উৎপাদন বাড়াবে। চুরি কমাবে। মালিক সহ সবাই লাভবান হবে। এমনি প্রতিটি সরকারে, প্রতিটি কারখানায় প্রত্যেকের স্বার্থের চোখ থাকলে ঘুস ও চুরি থাকতে পারে না। তখন প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বার্থের চোখ কাজ করবে। মালিকের ভেতরও তখন শোষণের ইচ্ছা থাকবে না। সে তখন স্বার্থ রক্ষা করবে কর্মচারীদের স্বার্থ কাজে লাগিয়ে। এই সুদৃঢ় ভিত্তির পরে দাঁড়াতে পারলে মহাপুরুষদের সব আদর্শ কাজে লাগবে। সব স্বার্থ তখন আত্মিক মহৎ স্বার্থ হবে। আসলে নীচ স্বার্থ প্রকৃতির সৃষ্টি নয়। স্বার্থে ময়লা মিশিয়ে তাকে নীচ করা হয়েছে। যে স্বভাব অপরাধী সেও তখন সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে চুরি করতে পারবে না। চুরি করে

বাড়ি করলেও পাড়ার লোক তাকে ধরে ফেলতে পারবে। নিজেদের চোখ থাকতে পুলিশের চোখের উপর নির্ভর করলে চুরি কমবে না। জনগণকে কাজ বুঝে নিতে হবে। তখন জনগণও আইন হাতে তুলে নেবে না তাদের দেখার চোখের অধিকার পেয়ে। আত্মকেন্দ্রের অধিকার পেয়ে। এই অধিকার না দিয়ে সরকার যদি বলে, আইন হাতে তুলে নিওনা, সরকারকে সাহায্য কর, সে কথার কোন দাম থাকে না। কারণ ক্ষুধা আদর্শ মানে না। সবাই তো আর মহাপুরুষ নয়, যে খেতে না পেলে ভগবানের বিচার বলেই মেনে নেবে।

দুধের কড়াইতে মৃদু জ্বাল দিয়ে উপরে পাখার হাওয়া দিয়ে রাবড়ি করা হয়। তেমনি সমাজ নামক কড়াইতে শোষণ রূপ আগুনের জ্বাল দিয়ে মহাপুরুষদের বাণীরূপ হাওয়া দিলে ধনীর উপভোগ্য রাবড়ি সৃষ্টি হতে পারে। তাতে প্রকৃত শোষণ মুক্ত আদর্শ মানুষ সৃষ্টি হতে পারে না! এই মানুষ রাবড়ি-খচ্চররা চায় না বলে তলায় আগুনের জ্বাল দিয়ে রেখেছে। সেখানে তারা কোন মহাপুরুষের দাম দেয় না, শোষণের ক্ষেত্রে ছাড়া। দুই স্বার্থ থাকলেই একে অপরের শত্রু হয়ে ওঠে। সেখানে আনন্দ থেকে সৃষ্ট কোন মানুষের আনন্দ থাকে না একটা ভারী সুস্থ মানুষ নিজের শরীরকে ভার মনে করে না। তার শরীর মানেই স্থায়ী শক্তি। দুর্বল মানুষের শরীর কৃশ হলেও ভারী মনে হয়, কারণ তার শরীর বস্তুতে স্থায়ী আনন্দের শক্তি নাই।

সাধারণ মানুষ শোষণে রোগগ্রস্ত হওয়ায় শোষণ রুখবার ক্ষমতা হারিয়েছে। তারা শুধু মহাপুরুষের বাণী কানে শুনে প্রচারকদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে শিষ্যত্ব বরণ করে নিয়ে বন্দিত্ব স্বীকার করে। মহাপুরুষের বাণীকে ছোট করছি না। মুক্তির বাণীগুলো শোষকের বইতে থাকলে জরাগ্রস্থ বন্দী মানুষের কি কাজে লাগতে পারে? তাই বড় বড় মন্দির, মসজিদ, গীর্জা ইত্যাদির আদর্শের বাণীর দ্বারা শোষণ চললেও মানুষ গড়া যাচ্ছে না। ঐসব প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টারা মানুষ গড়তে চেয়েছিলেন। তাই তাঁদের শ্রদ্ধা না করে পারি না। সেই শ্রদ্ধা এখন শোষকের উপকারে আসছে।

অন্ন দান, বস্ত্র দানের চেয়ে আদর্শ দান সব চেয়ে বড় দান। শোষকরা আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ দান দিচ্ছে, কিন্তু তার আগে দান গ্রহণ করার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। চোখ কেড়ে নিয়েছে, যাতে তাদের উপর নির্ভর করে থাকতে পারি। চুরি করলে কিন্তু তাদের চোখ দেখতে পাবে। যদি আমরা ক্ষেপে উঠি, তখন বলা হয় আইন হাতে তুলে নেবেন না। স্বীকার করি সে

আজ্ঞাও পালন করা উচিত। সবার মঙ্গলের আইন একজনের হাত দিয়ে আসা উচিত। কিন্তু আমরা চক্ষুহীন হয়েছি বলে সে আইনে আমরা শোষিত হতে বাধ্য। এই ষড়যন্ত্র ধরতে না পারলে বড় বড় মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করলেও মানুষ সৃষ্টি হবে না। মালিকের মত শ্রমিকেরও আগে চোখ খুলে দিতে হবে। সূর্যের যেমন স্বকীয়তা আছে, সূর্যকে নির্ভর করে যে গ্রহরা ঘুরছে, তাদের সূর্য স্বকীয়তা দিয়েছে, স্বাধীনতা দিয়েছে। সেখানে সূর্য হাত দেয় না। তাই গ্রহরা নিজেদের ক্ষমতা মত সেই স্বাধীনতার বাণী মেনে চলেছে। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সবাই নিজের নিজের কৈন্দ্রিক নিয়ম মেনে চলেছে। মানুষ সেই নিয়ম মেনে চলতে পারছে না বলে প্রকৃত মানুষ হতে পারছে না।

সবার আত্মকেন্দ্রের আকর্ষণে স্বার্থ আছে বলে সবাই স্বার্থপর। সবার আত্মকেন্দ্রের বিকর্ষণ আছে বলে সবাই ত্যাগী। যেমন আমরা নিশ্বাস গ্রহণ করে স্বার্থপর, প্রশ্বাস ত্যাগ করে ত্যাগী। এই দুই না হলে যেমন জীবন বাঁচে না, এই দুই না হলে তেমনি সমাজ বাঁচে না। মালিক নিশ্বাসে শোষণ করছে, প্রশ্বাসে শ্রমিকদের দিচ্ছে। শ্রমিকও নিশ্বাসে টাকা নিচ্ছে, প্রশ্বাসে শ্রম দিচ্ছে। দোকানের ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যেও এই সম্পর্ক বিদ্যমান বলেই সমাজ বেঁচে থাকে। যে লোক বেশী খেয়ে সেই আন্দাজে মলত্যাগ করে না সে রোগী। এই রোগীর সংখ্যা মালিক সমাজে বেশি দেখা যায় বলে, শ্রমিক সমাজেও দেখা দিয়েছে। নিশ্বাসে প্রশ্বাসে যেমন জীবজগৎ রক্ষা হয়, মালিক শ্রমিকে তেমনি শ্রম জগৎ রক্ষা হয়। সেখানে মালিকও আলাদা নয়, শ্রমিকও আলাদা নয়।

আজ মালিকজগৎ বেশি খেয়ে সেই মত মানুষকে দিচ্ছে না বলেই তারা রুগী হয়েছে। তাদের চালিত সমাজে মানুষ এমন বিকল হয়ে পড়েছে যে, কৃষ্ণ, যীশু, মোহম্মদ, আইনস্টাইনরা সে রোগ সারাতে পারছেন না। মৃত্যুর মুহূর্তে ডাক্তার কোন কাজে লাগবে? ডাক্তার সেখানে হার স্বীকার করতে বাধ্য। তেমনিভাবে আজ ধর্মগুরুদের মঠ মন্দির গীর্জা মসজিদ অকেজো হয়ে পড়েছে। তাদের শিষ্যরাও তাই ঘুস খেয়ে পাপ করে। পরে ধর্মস্থানে গিয়ে ভাবে সব পাপ বুঝি চলে গেল। যেমন মৃত্যুপথযাত্রী রুগী ভাবে ডাক্তার আসায় বুঝি সব রোগ চলে গেল। মৃত্যু সে স্তোক বাক্যে কর্ণপাত করে না। যারা এই পাপ সমাজের শোষণের জন্য গ্রহণ করেছে, তারা যদি সেই পাপ খালনের জন্য গঙ্গায় স্নান করতে যায়, পাপ তখন গাছে উঠে বসে থাকে। তারা যখন স্নান সেরে ডাঙায় ওঠে, তখন আবার সেই পাপ ঘাড়ে এসে বসে। এর হাত থেকে

বাঁচতে হলে প্রথম থেকে সমাজকে তৈরি করে সেই সমাজে চলতে হবে। মৃত্যু-কালে ঈশ্বরকে ডাকার কথা মনে থাকে না, যদি না প্রথম জীবন থেকে অভ্যাস করা যায়। পাপ যে আমাদের শয্যাগুরু। আজ সে সব থেকে বড় গুরু। ধর্মীয় গুরুর উপদেশ একান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। শয্যা গুরুর উপদেশ বেরিয়ে যাওয়ার উপায় নাই। সমাজের শয্যায় অন্য কান যে মাথার বালিশে ঢাকা থাকে। এমনিভাবে স্বামী স্ত্রীও উভয় উভয়ের শয্যা গুরু সংসারের ক্ষেত্রে।

আট

মহাযুদ্ধের সময় আইনস্টাইনকে চাপে ফেলে তাঁকে নিয়ে রাজনীতি চলতে লাগল। তখন তিনি বিশ্বনাগরিক নন, একজন ইহুদী মাত্র। এই ইহুদীদের বিশ্বঘাতকতায় যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিলেন। এই সব নিয়ে ধর্ম ও রাজনীতি তাঁকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মানসিক জরাজীর্ণ করে তুলেছিল। পূর্বে তিনি গান্ধীজীর (মার খেয়ে মার না দেওয়া) অহিংস রাজনীতিকে বিশ্বাস করতেন, পরে বিপদে পড়ে সে নীতিতে তিনি বিশ্বাস রাখতে পারলেন না। জার্মানির হিটলার যেখানে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে যাচ্ছেন, সেখানে আমেরিকাকেও সেই পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে হবে। এখানে হিংসার সামনে অহিংসা চলে না। তা দুর্বলতারই নামান্তর।

এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯৩৯ সালের ২রা আগস্ট আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজ-ভেলটকে যা লিখেছিলেন তার সারমর্ম হল এই, মহাশয়, এনরিকো ফের্মি এবং লিও জীলার্ড যে বিষয়ে গবেষণা করছেন, তার তথ্য আমার নিকট পাঠানো হয়েছে। তাতে বুঝতে পারলাম যে, ইউরেনিয়াম মৌল অদূর ভবিষ্যতে একটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তির উৎস হতে পারে। এবং তার শক্তিকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করা দরকার। তা প্রয়োজনে লাগলে, এখনই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কাজে হাত দেওয়া উচিত। গত চার মাসে ফ্রান্সের জোলিও এবং আমেরিকার ফের্মি ও জীলার্ডের গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে বৃহৎ পরিমাণ ইউরেনিয়াম পিণ্ডে পরমাণুর কেন্দ্রিন শৃংখল ক্রিয়া সফল হতে পারে। তার দ্বারা প্রচুর শক্তি এবং রেডিয়ামের সমান নূতন মৌল সৃষ্টি হবে।

এই ঘটনা বোমা তৈরিতে সাহায্য করবে। এখন অবশ্য তা জোর করে বলা যাচ্ছে না। এই ধরণের একটা বোমা যদি জাহাজে করে নিয়ে গিয়ে কোন একটা বন্দরে বিস্ফোরিত করা যায় তবে সমগ্র বন্দর ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

আমি শুনেছি যে চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে জার্মানি ওখানকার খনিজ ইউরেনিয়াম বিক্রয় বন্ধ করে দিয়েছে। এই ইউরেনিয়াম না বিক্রয়ের কারণ আছে। মনে হয় জার্মান রাষ্ট্রের উপসচিবের পুত্র ফন ভিজস্‌আকার বার্লিনের কাইজার ভিলহেম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত থেকে আবার ইউরেনিয়াম বিষয়ে গবেষণা করছেন। ইতি আপনার একান্ত বিশ্বাসী

এ, আইনস্টাইন

১৯০৫ সালে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে প্রথম গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই নিবন্ধেই তিনি একটা গানিতিক সূত্র দিয়েছিলেন। সেটি হল $E = mc^2$। এর মধ্যে লুকিয়ে ছিল পরমাণু শক্তির ইঙ্গিত।

পরমাণুতে শক্তি থাকলেও পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ পরমাণু দ্বারা গঠিত। বিজ্ঞানীদের মতে পদার্থের ওজন আছে, ভর আছে এবং বিস্তৃতি আছে। এই পদার্থ তিনভাগে বিভক্ত যথা: কঠিন, তরল ও বায়বীয়।

সোনা, রূপা, লোহা মৌলিক পদার্থ। এদের অন্য কোন পদার্থে ভাগ করা যায় না। জলকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে ভাগ করা যায় বলে যৌগিক পদার্থ। কারণ জলের সৃষ্টি ঐ দুই পদার্থের সংযোগে সম্ভব হয়েছে।

পরমাণু হল এমন অবিভাজ্য কণা যা সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। তারা পদার্থের বা মৌলের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্ম বজায় রেখে চলে।

পরমাণু তত্ত্ব অনুযায়ী ধনাত্মক কেন্দ্রীনের চারদিকে ঘূর্ণায়মান ঋনাত্মক ইলেকট্রনগুলি দ্বারা পরমাণু গঠিত। তার তাড়িতিক প্রশমন থাকার কারণ, সাধারণতঃ কেন্দ্রিনের মোট ধনাত্মক আধানের সঙ্গে ইলেকট্রন সমূহের মোট ঋণাত্মক আধান সমান তালে ক্রিয়াশীল। কেন্দ্রকে প্রোটন থাকে। হাই-ড্রোজেন পরমাণুর বেলায় দেখা যায় ইলেকট্রনের ভরের চেয়ে প্রোটনের ভর ১৮৩৬ গুণ ভারি। কেন্দ্রকের অপর একটি উপাদান থাকে তার নাম নিউট্রন। তার তাড়িতিক আধান না থাকলেও তার ভর প্রোটনের সমান।

সাধারণতঃ দেখা যায় প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান হলে পরমাণু তাড়িত্তিক ভাবে প্রশম হয়। আরও বলা যায় পরমাণু তাড়িত্তিক ভাবে প্রশম বলেই ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান। হাইড্রোজেনে একটি প্রোটন একটি ইলেকট্রন, অক্সিজেনে আটটি প্রোটন আটটি ইলেকট্রন।

আয়ন বলা হয় ধনাত্মক বা ঋণাত্মক পরমাণুকে। এই আয়নে হাইড্রোজেন বা অক্সিজেনের মত সমান সমান ইলেকট্রন প্রোটন থাকে না। তারা সংখ্যায় কম বেশি থাকে। পরমাণুর পরিচয়ে প্রোটনের পরিচয় হয়। তাই পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যাকে পরমাণু সংখ্যা (Atomic number) বলে। আধুনিক পর্যায় সরণিতে এই সংখ্যা নির্দেশ করে মৌলের স্থান ও ধর্ম। পরমাণুর ভর সংখ্যা পাওয়া যায় প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার যোগফলে। যেমন অক্সিজেনের আটটি প্রোটন ও আটটি নিউট্রন থাকায় সংকেত হবে ৮·১৬। মোটামুটি পরমাণুর ব্যাস ১০—৮ সেমির কাছাকাছি। কেন্দ্রকের ব্যাস ১০—১৩ সেমির কাছাকাছি। পরমাণুর সমগ্র ভরের ৯৯.৯৭% ভাগ কেন্দ্রীভূত থাকে কেন্দ্রকে। ডালটনের মতে সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণু অবিভাজ্য থাকলেও কেন্দ্রীয় বিক্রিয়ায় তার বিভাজন সম্ভব।

গুটিপোকা যেমন নিজের লালায় তৈরি গুটিতে নিজেই বন্দী হয়ে পড়ে, সেই গুটিকে ছিঁড়ে না দিলে সে শক্তি থাকতেও বেরিয়ে আসতে পারে না। তেমনি পারমাণবিক কেন্দ্র আকর্ষণ বিকর্ষণের ক্রিয়ায় তৈরি কেন্দ্রকে বন্দী হয়ে পড়ে। সেই কেন্দ্রককে আঘাত না করলে শক্তি মুক্ত করতে পারে না। বস্তুর সঙ্গে কেন্দ্র এক যোগে সৃষ্টি হয় আকর্ষণ বিকর্ষণ প্রক্রিয়ায়। তারাই সৃষ্টি করে প্রোটন, কেন্দ্রক, নিউট্রন, ইলেকট্রন। যদি চাপের প্রভাবে কেন্দ্র না থাকত, তবে ঐসব বস্তু সৃষ্টি হত না। তবে পুরো পরমাণুটাকে কেন্দ্র করে আবহাওয়া আকর্ষণ বিকর্ষণ চালাতে থাকত যতক্ষণ না মৃত পরমাণুটি কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণে জীবিত হচ্ছে। মৃত তারকাদেরও এইভাবে একদিন জীবিত হতে হবে বিস্ফোরণে, না হয় নিজেকে বহিরাকাশের আকর্ষণে বিকর্ষণে ক্ষয় হয়ে বিলিয়ে দিতে হবে অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের সৃষ্টির কাজে। এই নিয়ম সর্বত্র চলে। এই কেন্দ্রই ধ্রুব, আর সবাই চঞ্চল ও অস্থায়ী। কেন্দ্র ও বস্তু একসঙ্গে জাগলেও, কেন্দ্র স্থির থাকে বস্তু তাকে ঘিরে থাকলেও নানা রূপে অস্থির থাকে।

আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ভর করে দুটি সম আয়তন বস্তুর ঘনত্বের পার্থক্যের উপর। জলকে ভিত্তি ধরে আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপা হয়। আপেক্ষিক গুরুত্বের

যান এক অপেক্ষা কম হলে বস্তুটি জলে ভেসে থাকে, এক অপেক্ষা বেশি হলে জলে ডুবে যায়।

আপেক্ষিক তাপও বিজ্ঞানের একটা বিষয়। এই বিষয় নিয়ে অনেকে মাথা ঘামিয়েছেন। আইনস্টাইন কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগে কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপের তাত্ত্বিক সূত্র দেন। তাতে বলা হয়েছে, চরম উষ্ণতার উপর আপেক্ষিক তাপ নির্ভরশীল এবং চরম শূন্য উষ্ণতায় আপেক্ষিক তাপও শূন্য হয়ে যায়। তাঁর তত্ত্বে বলা হয়েছে, কঠিন পদার্থের সমস্ত পরমাণুর কম্পাঙ্ক সমান। কিন্তু আইনস্টাইনের সূত্রের কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়, অতি নিম্ন উষ্ণতায় সূক্ষ্ম পরীক্ষায় আপেক্ষিক তাপ নির্ণয়ে। ১৯১২ সালে পি, ডিবাই বলেন, কঠিন পদার্থের বিভিন্ন পরমাণু বিভিন্ন কম্পাঙ্কে আন্দোলিত হয় এবং সেই সব কম্পাঙ্ক স্থিতি-স্থাপক ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এমনি আপেক্ষিক গুরুত্ব, আপেক্ষিক তাপ কৃত্রিম ভাবে নির্ণয় করা গেলেও, তার ধ্রুবত্ব নাই। কারণ যে কোন একটা বস্তু ধরে নির্ণয় করায় একক ক্ষেত্রতত্ত্বের ক্ষতি হয়। সেন্টার ভিত্তিক চিন্তা করলে এইসব আপেক্ষিক গুরুত্ব, আপেক্ষিক তাপ, পারমাণবিক গুরুত্ব ইত্যাদি ভালভাবে বোঝা সম্ভব। প্রাকৃতিক কেন্দ্রভিত্তিক কাজে এই সবই আপনা থেকে ঘটে চলেছে। এই নিয়ম ধরলে নানা মুনির নানা মতও আর থাকে না।

কেন্দ্রভিত্তিক কঠিন পদার্থের বিভিন্ন পরমাণু বিভিন্ন কম্পাঙ্কে চলে। যদি না চলত তবে সব বস্তুই একই বস্তু হয়ে যেত। পরমাণুর মধ্যেও কম বেশি পরমাণু না থেকে একই রকম পরমাণু হত। রসায়নশাস্ত্রে পারমাণবিক গুরুত্ব বলে একটা গুরুত্ব পূর্ণ ধর্ম আছে। মেণ্ডেলিয়েফ গুরুত্ব অনুযায়ী পর্যায় সারণিতে মৌলের স্থান নির্ণয় করেন। কোন একটি মৌলের ওজনকে প্রমাণ (standard) ধরে অন্য যে কোন মৌলের ওজনের সঙ্গে প্রমাণ বা স্ট্যাণ্ডার্ড পরমাণুর ওজনের অনুপাতকে বলে সেই মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব বা অ্যাটমিক ওয়েট। এখানে একের সঙ্গে অন্যের গুরুত্ব বোঝা গেলেও তাদের সঙ্গে সেন্টারের সম্পর্ক বোঝা যাচ্ছে। প্রতিটি বস্তুর গুরুত্ব তো সেন্টারের পরে নির্ভর করে।

সেন্টারে আঘাত করলে পরমাণুর শক্তি যে কত ভীষণ তা বোঝা যায়। সেই পরমাণু বোমার জিগীর পৃথিবীকে আজ ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। এই বোমা ফাটালে কি হয়, নাগাসাকি ও হিরোসীমার ধ্বংসস্তূপ দেখে তার খানিকটা বোঝা গিয়েছিল। কত লোক সেই বিস্ফোরণে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল,

কত লোক বিকলাঙ্গ হয়ে ব্যর্থ জীবন যাপন করল, কত লোক ক্যান্সারে প্রাণ হারাল, কত গর্ভবতী নারীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে মারা গিয়েছিল, যারা জন্মাল তারা বিকলাঙ্গ হয়ে জীবন যাপন করতে লাগল। এই শক্তি এত বিধ্বংসী ছিল যে, মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত সব মিলেমিশে অগ্নি গোলকে পরিণত হয়েছিল। আকাশে তার ধ্বংসকারিতা ছড়িয়ে পড়ার ফলে বহুদিন যাবত পৃথিবীর কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণে মারণ কার্য চালিয়ে গিয়েছিল।

আজ পৃথিবীর ভাণ্ডারে এত পরমাণু বোমা জমা হয়ে আছে যে, তা দিয়ে বহুবার পৃথিবীকে ধ্বংস করা যেতে পারে। অন্যান্য অস্ত্র আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করা গেলেও এই অস্ত্র আত্মরক্ষায় ব্যবহার করা যায় না। এই বোমা যেই ফেলুক না কেন তারও ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার উপায় নাই। যারা এই অস্ত্র জমা করে রেখেছে, তাদের উদ্দেশ্য পৃথিবীকে ধ্বংস করা, যুদ্ধ করা নয়। যুদ্ধে দুই পক্ষ জয় পরাজয় ভাগ করে নেয়। কিন্তু পরমাণু বোমা ফেললে জয় পরাজয় থাকে না বলেই তা যুদ্ধ নয়। তাতে মানুষের প্রকৃত শক্তি পরীক্ষাও হয় না। যে কেউ এই বোমা ফেললে, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। মানুষের সভ্যতাও ধ্বংস হয়ে যাবে। আইনস্টাইন তাই বলেছিলেন, পরবর্তী যুদ্ধে পারমাণবিক বোমা ব্যবহৃত হলে, মানুষ আদিম যুগের তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করবে।

এত শক্তি তো ক্ষুদ্র পরমাণুর কেন্দ্রেই লুকিয়ে থাকে। সেই শক্তি ইলেকট্রনকে চালাচ্ছে। ইলেকট্রন এত ক্ষুদ্র যে কেন্দ্রের শক্তি তাকে ঠেলে রেখেছে। তখন বেশি উত্তপ্ত হয় না বলে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে না। অর্থাৎ শীতলতা-জনিত গাঠনিক ক্ষমতা কাজ করছে আপেক্ষিক শূন্যতার সুগম পথে। কেন্দ্র-ভিত্তিক চলা আছে বলেই ইলেকট্রন গোলাকার পথে চলছে। তার সঙ্গে তাল রেখে কাজ করছে অবশ্য কেন্দ্রভিত্তিক বাইরের চাপ। সেই প্রতিমুহূর্তের পতনে সে ঘুরেই চলেছে। আকর্ষণের শীতলতা বস্তু গঠনের মালমসলা যোগাড় করে দেয়। বিকর্ষণের উষ্ণতা বস্তু গঠনের মালমসলাকে স্থান দিতে অপ্রয়োজনীয় বস্তু বের করে দেয়। এই গঠনের শীতলতাই আমাদের জীবন ধারণের রসদ সৃষ্টি করছে, আবার সে ধ্বংসের রসদ সৃষ্টি করছে। তাই ইলেকট্রনে আমরা বিদ্যুৎ পাই আবার বোমাও পাই।

আইনস্টাইনের সূত্রে বলা হয়েছে, বন্দী করে রাখা শক্তি হল ভর। এই শক্তি মুক্ত করা যেতে পারে। জীলার্ড দেখালেন তা প্রমাণ করে। প্রচণ্ড

শক্তির উৎসকে উদ্‌ঘাটন করলেন ইউরেনিয়ম মৌলের পরমাণুকে বিচূর্ণ করে। আইনস্টাইন চেয়েছিলেন বিশ্বশান্তি, সেই বিশ্বশান্তির সহায়ক হতে পারত ঐ পরমাণু বিস্ফোরণ, কিন্তু সেদিকে মানুষ বেশি নজর না দিয়ে ধ্বংসের দিকে নজর দিয়েছে। এই ব্যাপারে তিনি রুজভেলটের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বলেন, হিটলার পরমাণু শক্তির কথা জানতে পেরেছে বলেই আপনাকে পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে চিঠি দিয়েছিলাম। এখন দেখছি এর দ্বারা সাধারণ লোকের মৃত্যু ছাড়া লাভ হবে না। রুজভেল্ট তখন আশ্বাস দেন, বিজ্ঞানীরা যদি এই প্রলয়ঙ্কর বোমা বানাতে পারেন, তবে সেই বোমা সাধারণ মানুষকে মারবে না। কিন্তু সেই আশ্বাসবাণী বানচাল হয়ে গেল। ১৯৪৫ সালে হিরোসীমা ও নাগাসাকিতে সেই মার্কিন বোমা পড়ল। তাই আইনস্টাইন বলেছিলেন, যদি আবার নূতন করে জীবন শুরু করা যেত, তবে তিনি বিজ্ঞানী না হয়ে ছুতোর মিস্ত্রী হতেন।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাতত্ত্ব থেকে জানতে পারা যায় পদার্থ ও শক্তির মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নাই। পদার্থ হল শক্তির ঘনীভূত রূপ, শক্তি হল পদার্থের প্রসারিত ভাবকণা। এই ভাবকণা ভাঙলে হয় ভাবাকাশ যার হদিশ আজও বিজ্ঞানীরা পাননি। তাবৎ বিশ্বজগৎ এই পদার্থ ও ভাব দিয়ে গঠিত। শক্তি তাদের পরস্পরের বাহক। এই জগৎ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। একটা জীব-জগৎ, অন্যটা জড়-জগৎ। জড়-জগৎ নিজেকে বুঝতে না পারলেও, তার মধ্যে কৈন্দ্রিকভাব কাজ করে চলেছে। এই কেন্দ্রকে বলা যেতে পারে বস্তুর আত্মা। জীবের কেন্দ্রকে বলে জীবাত্মা। সবার মূলে এক হয়ে কাজ করছে পরমাত্মা।

এই জড়-জগৎ সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে ভৌত-বিজ্ঞান বলে। তার এক শাখাকে বলে পদার্থ-বিজ্ঞান। আজ কেন্দ্রতত্ত্বের ফলে পদার্থ বিদ্যাতেও জীবতত্ত্ব ঢুকে পড়েছে। তার নাম জীবপদার্থবিদ্যা বা Biophysics। বিশ্বজগৎ জোড়া তাদের কার্যকলাপ দেখে নানা পণ্ডিত নানা মত প্রকাশ করে গেছেন। নানা কারণে তাদের কতকগুলি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সেস্থানে দাঁড়িয়ে যায় আর এক তত্ত্ব। এইভাবে বিজ্ঞানীরা একক ক্ষেত্রতত্ত্বে আসতে চেষ্টা করছেন। এই ধরনের পদার্থ বিদ্যাকে বিশুদ্ধ পদার্থ বিদ্যা বলে। পদার্থ বিদ্যার প্রয়োগ যেখানে মানুষের প্রয়োজনকে ভিত্তি করে, সেখানে তার নাম দেওয়া হয়েছে ফলিত পদার্থ বিদ্যা। পদার্থ বিদ্যার অধিকাংশ শাখার আবার দুটি করে প্রশাখা আছে, তারা

হল বিশুদ্ধ ও ফলিত। অবশ্য তারা পরস্পরের পরিপূরক। ফলিত বিজ্ঞানের তাগিদে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান উন্নত হয়, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান উন্নত হলে ফলিত বিজ্ঞান উন্নত হয়ে ওঠে।

পদার্থ মাত্রেরই চরম গতি বা স্থিতি কিছু নাই। তাদের গতি ও স্থিতি তাই প্রমাণ করা হয় অন্য বস্তুর গতি ও স্থিতি দেখে। সেখানে আপেক্ষিক গতি ও স্থিতি পরিকল্পিত হয়েছে।

নিউটনের তিনটি গতি সূত্রে বলা হয়েছে, বস্তুর জাড্য, বলের স্বরূপ ও পরিমাপ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক, ভরবেগের নিত্যতার কথা। বলবিদ্যার মধ্যে কার্য এবং স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি আলোচিত হয়। প্রবাহী পদার্থের (তরল ও গ্যাসীয়) গতি ও স্থিতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে উদ্‌গতি বিদ্যা ও উদ্‌স্থিতি বিদ্যায়। তাদের মধ্যে দেখানো হয়েছে প্রবাহী পদার্থের ভাসমান বস্তুর সাম্য অবস্থা, প্রবাহীঃ চাপ ইত্যাদি।

প্রতিটি কথারই তরজরূপ আছে। আপেক্ষিকতাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে বলবিদ্যা, তাতে আলোচনা করা হয়েছে আলোর গতির সঙ্গে অন্যান্য বস্তুর গতির তুলনার কথা। নিউটনীয় মহাকর্ষ সূত্রে প্রকৃতির বহু ঘটনা জানা গেলেও আইনস্টাইনের তত্ত্বে তা আরও পরিষ্কার হয়েছে। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র হল এই, স্থান সময় সন্ততিতে (Space-time continuum) অনিয়ম সৃষ্টি হয় যে কোন বস্তুর উপস্থিতির ফলে। একেই বলে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রের মধ্যে বিরাজমান অন্য বস্তুর ক্ষেত্রের দ্বারা প্রবাহিত হয়, অবশ্য প্রথম বস্তুর মহাকর্ষ বল দ্বারা হয় না। এই নিয়মেই ফেলা হয়েছে দূরের মহাকর্ষ বলের ধারণা।

বর্তমানে তাপশক্তির স্বরূপ গতীয়তত্ত্ব (Kinetic theory) দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। সেখানে বলা হয়েছে, যে কোন বস্তুর মধ্যের অণুগুলি সব সময় অক্রম গতিসম্পন্ন। তাদের এই অক্রম অর্থাৎ বিশৃঙ্খল গতির জন্য তাপশক্তি প্রকাশ পায়। এই তাপ শক্তির জন্য দায়ী বিশৃঙ্খল গতি। কার্যের সঙ্গে তাপের সমতুল্যতার কথা বলা হয়েছে গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রে। তাপ-গতি বিদ্যায় দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে, প্রকৃতির মধ্যে শৃংখলার চেয়ে বিশৃঙ্খলা বেশি। কোন সম্বন্ধ বস্তুদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তবে তারা গতির ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল হয়ে উঠবে। পরে তারা বিশৃঙ্খলতার চরমে গিয়ে পৌঁছালে সম্বন্ধ বস্তুর সব অংশেই তাপমাত্রা সমান হবে।

বস্তুর কম্পণের উপর শব্দ নির্ভর করে। শব্দবিত্তায় এই কথা বলা হয়েছে। বায়ু বা অন্য কোন মাধ্যমের ভেতর দিয়ে এই শব্দ গেলে, সেইসব মাধ্যমের কণাগুলোও কাঁপতে থাকে। এই শব্দ তরঙ্গ কাণে এলেও আবার কর্ণপটহ কাঁপতে থাকে। এই কম্পনই মস্তিষ্ককে সব জানিয়ে দেয়।

আমাদের শোনার উপযোগী শব্দতরঙ্গ হল মোটামুটি সেকেণ্ডে ২০ থেকে ২০,০০০ হার্ৎজ। এই কম্পন আরও বেশী হলে আমরা শুনতে না পেলেও তার অনেক ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। তাকে বলে Ultrasonic wave বা শব্দোত্তর তরঙ্গ। শব্দ সোজা পথে চলে। উৎস থেকে তা ক্রম প্রসারতায় শাখা প্রশাখায় চলে বলেই যে কোন স্থান থেকে শোনা যায়। শাখা প্রশাখা হলেও তার গতি সোজা। তাই মাইকের আওয়াজ সোজাসুজি চলে তবে হাওয়া এদিক ওদিক করে দেয়। আবার পাহাড়ে বা দেওয়ালে ঘা খেয়েও প্রতিধ্বনিত হয়। পাহাড়ের বা দেওয়ালের যে দিক ঢালু থাকে, সেদিকে শব্দ পিছলে গেলেও শব্দ সেখান থেকেও সোজা চলে। পৃথিবীর কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ চললেও প্রভাব চারদিকে সমান বলেই শব্দ সোজা চলে। কিন্তু তরঙ্গ প্রমাণ করে সেই চারদিকের ধারার সংঘর্ষ।

বায়ুর মধ্য দিয়ে শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে চলে ১১২০ ফুট (ft)। এই শব্দের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট শুনতে হলে শব্দ তরঙ্গকে মোট ১১২০ + ১০ বা ১১২ ft চলাচল করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিফলকের কমপক্ষে দূরত্ব হবে (১১২ + ২) বা ৫৬ ft। তাই ঘরে বসে দেওয়ালে প্রতিফলিত শব্দ আলাদাভাবে শুনতে পাই না। এখানে প্রতিফলিত শব্দ চলার মত আপেক্ষিক শূন্যতার পথ পায় না। এই সূত্র আলোর ক্ষেত্রেও চলে।

সর্বগুণে আবহাওয়া সমান প্রবাহিত বলে সবাই পথ করে চলতে পারে। যে পথে আলো চলতে পারে, সে পথে শব্দ চলতে পারে না। অথচ সবার উপযোগী পথ আবহাওয়ায় তৈরি করে নিতে হয় নিজের নিজের শক্তির মাপ মত। বাটির আকারের পাত্রে চারদিক থেকে শব্দ ঢুকে সেণ্টারে সংগঠিত হয়ে প্রতিফলিত হলে সেণ্টার শক্তিতে তা বহুদূর প্রবাহিত হয়। সেখানে পথের আপেক্ষিক শূন্যতার অভাব হয় না। উত্তাপ ও আপেক্ষিক নিম্ন উত্তাপের দিকে যায়। তার কোন ব্যতিক্রম নাই।

বৈজ্ঞানিক ভোল্টা (Volta) সরল ভোল্টীয় কোষ তৈরি করেন। তাতে একটা কাঁচের পাত্রে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড প্রয়োজন হয়। সেই অ্যাসিডে

একটা তামার, অপরটা দস্তার পাত এমন ভাবে আংশিক ডুবিয়ে রাখতে হবে যে, যেন সেদুটির মধ্যে পরস্পরের স্পর্শ না লাগে। তারপর বাইরে জেগে থাকা তামার ও দস্তার পাত দুটিকে তামার তার দ্বারা যুক্ত করলে তড়িৎ কোষ (Electric cell) সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন কাঁচের পাত্রের সালফিউরিক অ্যাসিডের দিকে তাকালে দেখা যাবে দস্তার পাত থেকে তামার পাতের দিকে ধারা বয়ে আসছে। এখানে এইটাই প্রমাণিত হল দস্তা, তামা, অ্যাসিড সবার মধ্যে ধারা প্রবাহিত হতে পারে ঠিকমত ব্যবস্থা নিলে। আমরা জানতে না পারলেও সবার মধ্যে পথ আছে। সেই পথে চলাচল করে প্রকৃতির নানা ধারার নানা উপাদান। আকর্ষণ বিকর্ষণ চালানোর জন্য এই পথ সৃষ্টি হয়েছে।

এই নিয়মেই আলো বস্তুর তড়িচ্চৌম্বক তরঙ্গ। বেতার তরঙ্গ, গামা রশ্মি, এক্সরশ্মি সবাই এই নিয়মে চলে। তফাৎ তাদের মধ্যে শুধু তরঙ্গের। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক্সরশ্মি বা গামারশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে অনেক বেশি, আবার বেতার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তুলনায় অনেক কম। আপেক্ষিকতাতত্ত্বে বলা হয়েছে, বস্তুর বেগ কখনও আলোর বেগের চেয়ে বেশি হবে না। আবার কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে আলোর কণারও একটা রূপ আছে। এক একটি কণা বা ফোটনে যে শক্তি থাকে তা আলোর কম্পাঙ্ক ও একটা ধ্রুবকের গুণফলের সমান হয়। একেই বলে প্লাঙ্কের ধ্রুবক। প্রকৃতপক্ষে সব চুম্বকত্বের পেছনে তড়িৎ শক্তি কাজ করে, আবার তড়িৎ শক্তির পেছনে চৌম্বক শক্তি কাজ করে। ম্যাক্সওয়েলের চারটি সমীকরণে বলা হয়েছে তড়িতাধান, তড়িৎ প্রবাহ, তড়িৎ ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে সম্বন্ধ থাকে।

পদার্থ বিদ্যার দুটি উত্তেজক বিষয় হল কণা পদার্থ বিদ্যা ও প্লাজমা পদার্থ বিদ্যা। উচ্চ শক্তিশালী কণাত্বরক যন্ত্রে বহু মৌল কণার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তাদের কয়েকটি বেশ ক্ষণস্থায়ী। কণাগুলোর মধ্যে কোন সঙ্গতি আছে কিনা, সেই মত সাজানোর চেষ্টা চলছে। যতই চেষ্টা চলুক কেন্দ্রকে বাদ দিয়ে সবকিছুর ব্যাখ্যা অসম্ভব।

জলে এক এক জীব ভেসে চললে এক এক তরঙ্গ হয়। তারা অন্যত্র চললে তরঙ্গ হয় না, হলেও খুব সামান্য। জলের উপর দিয়ে হাওয়া বয়ে গেলে জলে তরঙ্গ এগিয়ে চললেও প্রতি মুহূর্তে জলের ধর্মে পিছিয়ে আসছে। তাই আলো, শব্দ কারো কোন নিজস্ব তরঙ্গ নাই। চলার বেগের জন্য তরঙ্গায়িত হয়। এর মূলে কাজ করছে উৎস বা সেন্টারের শক্তির আপেক্ষিক পূর্ণতা ও তার সৃষ্ট চলার

পথের আপেক্ষিক শূন্যতা। আবহাওয়াতে সবদিকের ধারা আছে, তাদের সংঘর্ষে তরঙ্গ সৃষ্টি করতে সহায়তা করছে আলো ইত্যাদির গতিশক্তি ও শারীরিক ঠেলা। কোনকিছু তরঙ্গের জন্য চলে না, ইথারের জন্য চলে না। চলে সেণ্টার শক্তিতে। চলার পথে বাধাই তরঙ্গ সৃষ্টি করে।

তরঙ্গের মূল কথা গতির মুখে বাধা। এক কেন্দ্রের ধারা অন্য কেন্দ্রে যায়। এই ধারা অন্য কেন্দ্রে যে স্থান দখল করে সেই স্থানের পূর্বের বস্তু ধারা হয়ে আর এক কেন্দ্রের প্রয়োজনে বেরিয়ে যায়। এই ভাবে সবার সঙ্গে সবার বিনিময় চলছে। বস্তুর পরিবর্তন ঘটছে। এই ভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর পরিবর্তন ঘটে চলেছে। জলে হাত দিলে ঠাণ্ডায় হাত প্রভাবিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে হাতের উষ্ণতায় জলও প্রভাবিত হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমনি ভাবে সবার সঙ্গে সবার সম্বন্ধ স্থির হয়ে আছে। এই সূর্য একা আলাদা ভাবে জেগে নাই, সেও সবার সম্পর্কে বাধা হয়ে অছে। একক ক্ষেত্রতত্ত্ব মানতে হলে সূর্যের একটা পরিবর্তন হলে অনন্তের কোন প্রত্যন্ত দেশের একটা পরমাণুরও যে পরিবর্তন হচ্ছে, তা মানতে বাধ্য।

নয়

হাইড্রোজেন বেলুন আকাশে দুলে দুলে উঠতে থাকে। এই দোলার কারণ হল আবহাওয়ার বাঁধা। সে আসলে উঠছে কিন্তু আপেক্ষিক শূন্যতায়। আমরা পৃথিবীর আবহাওয়ায় চলাফেরা করছি, আপেক্ষিক শূন্যতার দিকে, আমরা অজানাকে জানতে চাই তাও আপেক্ষিক শূন্যতার জন্য। জানার আগ্রহ যে চাপ সৃষ্টি করে, সেই চাপের তুলনায় জানতে চাওয়া বস্তুর পথ আপেক্ষিক শূন্য।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যদি চেপে সীমার মধ্যে আনি, সূর্য গ্রহ উপগ্রহদের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, তা কমতে থাকবে শূন্যতাকে নিঙড়িয়ে দিয়ে। জল ও গ্যাস শূন্যতার মধ্যে যে সব শক্তি প্রকাশ করে আছে সে শক্তি বেরিয়ে আসবে শূন্যতার সঙ্গে সঙ্গে। সমস্ত মিলিত পূর্ণতা সব ছেড়ে দিয়ে কাঠিন্যে পর্যাবসিত হবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তবু চাপের অসাম্যে কেন্দ্রে আবহাওয়ার ধারা ঢুকে যায়।

কঠিন হওয়ার পথে সূর্যগুলি কাছাকাছি আসবে। যদি কোন কোন ছোট সূর্য কোন মহাসূর্যের চারদিকে গ্রহের মত ঘুরতে থাকে তারা সেই মহাসূর্যের

বুকে পতিত হতে থাকবে। সাধারণ সূর্যের গ্রহরাও, তার বুকে পতিত হতে থাকবে। গ্রহদের বুকে উপগ্রহরা পতিত হতে থাকবে, পরমাণুর প্রোটনের বুকে ইলেকট্রনরাও পতিত হতে থাকবে। প্রোটনও ভেঙে পড়বে তার কেন্দ্রে। সব মিলিয়ে একটা নিরেট বিশাল বস্তু বের করে দেওয়া অসীম শূন্যতায় পতিত হতে থাকবে অসীম যুগ ধরে।

শূন্যতার শুধু চলতে দেওয়া আর পড়তে দেওয়া ধর্ম। এই চলা ও পড়া নিয়েই তো সবাইকে খণ্ড খণ্ড করে তাদের মধ্যে ঢুকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চালাচ্ছে। কেন্দ্রকে ভিত্তি করে বস্তু শূন্য হয়ে অন্যত্র যাচ্ছে, সেখানে শূন্য বস্তু হওয়ার পর বস্তু আবার শূন্য হয়ে আসছে।

বস্তু না থাকলে শূন্য কাকে চালাবে? বস্তুর সেণ্টার না থাকলে তার সৃষ্টি হত কি করে? শূন্য ও বস্তু কিছুই সৃষ্টি হত না সেণ্টার না থাকলে। গ্রহরা যেমন সূর্যের চারদিকে ঘোরে, সূর্যদের তেমনি মহাসূর্যের চারদিকে ঘোরার কথা। না ঘুরলেও অসুবিধা নাই। মহাসূর্যের কাজ চালাচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবার মিলিত কেন্দ্র আকর্ষণ বিকর্ষণ দিয়ে। সূর্য এখানে বড় কথা নয়, গ্রহ এখানে বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে কেন্দ্র। কেন্দ্র অভাবে সূর্য গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে না। অসম্ভব কাজ হলেও কেন্দ্র না হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেও চেপে সীমার মধ্যে আনা যায় না।

কিন্তু অসীমকে যে বাঁচতে হবে। অসীমকে সীমার মধ্যে যে আনবে, তাকেও যে অসীমের চেয়ে বড় এবং শক্তিশালী হতে হবে। যা অসীম, তার চেয়ে আবার বড় কি হবে? অসীম থেকে কিছুকে বড় হতে হলে অসীম কথার ধারণাই থাকে না। অসীম ও অসীমের চেয়ে বড় এই দুটি বস্তু কল্পনা করতে গেলে দুই ভাগ করতে হয়। ভাগ করতে গেলেই তারা সসীম হয়ে যায়। বস্তু ও শূন্যকে দুই ভাগ করলেও সসীম হয়ে যায়। বস্তু ও শূন্য মিলে সেখানে অসীম, সেখানে বস্তুকে চূর্ণ করে যে প্রসারিত গ্যাস পাওয়া যাবে (গ্যাস তো পরমাণুদের বিচ্ছিন্ন রূপ), তাকে আরও চূর্ণ করে ভাব পারে আনলে সৃষ্টি হবে শূন্য। এই শূন্যের সঙ্গে স্বাভাবিক শূন্য মেশালে স্থান হবে না এই অসীমে। তাই সে অসীমতা সম্ভব নয়। অসীমের এই সীমা কল্পনা করা যায় মাত্র। আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শূন্যতা মুক্ত করলে সবচেয়ে ছোট হয়ে সসীম হয়, তা কল্পনা করা গেলেও বাস্তবে সম্ভব নয়। তাতে শূন্য বস্তু ভাগ হয়ে গেলে অসীমতা থাকে না। আসলে চরম ভাবকে বস্তুতে আসতে হবে, চরম নিরেট বস্তুকে ভাবে

আসতে হবে। অসীমতা এখানে প্রসারতা নয়, শৃঙ্খলতা তাহলে চিরদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এখন যা আছে, তাই চিরদিন থাকবে।

মহাবিশ্বের প্রত্যন্ত সীমায় প্রচণ্ড উত্তপ্ত ছোট তারকার মত জ্যোতিষ্ক আছে, তার প্রচণ্ড উত্তাপের কারণ বিজ্ঞানীরা ধরতে পারছেন না। হয়তো তা মহাসৌর জগতের কেন্দ্র। নইলে তারা সূর্যের চেয়েও বেশি উজ্জল ও উত্তপ্ত হয়ে থাকে কেন? তাই বলে গ্রহের কেন্দ্রকে সূর্যের চেয়ে বড় হতে হবে তার কোন মানে নাই। আকর্ষণ বিকর্ষণের তীক্ষ্ণতার জন্য গ্যাসীয় আবহাওয়া কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। তাই ছোটও অত উজ্জল দেখাচ্ছে। ঐ ছোট তারকার মত বস্তুর কেন্দ্রের চেয়ে আমাদের সূর্যের কেন্দ্র আরও দুর্বল। তাই গ্যাসের আচ্ছাদনে কেন্দ্র ছেয়ে আছে। পরমাণুর মত বিস্ফোরিত হলে এই সূর্য ঐ ছোট তারকার চেয়েও ভরশক্তি প্রকাশ করতে পারে। কৃষ্ণ গহ্বরের আকর্ষণের জের হয়তো ছোট তারকায় বিকর্ষণে প্রকাশ পাচ্ছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছু মরে সংকোচিত হতে থাকলে, তার যে পরিত্যক্ত স্থান পড়ে থাকে, তাকে তো পূর্ণ করতে হবে। অনন্ত তাই আলাদা আলাদা ভাবে শূন্যতা পছন্দ করে না, পূর্ণতাও পছন্দ করে না। তা পূর্বে বলেছি। দুয়ে মিলে তাই অনন্তকে পূর্ণ হতে হয়েছে একের অন্যতে রূপান্তরিত হয়ে।

এই শূন্য লুকিয়ে আছে গ্যাসের মধ্যে বেশি, আকাশের মধ্যে আরও বেশি। পূর্ণতা লুকিয়ে আছে কঠিন পদার্থের মধ্যে বেশি গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে আরও বেশি। দেখা যায় উভয় উভয়ের মধ্যে আছে কম বেশি। গ্রহ উপগ্রহরা ঘোরে শূন্যতার ফলে, পরমাণুর ইলেকট্রনও ঘোরে শূন্যতার ফলে। কঠিন পদার্থে পরমাণুদের ইলেকট্রন ঘুরলেও অণু নিজে ঘোরে না, বস্তু নিজে ঘোরে না।

পৃথিবীর শক্তি গ্রহণ করার ক্ষমতা অনুযায়ী গ্রহ যে দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে, কোন শক্তির তেমনি দূরত্বে যদি ঐ বস্তু দাঁড়াতে পারে, তবে সে ঘুরতে থাকবে। পৃথিবীর সঙ্গে তার বস্তুর সেই সম্পর্ক নাই। পরমাণুর সঙ্গে পৃথিবীর সেই সম্পর্ক নাই বলে পরমাণুর ইলেকট্রন ঘোরে। তাছাড়া কোষ দিয়ে যেমন আমাদের শরীর তৈরি হয়, ইট দিয়ে বাড়ি তৈরি হয়, তেমনি পরমাণু দিয়ে বস্তু তৈরি হয়, গ্রহ তৈরি হয়।

পরমাণুর সঙ্গে পরমাণু যোগ করলে যে বস্তু হয় পরমাণুর কেন্দ্র তাদের ঘোরাতে পারে না। সেই বস্তুর উপযুক্ত কেন্দ্র চাই। উপযুক্ত আকর্ষণ বিকর্ষণ চাই। গাড়ির চাকা ঘোরে। সেই চাকার সঙ্গে আরও কয়েকটি চাকা বাড়াই

করে জুড়ে দিলে সে আর ঘুরবে না। তাকে ঘোরাতে উপযুক্ত শক্তির প্রয়োজন হয়। সব সময় এই উপযুক্ত শক্তি থাকে না বলেই আমরা পৃথিবীতে বাস করতে পারছি, স্থির হতে পারছি। নইলে আমরাই পরমাণু হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতাম। পৃথিবীর কেন্দ্রভিত্তিক যেমন চলন আছে, তেমনি স্থিতি আছে।

পরমাণু ও সৌর জগতের চরিত্র প্রায় একরকম, অণু ও বস্তু জগতের চরিত্র আর এক রকম। প্রথম চরিত্রটি বেশি শূন্যতা প্রভাবী বলে ঘোরে। ঘুরতে হয় একটা বস্তুকে তাই সে বস্তুও। দ্বিতীয় চরিত্রটি বেশী পূর্ণতা প্রভাবী তাই তার মূল চরিত্র স্থায়িত্বপূর্ণ। তার মধ্যে বস্তুর প্রভাব বেশি থাকলেও শূন্যতার প্রভাবে অস্থায়িত্বপূর্ণ।

আকর্ষণ হোক আর বিকর্ষণ হোক কেন্দ্রভিত্তিক শক্তি সব সময় কাজ করে চলেছে। তাদের চলার পথে আপেক্ষিক শূন্যতা কাজ করে চলেছে। আলো আপেক্ষিক শূন্যতায় চললেও, সেই আপেক্ষিক শূন্যতার মধ্যেও অতি হাল্কা ধরণের শূন্যতা পূর্ণতা কাজ করছে। এই কারণে আলোর তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। একটা তীর ছুটে গেলে তীরের কাঠিন্যের জন্য তরঙ্গ বোঝা যায় না। কিন্তু সে তরঙ্গ সৃষ্টি করে চলে শরীরের জন্য। আলোক কণিকা বলেই তারা নিজেরা সেই তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়। শক্তিতে আলো চলেছে। তবুও আপেক্ষিক শূন্যতারও আপেক্ষিক মৃদু শক্তি বাধা দিচ্ছে। সে তাকে ঠেকাতে না পারলেও বাধা দেওয়াই তার ধর্ম। যদি তার বেগেই কোন কিছু চলে সে বাধা দেবে না। তার চলার পথে সে অশেষ চলবে। আলোর চলার পথের চারধারে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলে গতি অনুযায়ী। গতি তীব্র হলে আলো পাশে বেশী বিকর্ষিত হয় না। কম হলে পাশে বেশি বিকর্ষিত হয় গতি অনুযায়ী বহিরাগত চাপ কমে যাওয়ায়। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই পাশের বিকর্ষিত আলোক কণিকাই মেরুতে আকর্ষিত হয়ে সূর্য ছাড়াই রাতের অন্ধকারে আলো দেয়। এখানে কণিকার চেয়ে তরঙ্গের প্রভাব বেশি।

তীব্র আলো হলে প্রতিক্ষণেই পাশের চাপ গিলে ধরে, যাতে শক্তি বেশি পিছিয়ে আসতে না পারে। সাপ জলে তরঙ্গ তুলে চলে, জলে বাধা পাওয়ার ফলে। তবু জল কেটে সাপ নিজের শক্তিতে তরঙ্গায়িত হয়ে এগিয়ে চলে। এগিয়ে চলার প্রতি মুহূর্তে জল তার গতিকে গিলে ফেলে, যাতে বেশি পিছিয়ে আসতে না পারে। তাই এই গিলে খাওয়া চলার বাধা দিলেও চলার স্থায়িত্ব

আনে। এই গিলে খাওয়া আমাদের 'খাদ্য গেলার মত, অন্ননালীর সংকোচন ও প্রসারণের মত। এই চলাও তরঙ্গকে খানিকটা সাহায্য করে।

নানা বস্তু ধারার সংঘর্ষ, গিলে খাওয়া নীতি, গতি ও গতির সম্মুখের আপেক্ষিক শূন্যতার আপেক্ষিক বস্তু, শরীরের আয়তন, সবাই মিলে তরঙ্গ সৃষ্টি করে। সাপের মত তরঙ্গ তুলে চলা শব্দকে, আলোকে চলতে সহায়তা করে।

কঠিন পদার্থে রঙ মেশালে তেমন ভাবে মেশে না, যেমন ভাবে মেশে জলে। এখানেই রসায়ন বিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ম খুঁজে পাওয়া যাবে। কঠিন পদার্থে রঙ মেশালে রঙ সমানভাবে মেশে না। পদার্থ জগতে তাই বহু পদার্থের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। জলে রঙ মেশালে স্বাতন্ত্র্য বজায় না থাকলেও রঙ ও জলকে সহজে আলাদা করা যায় যদি আলাদা করা না যায়, তবে বুঝতে হবে রাসায়নিক সংযোগ ঘটেছে। উভয়ের পারমাণবিক কেন্দ্রের মিলন ঘটেছে। তখন আর কেন্দ্রের চলন দু পদার্থের দিকে যায় না। দুই বস্তুর কেন্দ্রের চাকা এক সঙ্গে মিলে নূতন একটা পদার্থে অচল হয়ে যায়। তখন তার কণা হবে সেই নতুন পদার্থের কণা।

তবে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটাতে হলে দুই পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ থাকবে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধের মত। সমান পদার্থের আকর্ষণ বিকর্ষন সমান হওয়ায় কাছাকাছি আসতে পারে কিন্তু কেন্দ্রে কেন্দ্রে মিশতে পারে না। কেন্দ্র সব সময় পূর্ণ আছে, তবু বাইরের চাপে আরও কিছু ধারাকে স্থান দিতে হচ্ছে অর্থাৎ আকর্ষণে ভরতে হচ্ছে বলে বিকর্ষণে ছাড়তে হচ্ছে। দুটি সমান কেন্দ্র হলে উভয়ের কণারা সমান হওয়ায় কেন্দ্রে যাওয়া আসার চাহিদা থাকে না। দুই সমান কেন্দ্রের সূক্ষ্ম মোটা নানা কণা থাকলেও সূক্ষ্ম কণা সূক্ষ্ম কণাকে রুখে দেবে, মোটা কণা মোটা কণাকে রুখে দেবে। তাই সূর্যের সঙ্গে গ্রহ মিশলেও অন্য একটা সমান মাপের সূর্য মেশে না। সূর্যের গায়ে এসে গ্রহ পড়ে না উভয়ের পরস্পরের বিনিময়ের বস্তু থাকলেও। সবগুলি এই চরিত্রের নয়।

সূর্যে যা আছে সূর্যের উপযোগী, গ্রহে যা আছে গ্রহের উপযোগী। উভয় উভয়ের রসদ যুগিয়ে চুম্বকত্ব সৃষ্টি করে চলেছে। মাটিতে একটা বাঁশ পুতলে তোলা যায় না। মাটি তাকে চেপে রাখে বা আকর্ষণ করে রাখে। পৃথিবীর এই মাটির সৃষ্টি হয়েছে আকর্ষণের সংগ্রহের ফলে। পৃথিবীর সেণ্টারের আকর্ষণে সেই আকর্ষণ আবহাওয়াতে ছড়িয়ে আছে পূর্বোক্ত কণাদের দ্বারা। তাই তার পৃথিবীকেন্দ্রিক আকর্ষণ আছে, পৃথিবীর বিকর্ষণ আছে, তাই আবহাওয়ার

বিকর্ষণ আছে। যার সূক্ষ্ম ধারার ঠেলায় হাইড্রোজেন আকাশে ওঠে। এই বিকর্ষণ মাটির মধ্যেও আছে, যার ফলে তারা বাইরে এসে স্থূল আবহাওয়াকে ঠেলে রেখে আকাশ সৃষ্টি করেছে।

হাইড্রোজেন আকাশে উঠলেও অন্য বস্তু আকাশে উঠতে পারে না। হাইড্রোজেন যে সূক্ষ্মতার শূন্যে চলে, আলো তার চেয়েও সূক্ষ্মতার শূন্যে চলে। তার চেয়েও সূক্ষ্মতা আছে জগতে, যা আরও দ্রুত চলে। বিরোধী ধারাকে ছেঁকে তার সৃষ্টি। সে ধারা আপেক্ষিক স্থূলতার ফাঁক দিয়ে এগিয়ে চলে। স্থূল ধারার মধ্যে ফাঁক থাকবেই। সেই পথই আপেক্ষিক সূক্ষ্মতার পথ। তত সূক্ষ্ম সাধারণ আলোক কণা হতে পারে না। সে পথে চলে আলোক শক্তির চেয়েও সূক্ষ্ম শক্তি। সেই শক্তির কণারা সেখানে তৈরি হচ্ছে। কেন্দ্র থেকে আসা শক্তি ক্রমে কমে গেলেও সেই আপেক্ষিক শূন্যতার সূক্ষ্ম শক্তি তাকে সাহায্য করছে। শেষে আর এই শক্তি থাকে না, আরও সূক্ষ্ম শক্তি সৃষ্টি হয়। আলোক কণা শক্তিতে চললেই আরও সূক্ষ্মকণা সৃষ্টি হতে থাকে। সেই সূক্ষ্মকণা আপেক্ষিক শূন্যপথে আলোর চেয়ে আরও দ্রুতগামী শক্তির ধারা হয়।

সব শূন্যতায় বস্তু থাকে। এই শূন্যতা যত আপেক্ষিক হতে থাকবে তত বস্তুর কণা সূক্ষ্ম হতে থাকবে। তাই আলোক কণা যে সূক্ষ্মতায় চলে, আরও সূক্ষ্ম শক্তি সেই শূন্যতার মধ্যে পথ করে নিলেও তাকে অতিক্রম করে নিজের সূক্ষ্মতার পথে আসবে। তারও আলোর গতির মত শেষ হতে হবে। সেখান থেকে আবার আরও সূক্ষ্ম শক্তি যখন কাজ করে, তখন আলোক কণিকার শক্তি আর চলতে পারে না। একটা সাধারণ চাকা যে শক্তিতে যতদূর যায়, তাতে বলবেয়ারিং লাগানো থাকলে সেই শক্তিতে আরও বেশিদূর যাবে। এই নীতি মহাবিশ্বেও চলছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্ত হলেও একটানা এক গুণের অনন্ত নয়। কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণে বিকর্ষণে নানা বস্তুর লয় ও সৃষ্টির উপযোগী ভাঙন চলেছে, গঠন চলেছে। আপেক্ষিক পূর্ণতা বস্তু হয়ে আপেক্ষিক শূন্যতার পথ ধরে এক বস্তু গড়ছে, অন্য বস্তুকে আঘাত দিয়ে ভাঙছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল রহস্য এই। কৃষ্ণ গহ্বরের গ্রাস তাই সৃষ্টির কারণ হয়। সেখানে কেউ যদি প্রশ্ন করে, বিরাট সূর্যের আলোর যা তেজ তার চেয়ে বেশি তেজ কি করে হয় একটা ছোট তারকার ?

এর উত্তর, বেশি তেজস্ক্রিয় বস্তু কেন্দ্রের বেশি কাছাকাছি থাকে বলেই বেশি

দূরে চলার শক্তি পাওয়ার ফলে বেশি সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়। কেন্দ্রের থেকে দূরে যে কণিকা আছে, সে যদি আরও দূরে যায়, তবে সে বেশি সংঘর্ষের মুখোমুখী হতে পারে না কেন্দ্রীয় শক্তির স্বল্পতায়। এখানে দূরত্বের হিসাব হবে কেন্দ্রের বিকর্ষণী শক্তি থেকে। এই অবস্থার পর কণিকা আকাশ স্তরে রূপান্তরিত হবে। আবার নিকটত্ব নির্ভর করে আকর্ষণী শক্তির উপর। এই অবস্থার পর কণিকা বস্তুর স্তরে রূপান্তরিত হবে। এই দুই চরিত্র ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছু নাই। পতন মানেই কেন্দ্রের দিকে পতন, উত্থান মানেই কেন্দ্র থেকে দূরে চলন। যে কেন্দ্র থেকে দূরে চলছে, তার কিছু অংশ সংঘর্ষের চাপে কেন্দ্রে ফিরে এলেও কেন্দ্রের শক্তির উপযোগী কণারা এগিয়ে যাচ্ছে অন্য কেন্দ্রের আকর্ষণে আবদ্ধ হওয়ার জন্য। এই চলা প্রথম কেন্দ্র থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করছে, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় কেন্দ্রের সঙ্গে ক্রমে নিকট সম্বন্ধ সৃষ্টি করছে তার কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণে পড়ে। এই কেন্দ্রও প্রথম কেন্দ্রের মত কণাদের ঠেলে পাঠালে অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের কেন্দ্রে ধরা দিতে চায়।

এই শৃঙ্খলা চন্দ্রশেখর সীমাকে অতিক্রম করে, কৃষ্ণ গহ্বরকেও অতিক্রম করে। এদের আকর্ষণের ফলে শক্তি-বিকর্ষণের আলো প্রকাশ পায়। যখন সেই শক্তি ছেড়েও আকর্ষিত কণাদের আর ঠাঁই দিতে পারে না, তখন সৃষ্টি হয় বিগ ব্যাং। ঠাঁই দিতে না পারার বিস্ফোরণে নতুন নতুন সৌরজগতের সৃষ্টি হতে থাকবে। এইভাবে ঘুরেফিরে মহাবিশ্বশক্তি-কোষ কাজ চালাচ্ছে। একেই বলে অনন্ত বিশ্বের অনন্ত কাজ। এই কেন্দ্রবাদ ছাড়া আপেক্ষিকতা বাদ দিয়ে অনন্তকে প্রমাণ করা যায় না। কারণ তুলনা করবার জন্য অনন্ত দুটি হয় না।

বিগ ব্যাং তত্ত্বে বলা হয়েছে, ১৫ বিলিয়ন বছর আগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছিল গ্যাসীয় শক্তির এক অতিকায় আধার। তারপর কোন কারণে বিস্ফোরিত হয়ে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। তারই ফলশ্রুতি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত হতে পারে না। কারণ তার সীমা আছে।

এই ঘটনার কারণ কিন্তু কৃষ্ণ গহ্বরের কেন্দ্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে। তার আকর্ষিত ভরণই এই বিস্ফোরণের কারণ। এই দুই ঘটনার মধ্যে পরস্পরের দূরত্ব থাকলেও এ দূরত্ব পরস্পরের সংযোগে ভরা। কারণ আগেই বলেছি, মহাবিশ্ব-শক্তি-কোষের কথা। এই কোষ সবার সঙ্গে সবার সংযোগ ঘটাচ্ছে।

যদিও আকর্ষণ বিকর্ষণের ক্ষমতা অনুযায়ী জ্যোতিষ্করা দূরে দূরে বাস করছে। ইনফ্রারেড উপগ্রহ যে ভেগা নক্ষত্র আবিষ্কার করে, তার মধ্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বেশি বলেই সূর্যের চেয়ে বেশি কিরণ দিতে পারছে। নক্ষত্রের মৃত্যুতে দেখা যায়, বাড়ি ভেঙে পড়ার মত ইলেকট্রন সহ সব বস্তু কেন্দ্রের দিকে ভেঙে পড়তে থাকে। তাদের পুঞ্জীভূত রূপই এই ভেগা নক্ষত্র। এই নক্ষত্রের মধ্যে আকর্ষণ-জনিত বিকর্ষণ চলতে থাকলে বিকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠে ইলেকট্রনের তেজস্ক্রিয়তার সংযোগে। ফলে আকর্ষণের চেয়ে বিকর্ষণ বেশি হওয়ায় সূর্যের শক্তির গতিকে হারিয়ে দিয়েছে। সেই গতি স্বাভাবিকভাবে বাইরে বেরিয়ে এসে সূর্যের চেয়েও প্রচণ্ড সংঘর্ষ চালাচ্ছে। কারণ বাইরের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রচণ্ডতা বা মৃদুতা নির্ভর করে তার চলার পরে। তাই ভেগা ছোট হয়েও সূর্যের চেয়ে বেশি আলো বিকিরণ করতে পারছে। কৃষ্ণ গহ্বরের পরিকল্পনা সার্থক করতে হলে এমনি উজ্জ্বল আলোক স্তম্ভকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। যদি কৃষ্ণ গহ্বরের মত না হয়ে সব কিছুতে স্বাভাবিক ভাবে কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ চলত, তবে এই আলোক স্তম্ভ সম্ভব হত না। আবার স্বাভাবিকতার মধ্যে এমনি ধরণের প্রচণ্ডতা না জন্মালে আপেক্ষিক শূন্যতার জন্ম হত না। সেই অশেষ নিরেট বস্তু ভেঙে অণু পরমাণুর সৃষ্টি হত না। সমস্ত চলা স্থির হয়ে যেত মহাবিশ্বশক্তি কোষের অভাবে। যেমন জল সংকীর্ণ পথে চালনা করলে যে শক্তি সৃষ্টি হয়, সে শক্তি সম্প্রসারিত পথে হয় না। সেই পথ থেকে সেই জলকে আবার সংকীর্ণ পথে চালনা করলে তীব্র শক্তি সৃষ্টি হয়। সংকীর্ণ পথের পূর্ণতা প্রসারিত পথে এসে শূন্যতা সৃষ্টি করছে। সৃষ্টির ধারার ফলে কঠিন পদার্থে পরমাণু ঘোরানোর রাস্তা হয়েই থাকে। জলে বা আকাশে ধারা পথ করে চললেও পথ মুছে যায়। তাই বলে তাদের পথহীন বলা যায় না। মহাকাশেও সবার সঙ্গে সবার যোগ সেই পথে হয়।

সাধারণ কেরোসিনের ল্যাম্পে যে আলো হয়, তার চেয়ে বেশি আলো হয় কেরোসিন তেলের পাম্প করা হ্যাজাকে। এখানে সাধারণ ল্যাম্পের সঙ্গে সূর্যের তুলনা করা যেতে পারে। আর হ্যাজাকের সঙ্গে ভেগা নক্ষত্রের তুলনা করা যেতে পারে। এই নক্ষত্রে পাম্পের কাজ করছে নক্ষত্রের মৃত্যুর ধারাবাহিক ইলেকট্রন ইত্যাদি কণারা। পরোক্ষে হলেও তার সরাসরি আওতা থেকে আমাদের সূর্য মুক্ত। তাই দীর্ঘ তরঙ্গ অসমভাবে বেশি মাত্রায় ইলেকট্রন মুক্ত করতে পারে না। সেই তরঙ্গ একসঙ্গে কয়েকটি ইলেকট্রনকে বেড় দেয়

বলে বেশি ইলেকট্রন মুক্ত করতে ব্যর্থ। ক্ষুদ্র তরঙ্গ এক একটি ইলেকট্রনকে আলাদা আলাদা ভাবে আঘাত করতে পারে বলেই সেই পর্যায়ের সংকীর্ণতায় শক্তি বেশি বিকিরণ করতে পারে।

প্রচণ্ড বিকিরণে ভেগা নক্ষত্রের চারদিকে প্রচুর পাথর ধূলিকণা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইগুলি তার গ্রহ উপগ্রহ এবং গ্রহাণু পুঞ্জের কাজ চালাচ্ছে। এই তেজের মধ্যে গ্রহ উপগ্রহ জন্মানো সম্ভব নয়। যে কোন গ্যাসের প্রচণ্ডতা প্রকাশ পায় সীমানার দিকে। কারণ বাষ্প বাইরে চাপ সৃষ্টি করতে চায় শূন্যতার প্রয়োজনে। তেমনি এক শক্তির সীমায় ভেগা শক্তিশালী। শ্রীমতী ন্যান্সি বোগার্স ঠিকই বলেছেন। তিনি বলেছেন, ঐ তারার বস্তুগুলির বিকিরণ এত বেশি যে, তার হিসাব পদার্থ বিজ্ঞানে দেওয়া সম্ভব নয়। এর রহস্য খুঁজতে হলে আর একজন আইনস্টাইনের প্রয়োজন হবে।

শ্রীমতী বোগার্স ঠিকই বলেছেন। গভীর রহস্যে যেতে হলে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞান সহ সব বিজ্ঞানকে জানতে হবে। সেখানে পদার্থ বিজ্ঞানের আইনস্টাইন হলে চলবে না। সব বিজ্ঞানের আইনস্টাইনকে দরকার হবে।

মিটমিটে প্রদীপের আলোর তেমন ফোর্স থাকে না। তাই সে বাইরের আবহাওয়াকে আকর্ষণ করতে পারে না বেশী। ফলে তাদের বহুমুখী চাঞ্চল্যের মধ্যে মৃদু আলো বিস্তার লাভ করে বেশি। তার টর্চের আলোর গতির মত তীব্র গতি হলে, পার্শ্বের বহুমুখী ধারা একমুখী হয়ে আলোর গতির চারদিকে ভিড় করত। আলোর সঙ্গে তার সংঘর্ষে আলো উজ্জ্বল হয়। পাশের ধারা একমুখী হওয়ায় অন্ধকার আরও গাঢ় হয়। কারণ ধারা বহুমুখী না হলে আলো সৃষ্টি হতে পারে না। আলোর গতি যত একমুখী তীব্র হবে পাশের অন্ধকার তত একমুখী তীব্র হবে। চোখেও তা আমরা স্পষ্ট অনুভব করি। আমাদের চোখেও তাই কালো মণির চারধারে সাদা রঙ দেখতে সাহায্য করে।

এই নীতি চিন্তার ক্ষেত্রেও খাটে। চিন্তার ধারা একমুখী হলে মনে চাঞ্চল্য কম থাকে। চিন্তার ধারা বহুমুখী হলে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত মাথাও গরম হয়ে ওঠে। আগুন সৃষ্টির মূল কথা তো এখানেই। মেরু প্রদেশে সূর্য ছাড়াই আলো দেখা যায়, যাকে মেরু জ্যোতি বলা হয়। মেরুর আকর্ষণের জন্য যেখানে সূর্যের আলো আছে সেদিকে ধারা একমুখী হতে পারে না। সেখানে বহুমুখী ধারা থাকায় মেরু জ্যোতি সৃষ্টি হয়। অবশ্য সূর্য যেখানে

দিন সৃষ্টি করে সেদিকে অন্তত্ম দিকের ধারা প্রবাহিত হয়। এই ধারা যাওয়ার ফলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, সেস্থানে মেরুর ধারা চলে আসে। মেরুর সে শূন্যস্থান পূর্ণ করে বহিরাকাশ। সূর্যের প্রভাবের জন্য বিষুব রেখার দিকে সে চুম্বকত্ব থাকে না। মেরু প্রদেশের চুম্বকত্বের কারণ এইটাই। দুই মেরু আকর্ষণে যা পাচ্ছে তা বিকর্ষণে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে না বহিরাকাশে। তা চলে আসছে পৃথিবীর নানা দিকে। ফলে তাদের আরও আকর্ষণ করতে হচ্ছে। ফলে তার সব সময় বেশি চুম্বকত্ব কাজ করছে।

সূর্য যখন পৃথিবীর দিকে আলো ছাড়ে, পৃথিবী তখন আলোকিত হয়। সেই সময় রকেটে চেপে মহাকাশে গেলে দেখা যাবে মহাকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এর কারণ কি? এর কারণ হল মহাকাশে সূর্যের ধারা একমুখী। তাই এত অন্ধকার। সেই ধারা পৃথিবীতে নেমে এলে পৃথিবীর বিকর্ষণী ধারার সংঘর্ষে আলো সৃষ্টি করে। আমেরিকায় যখন দিন, তখন সেখানে বহুমুখী ধারার সংঘর্ষ থাকে। ভারতবর্ষে তখন রাত হয় পৃথিবীর ধারা সূর্যের ধারার সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধাতে পারে না বলে। তারতে তখন প্রদীপ জেলে পৃথিবীর একমুখী ধারার সঙ্গে বহুমুখী সংঘর্ষে পরিণত করে আলোর কাজ চালাই। প্রদীপের আকর্ষণে বিকর্ষণে আলো ফোটে।

আকর্ষণ বিকর্ষণের তারতম্যে বস্তুর তারতম্য। কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ না থাকলে কোন বস্তুর স্থিতি থাকতে পারে না। বিকর্ষণ বেশি হলে বস্তু ক্ষয় হয় বেশি। তেল পুড়িয়ে ক্ষয় করে যে বিকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়, সেখানে অক্সিজেন এসে শক্তিকে উস্কিয়ে দিতে সাহায্য করে। সেই বিকর্ষণের দরুণ যে শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে, তাকে পূরণ করতে বাইরের ধারা নেমে এসে সংঘর্ষ চালায়। ফলে সৃষ্টি হয় আলো। তাই বিকর্ষণ বেশি হলে বস্তু ক্ষয় হয়। ফলে সংঘর্ষে আলো সৃষ্টি হয়। এমনি ধরণের সংঘর্ষ যে সব কণা রেখে যাচ্ছে তারা নিজের নিজের শ্রেণীতে ভাগ হয়ে নানা খনিজ ইত্যাদি সৃষ্টি করছে।

আকর্ষণ বেশি হলে বস্তুর পূরণ হয়। ফলে বিনা সংঘর্ষে অন্ধকার সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণ গহ্বর আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়। বস্তুর আকর্ষণ বিকর্ষণ সমান হলে বস্তু ক্ষয় রোধ হয়। আকর্ষণ বেশি হলে বস্তু পূরণ হয়। বিকর্ষণ বেশি হলে বস্তু ক্ষয় হয়। কৃষ্ণ গহ্বরের মত আকর্ষণের ধারা যখন প্রবল হয়, বিকর্ষণের অভাবে চোখে তা প্রতিফলিত হয় না। তাই চোখের দৃষ্টিও সেই আকর্ষণের গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। চোখের গতিকে সে হারিয়ে দিয়ে অন্ধকার

সৃষ্টি করে চলেছে। এই আকর্ষণের মধ্যে পতন শক্তি ও আকর্ষণ শক্তি এক সঙ্গে কাজ করছে। আলো ফোটানোর জন্য সংঘর্ষের কোন কারণ খুঁজে পাই না এখানে।

দশ

পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বন্ধুত্বের সম্পর্ক পদার্থ বিজ্ঞানের মত। নারীর সঙ্গে নারীর সম্পর্কও তাই। তবে সেখানে রসায়ন মৃদুভাবে কাজ করছে। নারীর সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক রসায়ন বিজ্ঞানের মত। সেখানেও পদার্থ বিজ্ঞান মৃদুভাবে কাজ করছে। রসায়ন বিজ্ঞানের গতি গভীরের দিকে, পদার্থ বিজ্ঞানের গতি প্রকাশ্যে। যে হেতু অন্তর ও বাহির কেন্দ্র ভিত্তিক, সেই হেতু রসায়ন ও পদার্থ সম্পর্ক যুক্ত।

প্রেমের মধ্যে বিজ্ঞান কি ভাবে কাজ করছে, তা প্রতিটি বৈজ্ঞানিক অনুধাবন করার সুযোগ পান। কিন্তু তাঁরা তা খতিয়ে দেখেন না। নারী স্থায়ীভাবে উন্মুখ হয়ে আছে. পুরুষের মধ্যে যা আছে তা পাওয়ার জন্য। পুরুষও তেমনি স্থায়ীভাবে উন্মুখ হয়ে আছে নারীর মধ্যে যা আছে তা পাওয়ার জন্য। শুষ্ক ঢেলা চায় জল, তেমনি জলও চায় শুষ্ক ঢেলাকে। এমনি ভাবে উভয় উভয়কে টানে।

চিন্তার ক্ষেত্রেও এমনি প্রতিটি মানুষের অভাব বা শুষ্কতাজনিত চাহিদা থাকে। যার জন্য মানুষ অস্থির হয়ে পরিপুরক কিছু খোঁজে। আইনস্টাইনের বাবা ভালবাসতেন জার্মানির শিলার, হাইনে বা গ্যেটের ধ্রুপদী সাহিত্য। মা ভালবাসতেন বেটোফেনের সঙ্গীত, কাকা ভালবাসতেন ব্যবসা। তাই এই তিন জনই আইনস্টাইনকে তিনভাবে প্রভাবিত করেন। বাবা হেরম্যান তাঁর মধ্যে সাহিত্য প্রীতি সৃষ্টি করেন, মা পলিন তাঁর মধ্যে সঙ্গীতপ্রীতি সৃষ্টি করেন ও কাকা জ্যাকব সৃষ্টি করেন বিজ্ঞানপ্রীতি।

তাঁদের বাড়িতে বাবা কাকার বন্ধুবান্ধবরা এলে গান ও সাহিত্য চর্চার আসর বসত। পরবর্তীকালে এসব তাঁর প্রিয় হলেও প্রথম জীবনে তেমন প্রিয় ছিল না। বরং তাঁর আকর্ষণ ছিল বাবা কাকার বিজ্ঞান সম্মত বিদ্যুৎ রাসায়নিক কাজের উপর। তাঁদের ছোট কারখানায় গিয়ে এসব দেখতেন। আর অবাক হয়ে কত কি ভাবতেন। সব তিনি ভাষায় ভালভাবে প্রকাশও করতে পারতেন না।

কারণ তিনি কথা বলতে শিখেছিলেন দেরিতে। এই কারণে স্কুল জীবনেও তাঁর তেমন বন্ধুবান্ধব ছিল না। তাছাড়া তিনি খেলাধুলাও তেমন পছন্দ করতেন না। তাঁর সহপাঠীরা তাঁকে ঘৃণা করত, তিনি ইহুদী ছিলেন বলে।

পরে একজন শিক্ষক তাঁর প্রতিভা বুঝতে পারলেন, তাঁর নাম হল রুয়েস। শেষে দেখা গেল তিনিও তাকে এড়িয়ে চলতে চাইতেন। তার কারণ আর কিছু নয়, আইনস্টাইন যা প্রশ্ন করতেন, তার সব উত্তর তিনি দিতে পারতেন না। আর অন্যান্য জার্মান তো তাঁকে ইহুদী বলে ঘৃণা করত। এই কারণে তাঁকে চাকুরিও দেওয়া হয়নি।

পরে সুইজারল্যাণ্ডের বার্নে সরকারী পেটেন্ট অফিসে একটা চাকুরি পান। তখন তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয় হাঙ্গেরীর খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাসী মিলেভামারিৎসের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে আইনস্টাইনের পরিচয় হয়েছিল জুরিখে থাকাকালীন এক গণিতের ক্লাসে। তার পূর্বে অবশ্য পরিচিত অধ্যাপক উন্টিলারের কন্যার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি বিনিময় হয়। অ্যারাউতে থাকাকালীন তাঁকে মনে মনে ভালবেসেছিলেন আইনস্টাইন। অবশ্য তারও আগে আরও একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলেন তিনি। তিনি হলেন তাঁর বোন এলসা। সেই বোনটি আবার তাঁরই গর্ভধারিনী জননী পলিনের সহোদরা মাসতুতো বোনের মেয়ে। সেদিক থেকে তিনি আবার আইনস্টাইনের আপন মাসতুতো বোন। তাঁর বাবার নাম ছিল রুডলফ। এই রুডলফ ছিলেন আবার আইনস্টাইনের এক কাকা। তাঁর এই কাকা এবং বাবারা ছিলেন খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই। সেদিক থেকে এলসা ছিলেন তাঁর খুড়তুতো বোন।

যা হোক মিলেভামারিৎসকে তিনি বিয়ে করলেন ঠিকই, কিন্তু সংসার চালানোর মত ক্ষমতা তাঁর ছিলনা। এর মূল কারণ শুধু পয়সার অনটনই নয়, সংসার বিষয়ে অনভিজ্ঞতা। ক্রমান্বয়ে তাঁর তত্ত্বের কেউ কেউ দাম দিলেও যেহেতু তা সংসারের কাজে লাগে না, সেই হেতু তাঁর স্ত্রী মিলেভা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। সংসারের সঙ্গে সেই তত্ত্বের সম্পর্ক থাকলে একক ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রয়োজনে হয়তো তা কাজে লাগত। আইনস্টাইন নিজেই একই সঙ্গে তত্ত্ব ও সংসারের উপযোগী হয়ে স্ত্রীর প্রিয় হতে পারতেন। আপেক্ষিকতাতত্ত্বের স্রষ্টা সেদিকেও অন্ধ ছিলেন। কোন তাত্ত্বিক যদি তাঁর তত্ত্ব নিয়ে একদিকে এগিয়ে যেতে থাকেন, সাধারণত তাতে তিনি সেই দিকে সফল হলেও আর সবদিকের সফলতা দাবি করতে পারেন না। একক ক্ষেত্রতত্ত্বে যেতে হলে দুই পা এগিয়ে

এক পা পিছিয়ে চিন্তা করতে করতে যেতে হবে এর প্রয়োজনীয়তা কতখানি। লক্ষ্য রাখতে হবে বস্তু দুটি হলেও এক কেন্দ্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কোথায়। এই চিন্তার মধ্যে ধরা দেয় আরও অনেক তত্ত্ব। এমনিভাবে তত্ত্ব যত মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, তত মুখ্য তত্ত্বের সার্বভৌমত্ব বাড়বে। নিজের চলার পথে যদি সংসার বাধা হয়, রাজনীতি বাধা হয় সার্বভৌমত্ব লাভ করা যায় না। এইসব সমস্যা আশীর্বাদ হিসাবে দেখা দিতে পারে মূলতত্ত্বের পক্ষে। একটা মানুষকে মূল কেন্দ্র ধরলে, তার শরীর মনের জন্য এসব দরকার হয়। এইসব সমস্যা দুই পা এগিয়ে এক পা পিছিয়ে চিন্তা করতে হবে।

সমস্যাকে তিনি ভয় করতেন বলেই কোন সমস্যার মোকাবেলা করতে পারেন নি। যার জন্য তাঁকে একটু আশ্রয়ের তাগিতে দেশে দেশে ঘুরতে হয়েছে। এই উদ্বাস্তু জীবন তার একক ক্ষেত্রতত্ত্বে পৌছানোর বাধা হয়েছিল। তার পরও অধিক সম্মানের হৈহুল্লোড় তাঁকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। তাঁর কাছে পৃথিবী আরও অনেককিছু আশা করতে পারত, তা সম্ভব হল না।

বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে জার্মানির বাইরে গেলেও আবার তিনি ফিরতে রাজি হলেন বারবার আমন্ত্রণে। বর্লিনে তিনি একটা সম্মানজনক পদ পাওয়ার আশ্বাস পেলেন। এই পদ নিতে তাঁর স্ত্রী মিলেভা বারণ করলেন, তবুও তিনি সেই বার্লিনে রওনা দিলেন। আইনস্টাইন তখন তাঁর স্ত্রী ও দুটি সন্তানকে ফেলেই বার্লিনে চলে এলেন। এর ফলে হয়ে যায় তাঁদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ। নানা সমস্যায় জর্জরিত আইনস্টাইন তখন তাঁর সন্তানদের কথাও চিন্তা করলেন না। একক ক্ষেত্রতত্ত্ব সত্ত্বেও সাধনার পথে এমনটি অনেকের ক্ষেত্রে হয়। সাধনা সমস্ত চিন্তা ভাবনাকে টেনে রাখে।

যে চিন্তাধারা মানুষকে বড় করে, সেই চিন্তার স্বর্গরাজ্যে যদি সমস্যার বেনো জল ঢোকে, তবে তা নিশ্চিত সাফল্যে পৌছাতে পারে না। তাই ছেলেবেলা থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত কখনও অর্থনৈতিক সমস্যা, কখনও রাজনৈতিক সমস্যা, কখনও সাম্প্রদায়িক সমস্যা, কখনও সাংসারিক সমস্যা তাঁকে কুরে কুরে খেয়েছে। যতই তিনি বনস্পতি হন, গোড়ার রস সরিয়ে নিলে বনস্পতিকেও ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যেতে হয়। যেখানেই তিনি গেছেন, সম্মান পেয়েছেন ঠিকই; সেই সম্মানের উন্নত মস্তক আবার নত হয়ে গিয়েছে, যখন খ্রীষ্টান জগৎ তাঁকে যীশুর শত্রু-বংশীয় বলে গালি দিয়েছে, যুদ্ধের সময় জার্মানের চর বলে গালি দিয়েছে। আবার কখনও কখনও সেই জার্মানিই তাঁকে স্থান দিতে চায় নি অনার্য বলে। তিনি আসলে

পাণ্ডিত্যে আর্য ছিলেন, সে জ্ঞান হিটলারের ছিল না। শ্রেষ্ঠতা অর্থে আর্য বোঝায়। শ্রেষ্ঠ জাতির ভেতর মূর্খ মানুষ কিন্তু অনার্য।

বার্লিনে তিনি এলেন, কিন্তু কোথাও তেমন আন্তরিকতা খুঁজে পেলেন না। তখন তাঁর বাসায় সেই আপন মাসতুতো বোন একদিন এলেন তাঁর দুটি কন্যা সঙ্গে নিয়ে আন্তরিকতা জানাতে। তিনি বললেন, তুমি থাকবে যখন নিজের বাসায়, তখন কি দরকার অন্যের বাসায় খেতে যাওয়া।

তুমি পর কাকে বলছ? তিনি তোমার বাবা হলেও, আমার তো কাকা। তাঁর বাসায় খাব তাতে আর বেশি কথা কি? আসলে আইনস্টাইনের তখনও আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। হঠাৎ জার্মানিতে এসে গুছিয়ে নিতে হলে আত্মীয় স্বজনের সহায়তা সবাই কামনা করে। জার্মানি তার জন্মভূমি হলেও, আগে কোন আত্মীয় স্বজনও তাঁকে তেমন চোখে দেখত না। তাঁর তত্ত্বকে সবাই ঠাট্টা করত। তাঁর ভাল হোক তাও কেউ তখন চাইত না। তবে এখন তাঁর খানিকটা দিন ফিরেছে। তাঁর নাম হয়েছে বলে কেউ কেউ নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়, অন্যদের কাছে তারা পরিচয় দেয়, অ্যালবার্ট আমাদের আত্মীয়। এ সব দেখে শুনে তিনি একটু হাসেন। তবে আর্থিক স্বচ্ছলতা এলে নিজের মত থাকবেন। তাই বোনকে বুঝিয়ে বললেন, একটু স্থিতি হলে এখানেই রান্নার ব্যবস্থা করব, এলসা। তবে রান্না করে দেবে কে? আমার এখন এই সমস্যা। বৌ কাছে থাকলে সে সমস্যা থাকত না।

তবু কিছুদিন তিনি এই ভাবে কাটাতে লাগলেন। ৫ নম্বর হ্যাবারল্যাণ্ড রাস্তার কাকার বাড়িতে খেয়ে এসে প্রুশিয়ান একাডেমিতে কাজ করতে যেতেন। নিজের স্ত্রী কন্যাদের ছেড়ে এসে নিজেকে বড় নিঃস্ব বলে মনে হতে লাগল। শূন্যতা মাত্রেরই যেন চৌম্বকত্ব আছে। তাঁর অজান্তে হলেও সেণ্টারিজমের এই নীতি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মানতে বাধ্য। তবে কি এলসাকে……

সে কথা চিন্তা করতেও লজ্জা হয়, ভয় হয়। সে তো বোন। সে দুটি মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়ে পড়ে আছে কাকার আশ্রয়ে। তার পেট ভরলেও জীবনের সাধ আহ্লাদ হয়তো মিটছে না। আর তার দুটি মেয়েরই বা কি উপায় হবে। যদি তার মেয়ে দুটি না থাকত, তবে একটা চিন্তা করা যেত। কিন্তু……

কিন্তু মেয়ে দুটির মা এলসাও তাঁকে ছাড়তে চান না। দাদার কাছে আসল কথা উহ্য রেখেও কাছে এলেন। প্রথম জীবনের গোপন প্রেম জ্বালাই হতে লাগল আবার। কিন্তু বাধা সৃষ্টি করতে লাগল ভাই বোন সম্পর্ক। আজ তাঁর

বিশ্বজোড়া নাম, তার মধ্যে অবৈধ কিছু ঘটলে মুখ দেখানো দায় হবে। ঘটেও গেল সেই অঘটন। আইনস্টাইন ও এলসা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হলেন। সজের দুটি মেয়েকে আইনস্টাইন আইনত পোষ্য হিসাবে নিলেন না, কিন্তু তারা অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের পদবী গ্রহণ করেছিল।

প্রথম স্ত্রীর মত এলসা স্বামীকে পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে না পারলেও অন্য সব বিষয়ে তিনি নজরে নজরে রাখতেন। এই দুই স্ত্রীর গুণ যদি একজনের মধ্যে থাকত তবে আপনভোলা আইনস্টাইন জীবনে আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারতেন। কিন্তু তা সম্ভব নয়। বিশেষ করে তাত্ত্বিক-বিজ্ঞানের আবিষ্কার বিজ্ঞানীর সুখ দুঃখ ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। কলমের নিব যদি তেমন না সরে, সে নিবে বেশি দূর লেখা যায় না। তাই প্রত্যেক সরকারের উচিত প্রতিভাকে চলতে সাহায্য করা, তার দিকে নজর দেওয়া। একটা পূর্ণাঙ্গ আলো সব দিক আলোকিত করতে পারে। তার এক অংশ যদি ঢেকে দেওয়া যায়, সে দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যায়।

সমাজের এই আবর্তে বিজ্ঞান আজ ধর্মের মত অলৌকিক কথা বলতে আরম্ভ করেছে। তারা মুখে বলে প্রমাণ ছাড়া বিজ্ঞান কোন কিছুকে স্বীকার করে না। আজ তা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে আবিষ্কারকে প্রমাণ করতে। তাই আগে ধর্ম ও বিজ্ঞানের উচিত নিজের নিজের গলদ দূর করা। তারপর উভয়ে উভয়ের দোষ ধরুক। আজ অলৌকিকতায় ধর্ম যেমন মানুষকে বিশ্বস্রষ্টা বানাচ্ছে, বিজ্ঞানও তেমনি কিছু অবাস্তবকে মেনে নিচ্ছে। এক্ষেত্রে উভয়ে এক। বিজ্ঞান আজ অদৃষ্টকে মানে। অদৃষ্টকে অর্থাৎ যাকে দেখা সম্ভব নয় তাকে মানে। তবে কেন তারা তাদের ঘৃণা করে যারা অদৃষ্টের উপর নিজের জীবন ছেড়ে দিয়েছে?

যা গড়া হয়েছে তার আশ্রয়দাতা হল অতীতকাল। যাকে গড়া চলছে তার আশ্রয়দাতা হল বর্তমানকাল। যাকে গড়া হবে তার আশ্রয়দাতা হল ভবিষ্যৎকাল। অতীত জীবনে নিজের জীবনকে গড়তে যে ভুল থেকে গিয়েছিল তা বোঝা গেল বর্তমানের জীবন সংগ্রামে। বর্তমানের চোখে সেই অতীতকালের ভুল অদৃষ্ট ছিল। বর্তমানেও যা ভুল হচ্ছে তা ধরা পড়বে ভবিষ্যৎ জীবন সংগ্রামের শেষে বার্দ্ধক্যে। এই ভুলের জন্য দায়ী অদৃষ্ট। দৃষ্টে বা দেখে করলে ভুল হত না। অদৃষ্টে কোন কিছু করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। কেউ এই ভুলের জন্য দায়ী করে ঈশ্বরকে, কেউ করে একটা শক্তিকে।

এই অসহায় অবস্থায় বিজ্ঞান ও ধর্ম বন্ধার সর্প ও নকুলের মত একস্থানে বাস করতে বাধ্য। কারণ একক ক্ষেত্রতত্ত্ব কারো মুখের কথা শোনে না।

বিজ্ঞান আজ বলছে, গতিকে অসীমভাবে বাড়ালে অতীতে ফিরে যাওয়া যায়। এখানে প্রশ্ন, কার গতি কোন দিকে বাড়ানো হবে? যার গতি বাড়ানো হবে, সে নিশ্চয় একটা কেন্দ্রভিত্তিক বস্তু। যার দিকে বাড়ানো হবে সেও এক কেন্দ্রভিত্তিক বস্তু। সময় যে এই দুয়ের মধ্যে বাঁধা পড়ে আছে। তা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। তা দর্শনের সত্য হলেও বিজ্ঞানের সত্য নয়। বিজ্ঞান যদি তাকে স্বীকার করে তবে ধর্মের অলৌকিকতাকে স্বীকার করতে হবে। প্রদীপের আলোকে মুষ্টি ভরে নিয়ে যাওয়া যায় না। তাকে নিয়ে যেতে হলে অনন্ত প্রদীপকে নিয়ে যেতে হবে। তেমনি সময়কে নিয়ে যাওয়া যায় না। বস্তুর সঙ্গে তাকে নিয়ে যেতে হয়। বস্তু কেন্দ্রভিত্তিক বলে অসীমতার গতি পেতে পারে না। যদিও সমস্ত বস্তুর সময়ের শৃঙ্খলে অনন্ত ভরে আছে। তাপ এক বস্তু থেকে আর এক বস্তুতে ধরে নেয়া যায়। আলো, সময় সেভাবে ধরে নেয়া যায়না। সে তাদের নিজের নিজের বস্তুতে থাকে। সেসব বস্তু শেষ হলে তারাও শেষ হয়। তাপকে এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে সরিয়ে আনা যায় গরম বস্তুর গায়ে ঠাণ্ডা বস্তু লাগিয়ে। তাতে কিন্তু গরম বস্তুর তাপ কমে যায়। এক আলো থেকে অন্য আলো জ্বাললে প্রথম আলোর আগুন কমে না। তাপ শক্তি তাই না বস্তু না আলো।

চিন্তা ভাব পারের শক্তি। মনের চিন্তায় গবেষণার দ্বারা অতীতকে বিচার করে দেখতে পায় ভবিষ্যৎকে বর্তমানে দাঁড়িয়ে। মানুষ কেন্দ্রভিত্তিক জীব হলেও, তার মনও কেন্দ্রভিত্তিক বস্তু বলে তার চিন্তার ভাবের কেন্দ্র থাকে না। নির্দিষ্ট দূরে সে চিন্তা লৌকিক হলেও অনির্দিষ্ট দূরে অলৌকিক। সেই অলৌকিক কথা হল অতীত পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া। অবশ্য অতীতকে ও ভবিষ্যৎকে বর্তমানের গবেষণা দ্বারা দেখা যেতে পারে।

চিন্তার নানা পার্থক্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন সব বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের ভেতর দিয়ে সত্যের প্রকাশ হতে হবে। আইনস্টাইনের মত হল, মানুষ নির্বিশেষে সত্যকে গ্রহণ করতে হবে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসাবে। এই দুই মতের কোন একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য হতে পারে না। প্রতিষ্ঠিত সত্য পেতে হলে দুইকে এক হতেই হবে। মানব দানবীয় প্রেম, বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক মূলত এক কেন্দ্রের নিয়ম থেকেই এসেছে। এই সত্যকে প্রকাশ করতে পারলে একক ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্ভবপর। আইনস্টাইনের সংসার

জীবন কিছুটা আলোচনা করা হল, তার সঙ্গে সূর্যের গ্রহ উপগ্রহ সংসারের যথেষ্ট মিল আছে। অথচ তিনি সূর্যের সংসারের দিকে চাইলেও নিজের সংসারের দিকে চাইতে নানা কারণে অক্ষম ছিলেন।

একদিকের প্রবল আকর্ষণ অন্য দিককে ভোঁতা করে দিয়েছিল। এই কারণে মানুষ একক ক্ষেত্র তত্ত্বের নির্বাণে যেতে পারে না। প্রত্যেকের নিজের নিজের এমন গতি আছে যে, সেখান থেকে তাকে নড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে। পরমাণু জগৎও এই নিয়মের বাইরে নয়। কোন ধাতুর উপর আলো ফেললে যে ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে যায়, তার গতি একই থাকে। আলোর প্রভেদে ইলেকট্রন কম বেশি বিচ্যুত হতে পারে, কিন্তু গতি তাদের একই থাকবে। তার কারণ আলো সেখানে ইলেক ন ছাড়িয়ে আনতে যতটুকু রসায়ন শক্তি দরকার ততটুকু শক্তি প্রয়োগ করল। তারপর ইলেকট্রন নিজের গতিতে চলে আবহাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে। আবহাওয়ার আপেক্ষিক শূন্যতায় চলতে থাকবে হাইড্রোজেন বেলুনের মত। কিন্তু হাইড্রোজেনে আর ক্লোরিন গ্যাসের মিশ্রণের কাছে আলো আনলে স্বাভাবিক গতি হারিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাবে। আইনস্টাইন এক্ষেত্রে বললেন, একটি অণু এক কোয়ান্টাম আলোকশক্তি শোষণ করলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিস্ফোরণ ঘটে। এখানে গতিশক্তি স্বাভাবিক গতিশক্তির পর নির্ভর না করে বিস্ফোরণে ভর করে ছুটে চলে। তখন স্বাভাবিক গতিশক্তি মন্থরতার জন্য বিরোধী শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। এই বিস্ফোরণ শক্তি এগুতে থাকে, তার ফলে পাশের আবহাওয়া চেপে এসে আঘাত সৃষ্টি করে বলেই বিস্ফোরণের শব্দ।

যে হাইড্রোজেন বেলুন আবহাওয়ার শূন্যতার তুলনায় হাল্কা হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে, বিস্ফোরণে সেই শূন্যতাকে আরও বাড়িয়ে দিলে আরও শূন্যতা সৃষ্টি হওয়ায় বাইরের আবহাওয়া আরও চাপ সৃষ্টি করে বিস্ফোরণ ঘটায়। পরমাণু বিস্ফোরণের শক্তি কতখানি হবে তা তার কেন্দ্রের উপর যেমন নির্ভর করে তেমনি আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। এই কারণে শক্তি তাই পৃথিবীতে একরকম চাঁদে আর একরকম। এখানে শক্তির হিসাব করতে হলে দুদিকেই নজর দিতে হবে।

কেন্দ্র ছাড়া শক্তি দাঁড়াতে পারে না বলেই পরমাণুর কেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটানোর দরুণ কেন্দ্র ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় বাইরের চাপ পরমাণুটাকেই কেন্দ্র করে ফেলে বিস্ফোরণে কোনকিছুকে বায়ুশূন্য করলে কেন্দ্র সৃষ্টির জন্য ভেতরে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। গ্যাস ভেতরের উত্তপ্ততায় ফাঁকা বস্তু যারা বাইরে চাপ সৃষ্টি

করলেও বেরিয়ে আসা বস্তুর স্থান পড়ে থাকে শূন্য হয়ে। সেই শূন্যতা ভরতে হলে ঠাণ্ডা অথবা ভারী বস্তু দরকার। সেই শূন্যস্থানে ভারী বস্তু ঢুকতে পারে না। ভারী বস্তুর সূক্ষ্মরূপ ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে যায়। এই ঠাণ্ডার সূক্ষ্মরূপ চুম্বকত্ব। আবার হাল্কা বস্তুর সূক্ষ্মরূপ উত্তাপ, উত্তাপের সূক্ষ্মরূপ বিকর্ষণ। এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের জন্ম কেন্দ্রে। তারাই স্থূল হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গড়েছে। তাদের শক্তিও এই আকর্ষণে বিকর্ষণে লুকিয়ে আছে। আকর্ষণে শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, বিকর্ষণে বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

আগুন জ্বাললে আমরা দেখি আলো বেরিয়ে আসছে। আসলে আগুন একটা স্তম্ভ। সেই স্তম্ভের ভেতর থেকে শক্তিরূপে বস্তু বেরিয়ে আসছে, যা জ্বালানী শক্তি থেকে বেরিয়ে আসছে। সেই শক্তি স্তম্ভের মধ্যে গ্যাস সৃষ্টি করে সাধ্য মত বেড়ে ওঠে। যে পর্যন্ত বেড়ে ওঠে কেন্দ্রকে ভিত্তি করে সেই পর্যন্ত দূরত্ব ঘিরে ফেলে নিউক্লিয়াসের মত। সেই ঘেরা স্তম্ভের মধ্যস্থান বাইরের তুলনায় আপেক্ষিক শূন্য। বাইরে চাপ আপেক্ষিক পূর্ণ। ভেতরের তপ্ত আপেক্ষিক শূন্যতা বাইরে বেরিয়ে আসে বলেই বাইরের ঠাণ্ডা আপেক্ষিক ভারিত্ব প্রবেশ করে শূন্যতা পূর্ণ করে। সেও আবার ভেতরে গিয়ে তাপে আপেক্ষিক শূন্য হয়ে বেরিয়ে আসে। তাই পূর্বে বলা হয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের কৃষ্ণগহ্বর দেখলেই ধরে নিতে হবে অন্যত্র কোথাও তার আলোক স্তম্ভ আছে। তার তেজ সূর্যকে হার মানিয়ে দেয়।

আগুনের স্তম্ভের ভেতর ঠাণ্ডা ধারা ঢুকে এক অংশ উত্তাপ হয়ে আবার বেরিয়ে আসে, অন্য অংশ আগুনের জ্বালানিতে অনুঘটকের মত আঘাত করে শক্তি বের করে আনে। যেমন অক্সিজেন আগুন জ্বালতে উস্কানী দেয়। সেই আঘাত করানোর কারণও কিন্তু আপেক্ষিক শূন্যতা। আলোর ক্ষেত্রে সেই শূন্যতা তেলকে বাষ্প করে আলোকে জ্বালিয়ে রাখতে সাহায্য করে। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের অক্সিজেন তাপে শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে আলোকে উস্কিয়ে দিতে থাকে। আবার ইলেকট্রিক বাল্বের কাঁচ ভেঙে দিলে হাওয়ার অক্সিজেনে কিন্তু তা আর জ্বলে না। সেই আলোর উপযোগী অনুঘটক চাই। তাই দেশলাই কাঠি জ্বেলে হাইড্রোজেনকে জ্বাললেও সেই আগুনে আর দেশলাই কাঠিকে জ্বালা যায় না। কারণ সেখানে অক্সিজেনের প্রবেশ নিষেধ। অক্সিজেনের অনুঘটকত্ব সেখানে পাল্টানো হয়েছে। আলোক স্তম্ভ যেমন হাওয়া টানে, কালো গহ্বর তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড টানে। তেমনি শক্তির জন্য আলো যেমন তেল টানে, তেমনি কালো

গহ্বর তার রসদ টানে। অবশ্য এরা যাদের টানে তারা অন্য অর্থে ধরা দেয়। তাদের সেই অভিমুখী গতির জোরে এবং ঐ লক্ষ্যের আপেক্ষিক শূন্যতায় চলতে থাকে।

প্রত্যেকের ভূমিকা সব সময় চলমান থাকে। সৃষ্টির মধ্যে কেউ বসে থাকলে সৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে যেত। জনগণের ভোট পেয়ে নেতা মন্ত্রী হয়। মন্ত্রী খাড়া করে দিলে জনগণের কাজ শেষ হয়ে যায় না। মালিক আর শ্রমিক এক হয় কারখানার কাজ নিয়ে। তাদের একপক্ষ অনড় প্রভাব বিস্তার করলে কারখানা চলে না বলেই দুইকে এক হতে হয় কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ চালাতে। শূন্যতা পূর্ণতার পার্থক্যের জন্য তাদের শিক্ষা আলাদা আলাদা হবে। মালিক ও শ্রমিক জনগণ থেকে ওঠে বলেই শিক্ষার দায়িত্ব জনগণের শিক্ষাবিদদের পরে রাখতে হয়। নইলে শুধুমাত্র সরকারী পার্টির শৃংখল পরাধীনতা আনতে বাধ্য। সে শিক্ষা বিজ্ঞান সম্মত হতে পারে না।

এই নিয়ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জনগণের মধ্যে যেমন সমস্যার কেন্দ্র আছে, বস্তুর ক্ষেত্রেও তেমনি আছে। সমস্যা মোকাবেলার জন্য নেতা যেমন কেন্দ্রভিত্তিক জনগণের বিকর্ষিত রূপ, তেমনি বস্তুরও বিকর্ষণ প্রয়োজন হয়। তাদের বিকর্ষণই সমাধান টেনে আনে আকর্ষণ হয়ে। সেই সমাধান প্রবেশ করে জনগণের কেন্দ্রে, জনগণ তা ভাগ করে নেয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতেও এমনি চলছে। এই শিক্ষাই নিরপেক্ষ শিক্ষা।

কেন্দ্রের দিকে সবাইকে যেতে হবে। কেন্দ্রের কাছে সবাই ছোট। বিরাট একটা পাহাড়ও চোখের ক্ষুদ্র কেন্দ্রে ধরা পড়ে। একটা কাঁচের বড় গোল পেপার ওয়েটেও ঐ পাহাড়ের ছায়া পড়বে, তবে সে ছায়া চোখের ছায়ার চেয়ে বড়। একটা কাঁচের পেপার ওয়েটে একটা জলন্ত বাঘের ছায়া দেখা যায়, সেখানে পাঁচটা পেপার ওয়েট রাখলে জলন্ত একটা বাঘ পাঁচটা পেপার ওয়েটে পাঁচটা বাঘ দেখা যাবে। মূল বাঘের সঙ্গে তাদের যোগ থাকলেও পরস্পরের সঙ্গে যোগ নাই। এখানে পরস্পরের মধ্যে ছোট বড়র আপেক্ষিকতা থাকলেও মূলের অঙ্কে আনা যায় না। এতগুলো প্রশ্নের সমাধান কেন্দ্র তত্ত্ব ছাড়া আপেক্ষিকতা তত্ত্বে সম্ভব নয়।

সূর্যের কেন্দ্রের কালো রঙ নানা ভুবনে হাল্কা হতে হতে বহু সব রঙ সৃষ্টি করেছে। তা শেষ হয়েছে রৌদ্রের সাদা রঙে। অর্থাৎ সেই সাদা রঙের মধ্যে সব রঙের বিশুদ্ধতা আছে বলেই সাদা। এই সাদায় হয় সূর্যের কেন্দ্রের চরম

প্রতিফলন সূর্যের বাইরের আবহাওয়ার সঙ্গে সংঘর্ষে। তাই সাদা রঙে যে কোন রঙের প্রভাব কম বলে সব রঙ তাতে ফোটে। কালো রঙে যে কোন রঙের প্রভাব বেশি বলে কোন রঙ তাতে ফোটে না।

সাদা রঙ হল আলোক স্তম্ভের আবরণ। বাইরের সঙ্গে যত সংঘর্ষ তাই এই সাদার উপর দিয়ে হয়। এই সাদার মধ্যে আলোর চেয়ে ভারী ধারা ভেদ করে যেতে পারে, কিন্তু আলো পারে না তার আলো প্রতিফলনের ক্ষমতার জন্য। তাই টর্চের বাটিতে উজ্জ্বল সাদা আবরণ থাকায় আলো প্রতিফলিত করতে পারে যতখানি, অন্য রঙ তা পারে না। এই সব কারণে সূর্যের আকর্ষণে আলোক কণিকার চেয়ে ভারী ধারা সূর্যে ঢোকে, আবার সূর্য থেকে আলোক-কণিকার স্থূল ধারা হাল্কা হতে হতে সাদার স্তরে এসে প্রতিফলিত হয়। সাদার প্রতিফলিত ক্ষমতা এত বেশি যে, তার দিকে অন্য আলো যেতে চায় না। অতি উজ্জ্বল তীব্র আলোর দিকে কোন রঙের আলো এগুতে পারে না তাদের রঙের স্থূলতার জন্য। সাদা রঙের কণা সূক্ষ্ম হলেও তীব্রতার জোরে অন্য রঙদের পিছিয়ে দেয়। সাদা অন্য রঙ ঢাকতে পারে না কিন্তু সাদা কাগজে অন্যান্য রঙ ভাল ফোটে। কালো রঙ অন্যান্য রঙকে চুরি করতে পারে না কিন্তু সে সব রঙকে ঢাকা দিতে পারে। তারা কালোকে ভেদ করতে পারে না। সূর্যের কেন্দ্রে যদি রামধনুর সাতটা রঙকে চেপে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে তারা গাঢ় হতে হতে কালো হয়ে যাবে।

একটা ছবি আঁকতেও তাই অতি গভীরতা বোঝাতে কালো রঙ ব্যবহার করা হয়। সেই গভীরতা থেকে অতি উচ্চতা বোঝাতে সাদা রঙ ব্যবহার করা হয়। গোলাকার চোখের কালো মণির দিক উঁচু হলেও চারদিকের নিচু অংশের সাদা রঙকে যেন তার থেকে উঁচু দেখায়। এর কারণ মণির কালো রঙের চেয়ে চারধারের সাদা রঙ উজ্জ্বল,বেশি। দ্রষ্টব্য বস্তুর ছায়া তাই চোখের মণিতে ছোট হয়ে পড়ে। বিরাট পাহাড়ের ছায়াও চোখের মণির চারদিকের সাদার প্রতিফলনে কালোর পরে ছোট হয়ে নেমে আসে। এই সাদা প্রতিফলক এখানে টর্চের উজ্জ্বল বাটির মত পাচিলের কাজ করে।

পাঁচটা কাচের গোল পেপার ওয়েটের পরে একটা বাঘের আলোতে পাঁচটা বাঘ দেখা যায়। আলো সব সময় উঁচু রিসিভারে ধরা দেয়। পাঁচটি পেপার ওয়েটের পাঁচটি উঁচু রিসিভারে এক আলো পাঁচটি আলো হয়েছে। একটা পেপার ওয়েট থাকলে একটা আলোই দেখা যেত। প্রতিটি এই গোল বস্তুর উচ্চতার উজ্জ্বলতা যে ছটা সৃষ্টি করে, সেই ছটার শূন্যতায় বাঘের ছায়া ধরা পড়ে।

এখানে প্রতিটি পেপার ওয়েটের উঁচু উজ্জ্বল স্থানের চারধারে পাঁচিলের কাজ করেছে আপেক্ষিক অন্ধকার। পূর্বে বলেছি চোখের বেলায় পাঁচিলের কাজ করে আপেক্ষিক সাদা উজ্জ্বলতা। তাই আলোর তেজের জন্য সূর্যকে আমরা দেখতে পাই না। কালো অন্ধকারের দিকে আলোর গতি বেশি। চোখের মণির কালোতে তাই অন্ধতা এনে দেয়। কাঁচের বলে হল তার উল্টোটা। আলো আমাদের চোখকে চালনা করে বলে দেখতে পাই। সেই আলো চোখে চেপে এলে দেখতে পাই না। এই নিয়ম মেনেই এক ট্রান্সমিটারের তরঙ্গ বহু রেডিওর রিসিভারে সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়ে। বেগে ট্রান্সমিটারের প্রসারিত স্তম্ভ ভেদ করে ঢোকে। জলের পরে কোন বাড়ির ছায়া আলোর প্রতিফলনের স্তম্ভ ভেদ করে চরম ঢোকে বলে বাড়ি উল্টো দেখায়। কারণ প্রতিফলনে কোন রঙের ছায়া ভেসে থাকতে পারে না। ভেসে থাকা প্রতিফলন আমাদের দৃষ্টিকে বাধা দেয়। সেই বাঁধা থেকে ডুবে থাকা বাড়ির ছায়ার দূরত্ব জল থেকে বাড়ির দূরত্বের সমান।

চোখের বলের কালো অংশ বাইরের দৃশ্যের সব চেয়ে কাছে থাকায় সব রঙ সেখানেই আগে ধরা পড়ে। সব রঙকে সেই কালো মণি টানতে পারে মনের উত্থানিতে। তার চারধারের সাদা অংশ টর্চের চকচকে সাদা বাটির মত কাজ করে। কোন বস্তুকে চোখের কাছে আনলে চোখের অনেক বেশি স্থানকে ঢেকে ফেলে বলে অনেক বড় দেখায়। একেবারে কাছে আনলে চোখের সাদা অংশ আর তাকে আয়ত্বে আনতে পারে না। সেই বস্তুটিকে যত দূরে নিয়ে যাওয়া যায়, গোলাকার চোখের বলের তত সামান্য অংশ তার মুখোমুখী হয়। বাইরের যোগাযোগে চোখের জ্যোতি তো ফোয়ারার মত ক্রম প্রসারতায় চলতে থাকে। বস্তুটিকে যত দূরে নিয়ে যাওয়া হয় তত সে ফোয়ারার অল্প ধারার সংস্পর্শে আসতে থাকে। সেই ধারা কটির উৎস চোখের অতি সামান্য অংশ। দৃষ্টির ধারা ক্রম প্রসারিত বলে বস্তুর সংস্পর্শ থেকে ধারা যত কমতে থাকে উৎসের স্থান তখন অত্যধিক কমতে থাকে। পরে বস্তুটি আরও দূরে চলে গেলে সেই ধারার সংস্পর্শ আর থাকে না, চোখের উৎসেরও আর ভূমিকা থাকে না। তখনও মনের ভূমিকা থাকে। সেই দেখা তখন মনের দেখা হয়। এমনিভাবে সব ইন্দ্রিয় মনে বাঁধা থাকে।

বস্তু সব সময় ভারী, ভাব সব সময় হাল্কা। মন সংসারের ভারিত্বে মজলে অনেক আদর্শের কথা ভুলে যায়। আদর্শের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যকে সে ভালবাসলেও

সংসারের চাপে সে চুক্তি করে। যদিও সাধু ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম থাকলেও, অধিক সংখ্যক অন্যান্য লোকের কাছে এই ঘটনা সত্য। সাধু ব্যক্তির পক্ষে সংসার বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব বলে আদর্শের দিক ভারী থাকে। তাই সবাইকে আদর্শবাদী করতে হলে সংসারের পথ ধরে আদর্শবাদী করতে হবে। নইলে বড় বড় মহাপুরুষের আমরা মর্যাদা দিতে পারব না। এই বিষয়ে জানতে হলে পড়তে হবে বর্তমান লেখকের "দলাদিষ্ট রাজনীতি বনাম ভোটোত্থিত গণনীতি" পুস্তকখানি।

এগারো

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র ঘটনাকে একটি সূত্রে বাঁধতে না পারলে পদে পদে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। ধরা যাক সূর্যের তুলনায় পৃথিবী ছোট বলেই সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে। সেই কারণে পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্র ঘুরছে। এখানে পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে কেন্দ্র ভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণে একটা গতি সৃষ্টি হয়েছে। আকর্ষণে উভয় উভয়কে টেনে রেখেছে, বিকর্ষণে উভয় উভয়কে ঠেলে রেখেছে, যাতে চন্দ্র পৃথিবীর মাটিতে এসে না পড়ে। এই সৌরজগতে যত উপগ্রহ পরস্পর জড়িয়ে আছে তারাও আবার সূর্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পরমাণুর মত।

সূর্যের তুলনায় পৃথিবী যত ছোট পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্র তত ছোট, গ্রহাণুপুঞ্জের একটা টুকরো এত ছোট যে সূর্যের সঙ্গে সেই ধরনের কোন তুলনা হয় না। তবু তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী স্থানে থেকে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে। তার কারণ তারা পরস্পরে আকর্ষণ বিকর্ষণে এমনভাবে একতাবদ্ধ যে, তাদের সমগ্রের গতি সূর্যের গ্রহের উপযোগী হয়ে আছে।

গ্রহ যেমন সূর্যের চারদিকে ঘোরে, সূর্য তেমনি কার চারদিকে ঘোরে? গ্রহাণুপুঞ্জই শিক্ষা দেয় সূর্যের মহা সূর্য না থাকলেও মহাকাশের সঙ্ঘবদ্ধতায় ছায়াপথে কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে। সূর্যের আকর্ষণ বিকর্ষণের গুণ তো তার কেন্দ্রের জন্য। বহু সূর্যের সমন্বয়ে গঠিত এক একটা ছায়াপথই এক একটা মহাগ্রহাণুপুঞ্জ হয়ে আছে। তার চরিত্র মহাসূর্যের মত।

সৃষ্টিতে ছোট-বড় যে যেখানে থাকুক, প্রত্যেকে কেন্দ্রায়ণে বা কেন্দ্রবাদে ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে। যদি কোথাও বিস্ফোরণে অনিয়ম ঘটে, সমগ্রের

নিয়মে তা পুষিয়ে যায়। কত ভিখারী না খেয়ে আছে। তাদের খাদ্য কি তার ফলে বেশি থেকে যাচ্ছে? তা যাচ্ছে না। অন্যে বেশি খেয়ে তা সমান রেখেছে। যাকে আমরা ত্যাগী ভক্ত বলি, সে এই ত্যাগের বিনিময়ে ঈশ্বর ধারণায় ভরে আছে। যাকে আমরা ভোগী বলি, সে পার্থিব বস্তুতে নিজেকে ভরে রেখেছে বলে ভগবানের ধারণাকে স্থান দিতে পারছে না। ভিখারী না খেয়ে যেমন মরে, ধনী খেয়েও তেমনি মরে।

খোঁজ নিলে দেখা যাবে সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় থাকছে। কারো একটা জিনিস হারিয়ে গেলে, মালিক না পেলেও বস্তুটি কোথাও না কোথাও আছে। উল্টে বলা যায় বস্তুটি যেখানে আছে সেখান থেকে মালিক হারিয়ে গিয়েছে। হারানো বস্তুটকে তাই পেতে হলে মালিককেও হারিয়ে যেতে হবে। একটা বস্তুকে কোথাও রেখে খুঁজে বেড়ানো মানেই নিজেকে বস্তু থেকে হারিয়ে ফেলা। সেই স্থানটির কথা মনে থাকলে হারানোর কোন প্রশ্ন উঠত না। এই মন কিন্তু নিজের সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ রাখে। এই মনের সৃষ্টি হয়েছে শরীর কেন্দ্র থেকে বা আত্মা থেকে। বৈজ্ঞানিক যদি নিজেদের আত্মকথা লিখতে পারেন, তখন নিশ্চয় আত্মাকে স্বীকার করবেন ধার্মিকের মত। এই আত্মাই হল প্রকৃত ঠিকানা। আমাদের এই সব আত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত। একথা বৈজ্ঞানিকও মানবেন, ধার্মিকও মানবেন। এই ঠিকানা থেকে কারো হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। এই ঠিকানাই ব্যক্তিত্বের উৎস।

সব কিছু মিলিয়ে অনন্তের কেন্দ্র ভিত্তিক আকার। অনন্তের সঙ্গে যে সবার কেন্দ্রভিত্তিক সম্বন্ধ আছে, তা জানতে পারলে মানুষ মরেও হারিয়ে যায় না। কারণ তখন আর তার ক্ষুদ্র জীবন থাকে না। সে জীবন মরলে অনন্তের পঞ্চভূতে মিশে থাকে। এই ঠিকানার পথ ধরে বহু দূরে নজর রেখে চললে ব্যক্তিগত মৃত্যুর কথা মনে থাকে না। তাই মৃত্যুর ভয়ও থাকে না। সাধারণ পরীক্ষায় দেখা যায়, যে দূরের বস্তু খুঁজছে, সে কাছের বস্তুর দিকে নজর দিতে পারে না। দেখার অন্তরমধ্যে বই পড়তে আলোর দরকার হয়। কিন্তু বিরাট সূর্যকে দেখতে আলোর কি প্রয়োজন?

আইনস্টাইন দূরের দিকে চেয়েছিলেন বলে, নিজের সংসার ঠিকমত চালাতে পারেন নি। তবে সাধারণের জন্য কিছু বলতে গেলে কাছেও একটু তাকাতে হয়। তাই দূর এবং কাছকে এক নিয়মে না ফেললে একক ক্ষেত্র তত্ত্ব সম্ভব হতে পারে না। অনেকে চোখ খারাপ হলে দূরে দেখে, কিন্তু সে কাছের কিছু দেখতে

পায় না। কেউ আবার কাছে দেখতে পায় কিন্তু দূরে দেখতে পায় না। কোন কোন জীব আবার রাতে দেখতে পায় কিন্তু দিনে দেখতে পায় না। এই দেখা না দেখা সমস্তই নির্ভর করছে চোখের এবং বাইরের যোগাযোগের উপর।

অনেকে দৃষ্টির দুর্বলতার জন্য কোন রকমে কাছে দেখতে পায়। সে শক্তি দূর পর্যন্ত যায় না। শারীরিক দুর্বলতায় মনও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই মনের ইচ্ছা প্রবল থাকলে দূরে দেখার জন্য চোখের স্ফীতি হয়। তাতে কুচকানো ভাব কেটে যাওয়ায় চোখ উজ্জ্বল হয়। সে কারণে দূরে দেখতে পায়। কাছে দেখতে গেলে সংকোচনের জন্য চোখের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায় বলে কাছে দেখতে পায় না। রাতকানারা দিনে দেখতে পাওয়ার কারণ, দিনের আলোজনিত দুর্বল চোখের স্ফীতি। রাতের আলো তার পক্ষে দেখার উপযোগী নয়। দিনকানাদের চোখে দিনের আলো সূর্য দেখার মত অন্ধকার আনে। কিন্তু রাতের চুইয়ে আসা আলোকের নিম্নমানের শক্তি তার দৃষ্টিকে চালিত করতে পারে।

এই নানা ধরণের দেখা মানুষের মনকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে। গরুর দুধ গরুর বাঁট থেকে পেলেও তার কারণ লুকিয়ে আছে তার সারা শরীরে। সারা শরীরের পুষ্টতা অপুষ্টতার কারণ লুকিয়ে আছে শরীরকেন্দ্রে অর্থাৎ পাকস্থলীতে। সর্বক্ষেত্রেই কেন্দ্রবাদ কাজ করছে।

গুড় দেখলেই মিষ্টত্ব বোঝা যায় না। তাকে খাওয়ার কাজে লাগালে মিষ্টত্ব বোঝা যাবে। তেমনি মগজ বড় হলেই বুদ্ধি বেশি হয় না, তার সঙ্গে শরীরের সম্বন্ধ বড় কথা। সে কি ভাবে কাজ করছে তার উপর নির্ভর করে তার মেধা। শরীরের স্বাভাবিকতা মেধাকে ঠিক মত কাজে লাগাতে পারে। আবার এমনও দেখা যায়, কোন অসুখের কারণে মেধার জড়ত্ব কেটে গিয়েছে। দেখা যায় তার ফলে সে প্রতিভাশালী ব্যক্তি হয়ে উঠেছে। কাজেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে জানতে হলে, তার একটা ছোট অঙ্গকে নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। সারা শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ খুঁজে বের করতে হবে কেন্দ্রের পথে।

কুস্তি করতে গিয়ে শুধু শরীরের বলে জেতা যায় না। তার সঙ্গে মনের বল ও কসরৎ চাই। সেখানে শক্তিকে প্রয়োগ করাই বড় কথা। একটা মল্ল যোদ্ধাকে জানতে না দিয়ে পেছন দিক থেকে এসে একটা ঠেলা দিয়ে সহজে ফেলে দেওয়া যায়। সে সামনাসামনি এলে ফেলে দেওয়া যায় না। কারণ, তখন তার শক্তিকে চালনা করে মন ও বুদ্ধির কসরৎ। মনে বল না থাকলে বিরাট জোয়ানও আকস্মিক চিৎকারে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

আধুনিক নিউরো সায়েন্স বলছে, কোন বিশেষ রোগ মস্তিষ্কে অসাধারণ কিছু বিক্রিয়া ঘটিয়ে মানুষকে জিনিয়াস করে তুলতে পারে। ভ্যান গয়ের যদি এপিলেপসি না হত, তবে হয়তো তাঁর তুলিতে অমন ক্লেদ ফুটে উঠত না। আবার সেই রোগেই তিনি ৩৭ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন। এই সব নিয়ে আই কিউ বা ইনটেলিজেন্স কোশেন্ট পদ্ধতিতে অনেক বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেখানে নিউরন ও প্রোটিন থেকে মন নামক বিমূর্ত বস্তুটিকে ব্যাখ্যা করা হয়।

জার্মান মনস্তত্ত্ববিদ উইলিয়াম স্টার্নের পদ্ধতি অনুসারে আই কিউ ১০০ হলে মানুষ মাঝারি বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। ১৩০ থেকে ১৪০ হলে মানুষ প্রতিভাবান হতে পারে। এই আই কিউ যদি ৭০-এর নিচে থাকে, তবে তার অধিকারী মানসিক প্রতিবন্ধী হয়। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোক ৯০ থেকে ১১০ আই কিউয়ের মধ্যে থাকে। শতকরা ২ ভাগের আই কিউ ৭০-এর নিচে, শতকরা ১৪ ভাগের আই কিউ ৭০ থেকে ৮৪ এর মধ্যে, অবশিষ্ট ২ ভাগের আই কিউ ১৩০ এর উপর। যারা ইন্টেলেকচুয়াল সুপীরীয়র তাদের আই কিউ ১২০ থেকে ১৩০-এর মধ্যে থাকে। ১৩০-এর উপরে আই কিউ হলে ইন্টেলেকচুয়ালি ভেরি সুপীরীয়র।

ঐই নিয়ম লঙ্ঘন করেছে আইনস্টাইনের আই কিউ, শকুন্তলা দেবীর আই কিউ। তাঁদের আই কিউ বেশি ছিল না। এই শকুন্তলা দেবী মুখে মুখেই অনেক জটিল অঙ্কের সমাধান করে দিতে পারতেন। আইনস্টাইন মাত্র ১০৪ আই কিউ নিয়ে বিজ্ঞানে বিশ্ব জয় করে গেছেন। অথচ দেখা যায়, যাঁরা প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের আই কিউ ১১২, করণিক ও খুচরা দোকানদারের আই কিউ ১০৯। আবার দেখা গিয়েছে যারা ফুটপাতের হকার, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী তাঁদের আই কিউ আইনস্টাইনের মত অর্থাৎ ১০৪। চাষীর আই কিউ ৯৫ থেকে ৯৭, জোতদারের আই কিউ ৯৮। বিদেশের ছাত্রদের পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ১৪০ আই কিউ নিয়েও পরীক্ষায় সফল হতে পারে নি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রতিভার মূলসূত্র মস্তিষ্কে নাই। এই প্রতিভার মূল সূত্র আছে শরীরের কেন্দ্রভিত্তিক ব্যালান্সে। শরীর যদি দুর্বল হয়, মস্তিষ্কও দুর্বল হবে। কান যেমন শোনার পথ, চোখ যেমন দেখার পথ তেমনি মস্তিষ্ক ধীশক্তির পথ। এই পথগুলোর অস্তিত্ব যখন আছে, তখন ধরে নিতে হবে তারা কোথাও থেকে শুরু হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে যখন সম্বন্ধ আছে, তখন ধরে নিতে হবে তারা একই কেন্দ্র থেকে এসেছে।

একটা কাজ করতে শরীরের সব যন্ত্রের অল্প বিস্তর ভূমিকা যেমন আছে,

যেখানে কাজ করা হয় তাদের ভূমিকা তেমনি আছে। বিজ্ঞান যতদিন এই চিন্তাধারায় না আসবে, ততদিন বিজ্ঞান অসীমের কথা বললেও ধর্মের মত গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকবে। বুদ্ধি সফল হতে পারে না তার সঙ্গে প্রযুক্তি না থাকলে। এই দুইকে দাঁড়াতে হবে হৃদয়ের ভিত্তির উপর। সেখানে আই কিউ, চতুর্থ মাত্রা মার খেয়ে যাবে।

আইনস্টাইনের চিন্তায় পারমাণবিক শক্তি প্রথম উঁকি মেরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তা অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা লুফে নিয়ে পারমাণবিক বোমা তৈরি করে ফেললেন। দেখা গেল অন্তরের চিন্তা বাইরের প্রযুক্তিতে হিংস্র হয়ে উঠল। তবুও তার কল্যাণের দিক আছে। সেই কল্যাণের দিকে মানুষ তেমনি না ঝুঁকে মানুষ মারার কাজে লাগানো হচ্ছে বেশী। আইনস্টাইন তা বহু চেষ্টা করেও থামাতে পারেন নি। এই মানুষ মারার কাজে বিজ্ঞান ও ধর্ম দুই ই এগিয়ে এসেছে। বিজ্ঞানীর চিন্তা প্রযুক্তি খাটাচ্ছে, ধার্মিকের চিন্তা টাকা খাটাচ্ছে।

পরমাণু অস্ত্র ব্যবসায়ী দেশগুলোতে যীশুর অহিংস ধার্মিকরা আদর্শ হারিয়ে অস্ত্রের প্রকল্পে টাকা খাটাচ্ছে। আবার তারাই বাইবেল পড়ে যীশুর দুঃখে কাঁদছে। বৈজ্ঞানিকরা যা-ই বলুন না কেন জগতে এই ধরনের ধার্মিকের সংখ্যা তাঁদের তুলনায় অনেক বেশি। তাদের প্রভাবও বেশি। এই ধর্মের স্বনামে ও বেনামে পৃথিবীর অধিকাংশ রাজনীতি পরিচালিত হচ্ছে। তাই তাদের হাতেই তাদের জন্যে পরিচালিত হচ্ছে বিজ্ঞান। মুখে তাই বিজ্ঞানীদের যতই ধর্ম-বিরোধী কথা বের হোক না কেন তারা ধর্মের কারাগারে বন্দী। মুর্গী যতই স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াক তার সুস্বাদু মাংস রক্ষকের পেটে যাবেই। বৈজ্ঞানিকরা তেমনি ভাবে অদৃশ্য বন্ধনে বন্দী হয়ে আছেন। তাঁদের ধর্মবিরোধী কথায় ধার্মিকের হাসির উদ্রেক হয় মাত্র।

তাই এখনই বিজ্ঞানীদের উচিত ধর্মের মধ্যে ঢুকে তাদের বৈজ্ঞানিক দিককে তুলে ধরে জনগণের মধ্যে প্রচারে নামা। কারণ, জনগণ যেদিকে, শক্তি সেই দিকে। জনগণ অমর। তাই তাদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের আকর্ষণ বিকর্ষণ না চালাতে পারলে বন্ধন দশা ঘুচবে না, অমরত্ব লাভও হবে না। অমরত্ব লাভ হলে দেবত্ব লাভ হয়। কারণ কল্যাণজনিত জনগণের স্বীকৃত অমরত্ব ব্যক্তিকে দেবত্ব দেয়। মানুষের শোষণের পয়সায় ধনী হয়ে স্বর্গ গড়লে সে স্থূল স্বর্গ জনগণ দানবের মত ভেঙে দেবে। তাদের এই বিপ্লবকে ধর্ম শাস্ত্রে ঘৃণা করলেও এবং কোন তরবারি মারলেও সে রক্তবীজদের শেষ করা যায় না।

শরীরের পতন হবেই, যেহেতু আমাদের শরীরে কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণের জীর্ণতা চলছে। আবার এই জীর্ণতা না হলে বেঁচে থাকার শক্তি উৎপাদিত হয় না। শক্তির আনন্দ উল্লাসিত হয় না। তবে শরীরের পতনের বিনিময়ে আনন্দ চাইব কেন? সেখানে আমি প্রশ্ন করব, মৃত্যু জেনেও আনন্দের জন্য মানুষ নেশা করে শরীরের পতন ঘটায় কেন? নেশায় রোগ এলে কেমন হয় এই আনন্দ? বস্তু যেমন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, যন্ত্রণা তেমনি আনন্দে রূপান্তরিত হয়। শক্তি যেমন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, আনন্দ তেমনি যন্ত্রণায় রূপান্তরিত হয়।

এই আনন্দ রুখতে আমাদের সেই জনগণের সেবার আনন্দে যেতে হবে। সেই আনন্দ মানুষের জীবনকে দীর্ঘ করে। সেই জীবনের মৃত্যু হলেও জনগণ তাঁর গুণ কীর্তনে তাঁকে চিরস্মরণীয় করে তুলবে। এই অমরত্ব কি নেশা ভাঙের আনন্দে পাওয়া যায়?

স্থূলতার একটা সীমায় মৃত্যু, সূক্ষ্মতার সীমায় জীবন। স্থূল ভোঁতা অস্ত্রে কাটলে শরীরে অশেষ যন্ত্রণা হয়। নতুন ব্লেড কাটলে প্রথমে বোঝা না গেলেও পরে জ্বালা করে। এই সূক্ষ্মতার ধার যত বাড়ানো যায়, ততই সে যন্ত্রণা না দিয়ে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। সূঁচের ক্ষেত্রেও তাই। আমরা আবহাওয়া থেকে যে সূঁচের চেয়েও সহস্র গুণ সরু ধারা গ্রহণ বর্জন করি, তার জন্য আমরা যন্ত্রণা অনুভব করি না। সেই ধারা আমাদের জরাজীর্ণ করে বার্ধক্য আনলেও দীর্ঘ জীবন আনে। আবার নিশ্বাস প্রশ্বাস না হলে তো আমরা বাঁচতে পারি না।

এই নিশ্বাস প্রশ্বাসের নাচন আমাদের আনন্দময় ছন্দের কবিতার নাচন সৃষ্টি করে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেও এই নাচন চলছে। তাই আমরা ছন্দের কবিতা ভালবাসি, ছন্দের গান ভালবাসি, বাজনা ভালবাসি ইত্যাদি। প্রেমিক প্রেমিকার পরস্পরের হৃদয় বিনিময়ের ছন্দ ভালবাসি। অর্থাৎ তরঙ্গ ভালবাসি। আলোর তরঙ্গ, বায়ুর তরঙ্গ, শব্দের তরঙ্গ ইত্যাদি আনন্দেরই স্রষ্টা। এখানে ছন্দপতন হলে নিরানন্দজনিত মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

সূর্যের কেন্দ্রে যে আকর্ষণ বিকর্ষণের তরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে, তার জন্য গ্রহরা তরঙ্গায়িত। আমরাও তরঙ্গায়িত। আকর্ষণে সে যখন নিচ্ছে, ফেঁপে উঠছে। বিকর্ষণে যখন ছাড়ছে সংকুচিত হচ্ছে আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসজনিত শরীরের মত। বিকর্ষণে যতদূর প্রভাব ছাড়ছে, ততদূর পর্যন্ত বিরোধী ধারাকে ঠেকে

নিয়ে আবার ঠেলে দিচ্ছে। আবার আবর্ষণের সময় তারা ফিরে আসে। এইভাবে সূর্যের চারদিকে স্তর সৃষ্টি হয়েছে। তার একটু রূপ হিসাবে আমরা সাত রঙের স্তরের রামধনু দেখতে পাই। পৃথিবীর গভীরেও তেমনি মাটির নানা স্তর দেখতে পাই।

আমরা স্থূল বস্তু ভাত বেশি খেতে পারি না। তার একটা সীমা আছে। কিন্তু আমরা নাকে সব সময় বায়ু গ্রহণ করছি আর ছাড়ছি। তার কিন্তু সীমা পরিসীমা নাই। এ সবই সূক্ষ্মতার জন্য সম্ভব হয়। এই সূক্ষ্ম ধারা আমাদের নাকে, কানে, লোমকূপে, শিরায়-শিরায় ছন্দে ছন্দে সুড়সুড়ির আরাম দিচ্ছে। পঞ্চেন্দ্রিয় আমাদের প্রচণ্ডতায় মারছে আবার মৃদুতায় আরাম দিচ্ছে। ষড় রিপুরাও এখানে রিপু নয়। তারাও প্রচণ্ডতায় যেমন মারছে, সূক্ষ্মতায় তেমনি আরাম দিচ্ছে। সবাই শরীরের এক কেন্দ্রে বাঁধা। তাই ষড় রিপুর একটি না থাকলে অন্যরা কাজ করে না। ইন্দ্রিয়দের ক্ষেত্রেও তাই। একটা অকেজো হলেই অন্যগুলির অসহযোগ দেখা দেবে। সবাই সবার শৃঙ্খলে বাঁধা। শুধু প্রস্রাবের দ্বারই কাম প্রকাশ করে না। আমরা যে দেখি সেখানেও কাম প্রকাশ পায়। কারণ চোখ অপরের সঙ্গমে দেখতে পাচ্ছে। এমনি কর্ণও অপরের সঙ্গমে শুনতে পাচ্ছে। নাক অপরের সঙ্গমে ঘ্রাণ নিতে পারছে। আবার যদি কানে চন্দন কাঠ রেখে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ চালাই আমরা গন্ধ পেতে পারি। সবাই কামের মত একই নিয়মে সঙ্গম চালাচ্ছে। যিনি বলেন, আমি কামকে জয় করেছি, তিনিও ফুলের গন্ধে, প্রকৃতির দৃশ্যে মোহিত না হয়ে পারেন না। হয়তো তিনি বিকামকে জয় করতে পারেন, কাম বা কামনাকে কখনও জয় করতে পারেন না। ধর্মের ঈশ্বরকে বিজ্ঞানের কেন্দ্রকে চাওয়া তো কাম বা কামনার কাজ।

একক ক্ষেত্র তত্ত্বে পৌঁছানোর জন্য আইনস্টাইন তিরিশ বছর সাধনা করেছেন। তিনি বলেছেন, চারটি বলকে এক করতে পারলে একক ক্ষেত্র তত্ত্ব সফল হবে। সেই চারটি বল হল তড়িৎ চুম্বক, দুর্বল মিথস্ক্রিয়া, প্রবল মিথস্ক্রিয়া ও অভিকর্ষ। এর মধ্যে তড়িৎ ও চুম্বক বলকে সার্থকভাবে এক করা গিয়েছে। এই দুটি বল এক হওয়ায় পাঁচটার ক্ষেত্রে চারটিতে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য ধন্যবাদের যোগ্য জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। এই আবিষ্কারে ফোটনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সালাম, ভিনবার্গের থিওরিতে তেমনি ধরণের কিছু পাওয়া যায় নি। স্বপ্নেও তা দেখা যায় নি। তাই অনেকে এই কাজকে ফাঁকিবাজি

বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। আবার এই কাজের দ্বারা মানুষের কোন উপকারই হয়নি। তবে কেন তাঁরা নোবেল পুরস্কার পেলেন কেউ ভেবে পাচ্ছেন না।

তড়িৎ চুম্বক বোঝা গেল আকর্ষণ বিকর্ষণের ব্যাপার বলে। তারপরে যদি সালামরা দুর্বল মিথস্ক্রিয়া যোগ করে থাকেন, তবে তা কি ভাবে করেছেন? সেণ্টারিজমে জ্ঞান না থাকলে তা করা সম্ভব নয়। তড়িৎ চুম্বক বোঝা গেল, কিন্তু তার পাশে যদি পরমাণুর আকর্ষণ বিকর্ষণের কথা বলা যায়, তবে তড়িৎ চুম্বকের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ঘটল কি ভাবে? সে মিলন তাঁরা ঘটাতে পারেন নি বলে এখনও চারটি বল অনাবিষ্কৃত।

এই চারটি এক করা সম্ভব নয় কেন্দ্রভিত্তিক মাধ্যাকর্ষাকর্ষণ ও পার্শ্বাকর্ষাকর্ষণ ছাড়া। একটা গরুকে দেখে গরুকে চেনা যায়, একটা মানুষকে দেখে মানুষকে চেনা যায়। সেই গরুটা যে কোন মানুষের মালিকানায়, তা কেমন করে বুঝবো? এই পারস্পরিক সম্পর্ক দেখার জন্য পার্শ্বাকর্ষাকর্ষণ দরকার। নইলে গরু ও যে কোন একটা লোককে দেখে বা আবিষ্কার করে তাদের এক করা যায় না।

যদি চারটি বলের কথা বলতে হয়, তার সঙ্গে যোগ করব আমি আরও একটি বল। এই পাঁচটি বল তড়িৎ চুম্বক, দুর্বল মিথস্ক্রিয়া, প্রবল মিথস্ক্রিয়া, অভিকর্ষ ও পার্শ্বাকর্ষাকর্ষণ। প্রথম চারটিতে নিজের নিজের মত মাধ্যাকর্ষাকর্ষণ চলে। তারা প্রত্যেকে গরু ও মানুষের মত আলাদা আলাদা হয়ে আছে। তাদের আলাদা আলাদা ভাবে আবিষ্কার করলে একক ক্ষেত্র তত্ত্ব সম্ভব নয়। তারা যে জমির উপর বাস করছে সেই জমির উপর স্তরের পার্শ্বাকর্ষাকর্ষণ দরকার। এই পার্শ্বাকর্ষাকর্ষণ আছে বলেই গ্রহরা সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, মানুষ হেঁটে যাচ্ছে ইত্যাদি। শুধু মাধ্যাকর্ষণ থাকলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জড় হয়ে যেত। আর তা সম্ভবও নয়। আকর্ষণ হলেই বিকর্ষণ চাই-ই চাই।

কঠিন তরল ও গ্যাসীয় পদার্থদের নিজের নিজের প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কঠিন পদার্থ অধিক মাধ্যাকর্ষণ ধর্মী, তরল পদার্থ মাধ্যাকর্ষণ যুক্ত পার্শ্বাকর্ষাকর্ষণ ও ঊর্ধ্বধর্মী, আর গ্যাসীয় পদার্থ হল পার্শ্বাকর্ষাকর্ষণ ও ঊর্ধ্ব ধর্মী, এখানে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব খুব সীমিত। গ্যাসীয় পরমাণুদের সঙ্ঘবদ্ধতা নাই বলে গ্যাসীয় পদার্থকে পদার্থ ও ভাবপারের মধ্যবর্তী বস্তু বলা যায়। পদার্থের পরমাণু তাতে আছে আবার ভাবপারের অসংগঠিত ধারা তাতে আছে। তাকে সর্বদিক আচ্ছাদিত

পাত্রে রাখলে পদার্থের আকারে রাখা যায়। জলকে নিম্ন ও পার্শ্বাচ্ছাদিত পাত্রে রাখলে ধরে রাখা যায়।

গ্যাস ও আকাশ সর্বদিক আচ্ছাদিত স্থানে থাকে। পৃথিবীর এই আকাশ থাকত না যদি তার কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণের স্তর না থাকত। এক এক স্তরে এক এক আপেক্ষিক শূন্যতা পূর্ণতা ভরে থাকে। এই আকাশের শূন্যতায় গ্যাসের মত পরমাণু নাই, তাই তার কাজ চালাচ্ছে ভাব পারের শক্তি। পরমাণু হচ্ছে শক্তির আধার। আকাশের শক্তির এমনি কোন আচ্ছাদন নাই। সমগ্র আচ্ছাদনে সে আচ্ছাদিত। অবশ্য সৌরজগৎকেও এক বিরাটকায় পরমাণু বলা যায়।

জলের পরমাণুদের শৃঙ্খলা বুঝতে পারি। গ্যাসের শৃঙ্খলা ভঙ্গুর, তাই আকাশের মত আচ্ছাদনে ধরা থাকে বলেই পরমাণুর মত শক্তি আবদ্ধ থাকে। তাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত ছন্দে ছন্দে স্তর সৃষ্টি হচ্ছে আর আপেক্ষিকতা সৃষ্টি হচ্ছে। গ্যাস পদার্থ ও ভাবের সীমা বলে তার ক্ষয়কারী শক্তি বেশি। জলে একটা লোহার রডের অর্ধেক অংশ বেশিদিন ঢুকিয়ে রাখলে জল ও হাওয়ার সংযোগ স্থলে ক্ষয় দেখা দেয় বেশি। সেখানে অক্সিজেন বেশি করে আঘাত সৃষ্টি করে। প্রতিটি দুই স্তরের সংযোগস্থলে এক এক প্রকৃতির আকর্ষণ বিকর্ষণের সীমা মেশে। বিকর্ষণে কেন্দ্র থেকে শক্তি বেরিয়ে আসার পথে এক স্থানে বাইরের বিরোধী ধারায় সংযোগ হওয়ায়, দুই শক্তির সংঘর্ষে ছাঁকাছাঁকি হয়। সেই ছাঁকনির মধ্য দিয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করে তারা বিশুদ্ধ হয়ে। এই ভাবে একের বিশুদ্ধ শক্তি ও অন্যের কর্কশ শক্তির স্তরে স্তরে সৃষ্টির আপেক্ষিকতা তৈরি হচ্ছে।

এই আপেক্ষিকতা একদিন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে একসঙ্গে মিশিয়ে জল সৃষ্টি করেছিল। পরমাণু বিস্ফোরণে যেমন শক্তি প্রকাশ পায়, তেমনি সংযোজনেও প্রকাশ পায়। এই বিস্ফোরণ দুই ক্ষেত্রেই স্তরের সীমা অতিক্রমের জন্য। জল সৃষ্টির সময়ও বিস্ফোরণ হয়েছিল শক্তি ত্যাগের ফলে। তার জন্যে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, সেই শূন্যতা পূর্ণ হয়েছিল উভয়ের উভয়কে স্থান দেওয়ায়। জলে তাই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দুই চরিত্র কাজ করছে। হাইড্রোজেনের ধর্মে জলে হালকা বস্তু ডোবালে ভেসে ওঠে। অক্সিজেনের ধর্মে সে পাত্রে আবদ্ধ থাকে। জলে তাই মাধ্যাকর্ষণের বাধা থাকলেও সব সময় বাষ্পাকারে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। জলের মত যৌগিক পদার্থ এমনি মিশ্র শক্তি প্রকাশ করে। তাই যৌগিক

পদার্থের শক্তি কম, মৌলিক পদার্থের শক্তি বেশি। মৌলিক পদার্থে তাই বোমা তৈরি হয়।

জলের যেমন উপর নিচে টান আছে পৃথিবীর আবহাওয়ার তেমনি উপর নিচে টান আছে। সেখানেও হাইড্রোজেন বেলুন আকাশে ওঠে, ভারী বস্তু মাটিতে পড়ে। এখানেও যৌগিক আবহাওয়ার যৌগিক গুণ কাজ করছে। যৌগিকতায় পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলে। মৌলিকতায় আবহাওয়ার সঙ্গে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলে অন্যের নাগালে এসে যৌগিক হওয়ার জন্য। যৌগিকতারও অবশ্য এতটা না হলেও আবহাওয়ার সঙ্গে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলে।

লাল রঙ কিন্তু কালো ও সাদা রঙের মধ্যবর্তী রঙ। যাকে ভিত্তি করে আলো জ্বলে, সেই কয়লা কালো। অন্য কিছুকে ভিত্তি করে আলো জ্বললেও কালো হয়ে যায়। প্রথমে কালচে লালের স্তর, তারপর লাল, তারপর এসে সাদা। কয়লার আগুন সাদা পর্যন্ত যায় না বলেই লাল। আমাদের রক্তের রঙ লাল। পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশে উঠলে লোহিত কণিকা কমতে থাকে। নাভির নিচের দিকের দেহাংশের রক্তও উপরের দিকের দেহাংশের রক্তের পার্থক্য মহাকাশের ভারহীনতায় ঘুচে যায়। শরীরের রক্তের মধ্যে বিভিন্নতা না থাকলে জীবনী শক্তির উৎকর্ষ কমে যায়। তাতে অবশ্য শরীরের কিছুটা ক্ষয় রোধ হয়। কারণ জীবনের উৎকর্ষ শরীর ক্ষয় করেই সম্ভব। এই শরীর ক্ষয়ে অন্য জীবনের সৃষ্টি জীবন শেষ করে ভাল কাজ করলে শরীর ক্ষয় হলেও অমরত্ব পাওয়া যায়। এই রক্তের রূপান্তরে সন্তান সন্ততির ধারা ভবিষ্যতের অমরত্বে বইয়ে দেওয়া যায়। এই সৃষ্টির আনন্দ চরম আনন্দ।

শূন্যতায় আকর্ষণ। তাই কালো থেকে লালের প্রকাশ হতে চায় না। সেখানে শ্বেত কণিকার প্রাদুর্ভাব। সেখানে শূন্যতার ঠাণ্ডা কাজ করে। সামান্য পাহাড়ের উপরেই দেখা যায় আপেক্ষিক শূন্যতায় জল জমে সাদা বরফ। এই উচ্চতার জন্য সেখানকার মানুষের রক্তের সঙ্গে সমতলের মানুষের রক্তের পার্থক্য আছে, প্রতিভার পার্থক্য আছে। তবে সেখানে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায় ঠাণ্ডা আবহাওয়ার জন্য। কারণ সেখানে ঠাণ্ডার স্থূলতা রক্তে, মস্তিষ্কে সূক্ষ্ম ভাবে কাজ করে চলে। তাছাড়া তারা সমতলের মানুষের মত লালচে কালো নয়, বরফ ঘেঁষা সাদা।

জাতির সঙ্গে জাতির যেমন মিশ্রণ দরকার, প্রতিটি মানুষের শরীরেও নাভির

উপরের ও নিচের রক্তের মিশ্রণ দরকার। একটা জাতিতে মিশ্রণ না হলে জন্মের কুক্ষিগত ধারার নানা রোগ কুক্ষিগত হয়ে থাকে। তাতে বংশ নাশ হয়। আমাদের শরীরের মধ্যেও তেমনি বিভিন্নতার সংমিশ্রণের প্রয়োজন আছে। যৌগিক বস্তু নানা জাতির সঙ্গে যৌগিক জীবন নতুন ধারার জন্ম দেয়।

শুধু শূন্যতা বা শুধু পূর্ণতা সম্ভব নয়। তাই কালোর মধ্যে সাদা আছে, সাদার মধ্যে কালো আছে। আলোর মধ্যে অন্ধকার আছে, অন্ধকারের মধ্যে আলো আছে। কারো একার বেঁচে থাকার উপায় নাই কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ ছাড়া। তাই চরম আলোর চাঞ্চল্য সম্ভব নয়, চরম অন্ধকারের নিমগ্নতা সম্ভব নয়। আরও জানতে হলে এই লেখকের 'কেন্দ্রায়ণে সমগ্র বিজ্ঞান' অবশ্যই পড়তে হবে।

যা বাস্তব সত্য তাকে ধর্মও মানবে, বিজ্ঞানও মানবে। তাই চরম সত্যে পৌঁছানো হবে আমাদের কাজ। সেই চরম সত্য ব্যষ্টির কাছে যেমন সত্য সমষ্টির কাছেও তেমনি সত্য। সমষ্টির চিৎকার যেমন সত্য, ব্যষ্টির চিৎকারও তেমনি সত্য। তাদের এক সত্য চিৎকার। অনেক মানুষ আলাদা আলাদা ভাবে চিৎকার করলেও আলাদা আলাদা দুই এক জনের গলা তার মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ ভাবে শোনা যায়। এই সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসুর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। লক্ষ্য ছিল তাঁর প্রবন্ধ প্লাঙ্কের সূত্র ও আলোক কোয়ান্টাম প্রকল্প।

আমি বলেছিলাম এক সঙ্গে বহু লোক চিৎকার করলেও একই শব্দ তরঙ্গের চাপে এক আকার ধারণ করে। ছোট চীৎকার হারিয়ে যায়, দীর্ঘ চিৎকার সবাইকে ভেদ করে বেরিয়ে আসে। বহু লোকের এক আকারের চিৎকারে বহু লোকের আচরণ আছে ঠিকই। সেই সম্মিলিত আচরণ দূর থেকে এক শোনা যায় সেটাও ঠিকই, কিন্তু যত সেই আচরণের কাছে যাওয়া যায়, ততই সেই আচরণ আলাদা আলাদা হতে থাকে। অর্থাৎ অনেকের চিৎকার আলাদা আলাদা ভাবে চিনে নেওয়া যায়। স্থূলতায় তা সমষ্টির চিৎকার, সূক্ষ্মতায় তা প্রত্যেকের চিৎকার। যৌগিক হলেও জলে যেমন দেখানো যায় দুই চরিত্রই কাজ করছে। এক গ্যাসের অণুতে তেমনি সমষ্টির আচরণ দেখা যায়। অণুর ভেতর সে পার্শ্বাকর্ষণের কারণে একাত্ম হয়েছে। এই একাত্মতাকেও ভেদ করতে পারে শক্তিশালী আর এক চিৎকার। শক্তি এখানে কোয়ান্টামকে ভেদ করে আসে। তাই ফোটন ও কোয়ান্টাম একই ধর্ম চরিত্র ঠিক বজায় রাখে।

কেন্দ্রকে না জানলে ফোটন ও কোয়ান্টামকে জানা যায় না। ব্রহ্মাণ্ড কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছে, নানা পণ্ডিত নানা মত দিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্র না থাকলে আকর্ষণ বিকর্ষণ থাকত না। কেন্দ্র না থাকলে আকর্ষণের পূর্ণতা ও বিকর্ষণের শূন্যতা থাকত না। কেন্দ্র না থাকলে পূর্ণতার বস্তু ও শূন্যতার ভাব থাকত না। কেন্দ্র না থাকলে বস্তুতে ভাব মিশ্রণ ও ভাবে বস্তু মিশ্রণ থাকত না। কেন্দ্র না থাকলে এই ভাব মিশ্রণ ও বস্তু মিশ্রণ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারত না। কারণ শূন্যতা ও পূর্ণতা আলাদা আলাদা থাকলে পূর্ণতার পাথরকে কাটার জন্য শূন্যতার বাটালি সৃষ্টি হতে পারত না। কেন্দ্র আছে বলে শূন্যতাকে ও পূর্ণতাকে আলাদা ভাবা যায় না। কেন্দ্রের শূন্যতা ভাবকে ঠাণ্ডা ও আকর্ষণ করে বস্তু গড়ে, আবার কেন্দ্রের পূর্ণতা বস্তুকে বিচ্ছুরণের জন্য উত্তপ্ত করে আকাশ গড়ে। এই সব পথ পরিক্রমায় বায়ু শব্দ ইত্যাদির মত আলো সৃষ্টি হয়েছে, আঁধার সৃষ্টি হয়েছে।

এই আঁধারের পটভূমিতে আলো ফোটে। ফোটন কোয়াণ্টাম ফোটে। বস্তুর মধ্যেই ভাবময় আলো অন্ধকার থাকলেও আলো দেখা যায় না। অন্ধকার দেখা যায়। আলো দেখতে হলে অন্য বস্তুর শক্তি এই বস্তুতে এসে আঘাত খাওয়া চাই। তা হলে অন্ধকারের সৃষ্টি বস্তুর আপন মগ্নতা থেকে, আলোর সৃষ্টি দুই বস্তুর কেন্দ্রভিত্তিক শক্তিসংঘর্ষ থেকে। তাই একের মধ্যে আলো অন্ধকারের উৎস থাকলেও এক হলে অন্ধকার দুই হলে আলো। কেন্দ্রের চরিত্রে আকর্ষণ বিকর্ষণে দুই থাকতেই হবে, তাই আলো অন্ধকারকেও থাকতে হবে।

তাই অন্ধকার পাথরকে কেটে আলো বাটালি হয়ে মূর্তি তৈরি করে। কেন্দ্র এখানে নিজে নিজেই মূর্তি তৈরি করে ভগবান সেজেছেন, ব্রহ্ম সেজেছেন, আত্মা সেজেছেন, গড সেজেছেন, আল্লা সেজেছেন ইত্যাদি। এই সব রূপকে আমরা নানা মনে নানা চোখে দেখে থাকি। তাজমহলের অপর পার থেকে দেখা যায় যমুনা নদীতে যেন আর একটা তাজমহল উল্টিয়ে ঝুলে আছে। আসল তাজমহলের যে সব রঙ, সেই ছায়াতেও সেইসব রঙ ও সৌন্দর্য। তাজমহলের পারে গিয়ে দেখলে, দেখতে পাব যমুনার বুকে তাজমহলের কালো ছায়া শুয়ে আছে। সে ছায়াও আবার ডুবে নেই, যেমন ডোবা দেখা যায় অপর পারে দাঁড়িয়ে, যে দৃশ্যে তাজমহলের হুবহু রঙ দেখা গিয়েছিল।

তাহলে দেখা গেল কালো ছায়া পড়ে জলের উপরে, বস্তুর হুবহু রঙ সহ ছায়া পড়ে জলের গভীরে। প্রকৃতপক্ষে জলের গভীরে সে ছায়া যায় না, দেখা যায় মাত্র। আসলে জলের প্রতিফলনের গভীরে তাকে দেখা যায়। কালো রঙ পটভূমি।

সে রঙ প্রতিফলিত হয় না বলেই জলের উপরের কালো ছায়া জলের উপরেই থাকে। তাজমহলের পারে দাঁড়িয়ে জলে তার যে কালো ছায়া দেখা গেল, কিন্তু তাজমহলের সেই রঙিন ছায়া পড়েনি। তাজমহলের পেছনে থেকে সূর্য তাজমহলের আকারের আলো যমুনায় ফেলতে পারেনি বলেই সেই আকার ছায়া হয়ে আছে। এই আকারের আলো কিন্তু তাজমহলের পেছনে বন্দী হয়ে আছে। তবে আবহাওয়ার প্রতিফলিত কিছু আলো কিছুটা তাজমহলের রঙ ফলায়, তা তাজমহলের অপর পার থেকে দেখা যায়।

সেই রঙ উজ্জ্বলতম হবে, যখন তাজমহলের বিপরীত পার থেকে সূর্য আলো দেয় সোজাসুজি। তখন তাজমলের পার থেকে জলে শুয়ে থাকা ছায়া দেখা যাবে না, কারণ সেখানেও সূর্য সোজাসুজি আলো ফেলছে। সোজাসুজি আলোকে যদি তাজমহলের কোন স্থানে আড়াল পড়ে থাকে, সেস্থান কালো দেখাবে। সেই ছায়া জলের ছায়াতেও দেখা যাবে। কিন্তু মজা এই, সে কালো রঙকে জল থেকে সূর্যের আলো মুছে ফেলতে পারবে না। আলোতে আঁধার যায় কিন্তু এ আঁধার যায় না। এই আঁধার যাওয়াতে হলে তাজমহলের সেই আড়ালে, যে আড়ালে সূর্যের আলো পড়েনি, সেখানে আলো ফেলতে হবে।

কালো রঙ প্রতিফলিত হয় না বলেই এমনটি হল। কালো রঙ ধ্রুব। আর যে কোন রঙ পরস্পরের অপেক্ষা চঞ্চল। যে কোন রঙে আলো ফেললে, কিছুটা প্রতিফলিত করা যায়, কিন্তু কালোকে প্রতিফলিত করা যায় না। কালোকে আমরা দেখতে পাই না বলে কালো দেখি। তারি অন্যান্য রঙের মত কালো প্রতিফলিত হচ্ছে। এই কালোর পরেই ফোটন কোয়াণ্টামের খেলা চলছে।

আলো রঙকে সব সময় দেখা যায়। আলো ফেলেও কালো রঙকে দেখা যায়। মনে হবে তা অনেক গভীরে অন্যান্য রঙের তুলনায়। আলো না হলে তো সব কালো। অন্য কোন রঙ আলো না হলে দেখা যায় না কালোর আধিপত্যে। তাজমহলের পেছনে আলো থাকলে যমুনায় তার রঙ পড়ে না। কালো ছায়া পড়ে। তাজমহলের অন্যান্য রঙ সেই ছায়ায় ফোটে না। তাজমহলের অপর পার থেকে দেখলে আলো না পড়া কালো রঙ সহ সব রঙকে যমুনার জলের তলায় দেখা যাবে। তার কারণ, যমুনার জল তাজমহলের ছায়াকে আমাদের চোখে প্রতিফলিত করে। সে সব রঙকে কিন্তু উপরে শুয়ে থাকতে দেখা যায় না। যেমন কালো ছায়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়। আসলে কিন্তু সব রঙই জলের

প্রতিফলনের তলায় শুয়ে গভীরে চলে যাচ্ছে দর্শকের চোখের প্রতিফলনের ঠেলায়। প্রতিফলনে তাকে গভীরের দূরে দেখা গেলেও আসলে ছায়া ভেসে থাকে, আলোর তেজ জলে প্রতিফলনে ছিটকে চোখে আসছে। এখানে ছায়ার দূরত্বে চলা মনে হচ্ছে। যৌগিক পদার্থ জলের শক্তি প্রকাশও এখানে খানিকটা কাজ করছে। তার সঙ্গে জলের মসৃণতাও আছে।

জলের প্রতিফলিত আলোতে ফোটন, কোয়াণ্টাম রীতি চলে না। সেখানে তাবপারের শক্তি তাদের ভূমিকা নেয়। মেলার মধ্যে থেকে সবার কণ্ঠ আলাদা আলাদা শোনা যায়, যদিও দূরে থেকে তাকে একটা শব্দ মনে হয়। বোসন মেনে চলে ফোটন, আলফা কণা, ডয়টেরন ইত্যাদি মৌল কণা। ফের্মিয়ন মেনে চলে ইলেকট্রন প্রোটন ইত্যাদি মৌল কণা। ফোটন, আলফা কণা, ইলেকট্রন ইত্যাদি বেঁকে চলতে পারে। এখানে বোসন ফের্মিয়নে মিল আছে। এই ভাবে সবাইকে কেন্দ্র ভিত্তিক বিচার করলে একক্ষেত্রে বাঁধা যায়। পার্শ্বাকর্ষাকর্ষণ ক্রিয়া ইলেকট্রনে কাজ করে। প্লাজমা বিজ্ঞানেও কাজ করে। আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মত বস্তুও পার্শ্বাকর্ষাকর্ষণের উৎপাদন। নিউট্রনও ঐ প্রক্রিয়ায় জমাট বেঁধেছে পরমাণুতে। তারা আবার প্রয়োজনে সবাইকে নিজের বস্তু দান করে।

সবই কেন্দ্রের অনুগামী। কেন্দ্রই সব কিছুকে ধরে রেখে একক ক্ষেত্র তত্ত্বকে সম্পন্ন করেছে। গ্যাসের অণুতেও মেলার হট্টগোলের মত চরিত্র প্রকাশ পায়। এই ধরনের হট্টগোলেই প্লাজমার সৃষ্টি, যেমন সমুদ্রের ঢেউয়ের জন্য ফ্যানার সৃষ্টি। এখানে বহু চরিত্রের ক্রিয়া এক চরিত্রে প্রকাশ পায় তাঁর নিজের মত করে। বহু চরিত্রের মিশ্রণে কোয়াণ্টামের এক চরিত্রই প্রকাশ পায় স্বকীয়তার জন্য। ফোটনও তার থেকে বাদ যায় না। সমাজের একটা মানুষ সেই ধরনের চরিত্র থেকে বাদ যায় না।

কেন্দ্র এক এবং অনন্ত। দুই হলেই আর অনন্ত থাকে না। ১+১ দুই হয়। দুটি একের মাঝখানে সীমা টানতে হল। জগৎকে পুরুষ প্রকৃতিতে ভাগ করলেও অনন্তকে পাওয়া যায়। যাঁরা ঈশ্বরকে পুরুষ এবং অনন্ত ভাবেন, প্রকৃতিকে সেই একের মধ্যেই ভাবেন। যাঁরা প্রকৃতির উপাসক তারাও পুরুষকে প্রকৃতির মধ্যে ভাবেন। সেখানে দুই দলের মধ্যে অনন্ত নিয়ে বিভেদ থাকতে পারে না। সেখানে বৈষ্ণব বড়, কি শাক্ত বড় তাই নিয়ে যাঁরা দলাদলি করেন তাঁরা বৈষ্ণবও নয়, শাক্তও নন। তাঁরা কিছুই নন। তবু তাঁরা অনন্তের অনুসারী নিজেদের

অজান্তেই। 'কিছু না' কথাতেও অনন্ত বোঝায়। কিছু হয় বললেই তাকে অন্তের মধ্যে ভাবা হয়। তাঁরা ঝগড়া করলেন বলেই দুই দলে ভাগ হলেন অন্ত হলেন। অন্ত হলেই মৃত্যু আছে। জীবনান্ত তো মৃত্যুকেই বোঝায়। এই ধরনের সমস্ত অন্তকে নিয়েই তো অনন্ত। সমস্ত অন্তের নিজের নিজের কেন্দ্র আছে, ব্যক্তিত্ব আছে। তারা যে আইন মেনে চলে তা অনন্ত কেন্দ্রের আইন। তাই যে কোন কেন্দ্রই এক এবং অনন্ত।

যে গোলায় ধান আছে, তাকে ধানের গোলা বলব। সেই ধানের গোলা থেকে সমস্ত ধান সরিয়ে তাতে যদি একটি ধান, একটি ডাল, একটা কাঁকর, একটা লোহার টুকরো, একটা গাছের পাতা, একটা মাটির ঢেলা, একটা কাঠের টুকরো, এমনি ভাবে যদি অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর একটা করে টুকরো রাখা যায়, তবে তাকে কিসের গোলা বলব ?

নিশ্চয় তাকে বলতে হবে অনন্তের গোলা, যদিও তা সীমার মধ্যে অবস্থিত। তেমনি সময়, আলো, অন্ধকার কোন কিছু অনন্ত নয় অনন্তের মত ভাবলেও। কেউ যদি বলে আলো ছাড়া আমি কিছু বুঝি না, তার কাছে আলোই অনন্ত, অন্যের কাছে নয়। শাক্তের কাছে প্রকৃতি তেমনি অনন্ত হলেও বৈষ্ণবের কাছে নয়। সবই ব্যক্তিগত ভাবের পরে নির্ভর করছে। টিউবওয়েল টিপলেই জল পড়ে, তাই তাকে টাইম কল বলি না। পৌর প্রতিষ্ঠানের জল সময় মত যাতে আসে তাকে টাইম কল বলি। অথচ টিউব ওয়েলের একদিন ক্ষয় হবে টাইম হলে। সে টাইম অনন্তের গোলায় স্থান নিয়েছে। অসীমকে তাই সময়ে বাঁধা যায় না বলেই বিজ্ঞানে স্বীকার করা যায় না।

যার কাছে যেমন তার কাছে তেমন এই বিশ্ব প্রকৃতি। চোখে বস্তুর আলো এলেই যে আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাই, তা ঠিক নয়। তিন জন লোক সেই বস্তুটির দিকে মুখ করে থাকলেও সবাই কিন্তু বস্তুটিকে দেখতে পায় না। যার বস্তুটিকে দেখার ইচ্ছা সে বস্তুটিকে দেখছে মনের শক্তি চোখে সংযোজিত করে। দ্বিতীয় জন দেখতে পাচ্ছে না চোখ অন্ধ হওয়ায় মনের সংযোগ চামড়া ভেদ করে আলোর গতির সঙ্গে মিশতে পারছে না বলে। তৃতীয় জন দেখতে পাচ্ছে না চোখ ভাল থাকলেও শরীরের যন্ত্রণাকাতর মন হওয়ার জন্য। অথবা বাহিরের কোন চিন্তায় ডুবে থাকার জন্য। প্রত্যেকে কিন্তু এক এক কেন্দ্রিক অনন্তের অংশীদার। বেগুনকে গুণহীন ও বেদানাকে দানাহীন ভাবলে চলবে না। প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ গুণ ও বিচি কেন্দ্রিক দানা আছে। সবই অনন্তের ইউনিফায়েড সেন্টার

থিওরিতে এক। অনন্তের বেদানার বিচিগুলোকে সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ বলা যেতে পারে। উপগ্রহের নিজস্ব কেন্দ্র থাকলেও গ্রহের কেন্দ্রে বাঁধা। গ্রহের নিজস্ব কেন্দ্র থাকলেও সূর্যের কেন্দ্রে বাঁধা। সূর্যের নিজস্ব কেন্দ্র থাকলেও ছায়াপথের কেন্দ্রে বাঁধা। সে কেন্দ্র বেদানার কেন্দ্রের মত। বেদানার দানাগুলো বিচিকে কেন্দ্র করে থাকলেও সমস্ত বিচি কিন্তু বেদানার মহাকেন্দ্রকে ধরে আছে। সম্পূর্ণ বেদানার কেন্দ্রকে ভিত্তি করে দানাগুলো স্থিতি পেয়েছে। অনন্তের এই কেন্দ্রকে সময়ে বাঁধা যায় না। অনন্তের মত তার সময়ের শক্তিও অনন্ত। সেই অনন্তের মধ্যে সবাইকে অংশ অংশ হিসাবে দেখলেও কেন্দ্রের বিচারে সম্পূর্ণ। দেখার কাজ শুধু চোখ করে না, চোখের পেছনে মন মনের পেছনে দেহ করে। তাদের পেছনেও কাজ করে চলেছে ক্রম মূলে সমাজ পৃথিবী, সূর্য, অখণ্ড অনন্ত।

আসলে আমরা অখণ্ডতার অংশ মাত্র। আমরা প্রত্যেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছি অখণ্ডতার সহায়তা আছে বলে। একটা কোষের বৃদ্ধি তার সেণ্টার শক্তি অনুযায়ী হয়। সেণ্টার শক্তির অতিরিক্ত বৃদ্ধি হতে হলে বিভাজিত হয়ে আলাদা সেণ্টারের আশ্রয় নিতে হবে। যে জীব আকারে যত বড় হবে, তার এমনি ভাবে তত কোষ বিভাজন চালাতে হবে। যখন জীবটার বাড়া শেষ হয়ে যাবে সেণ্টার শক্তি ফুরিয়ে যাওয়ার দরুণ, তখন কোষদের সেণ্টার শক্তি হারাতে থাকায় কোষ বিভাজন কমে যাবে। নাভিদেশের সেণ্টার শক্তি বাড়াতে পারলে কোষ বৃদ্ধি আরও কিছুদিন চলতে পারে। সেই শক্তিতে কোষের জটলা থেকে দূষিত পদার্থ বেরিয়ে গেলে কোষ বৃদ্ধির স্থান হতে পারে। তার জন্য মাঝে মাঝে পায়খানা পরিষ্কার রাখতে হবে। তারপর ওষুধ মিশ্রিত গরম হাল্কা আবহাওয়ার ঘরে থাকতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে গায়ে যেন ঘাম ঝরতে পারে। এই চিকিৎসায় দেখা যাবে মন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। মনে হবে বয়স যেন অনেক কমে গিয়েছে।

শরীরকেন্দ্র যৌবনে চরমভাবে আকর্ষণ বিকর্ষণ চালাতে পারে বলেই, কোষ বৃদ্ধি হয় চরম ভাবে। একদিন শরীর-কেন্দ্রের বার্ধক্য আসতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কোষদের স্বকীয়তা ও বৃদ্ধি কমতে থাকে। কোলাজেন প্রোটিন তখন শক্ত হয়ে ওঠায় বর্জ্য পদার্থ বেরিয়ে আসতে পারে না। শরীর কেন্দ্রে সব বাধা হলেও মাথার চুলের চেয়ে গোঁফ দাড়ি কমছে কম ১৫ বছর পরে জন্মায়। তবু প্রায় একসঙ্গে পাকতে থাকে একই কেন্দ্রের বার্ধক্যের জন্য। যেমন জমিতে সার না থাকলে বড় ফসলও যখন মরতে থাকে চারা ফসলও তখন মরতে থাকে। আবার

তরঙ্গ তুলে চলে। তার যদি কোন বাধা না থাকত, তরঙ্গ হত না। তরঙ্গ না হলে শব্দ শোনা যেত না।

সর্বক্ষেত্রে মাথার দিকে ঢেউ তুলে শরীর আকর্ষণ বিকর্ষণ চালায়। দর্শন তেমনি ঢেউ তোলে বলে বিজ্ঞান তাকে গ্রহণ বর্জন করে। এই নিয়মে চললে জগৎ প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারত। বিজ্ঞানের মাথা ধর্ম দর্শনে না খাটলে এবং ধর্ম দর্শনের মাথা বিজ্ঞানে না খাটলে একক ক্ষেত্র তত্ত্ব সম্ভব নয়। বিজ্ঞানী যদি ধার্মিক হত তবে সে ধর্মের গলদ দূর করতে পারত। আর যদি সে নাও পারত, তাতে টিকে থেকে স্বার্থান্বেষীর পতনে তার গদী দখল করতে পারত। এমনি ভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ধার্মিক গদী দখল করতে পারত। তা না হওয়ার জন্য সর্ব ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষীদের উত্তরাধিকারী স্বার্থান্বেষীরাই হচ্ছে। এক্ষেত্রে একক ক্ষেত্র তত্ত্ব সুদূর পরাহত। মূল থেকে আরম্ভ না করলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চরিত্র জানা যায় না।

ধর্ম মনে করে যে, বহু জন্ম পার হয়ে জীব মানব জীবন পেয়েছে। এখন মানুষের সন্তান মানুষই হয়। যারা বলছে, মানুষ বহু প্রকারের জীব স্তর পার হয়ে এসে মানুষ হয়েছে, তাদের কথাও ঠিক, আবার যারা বলছে মানুষ থেকে মানুষ এসেছে সেকথাও ঠিক। একদল সৃষ্টির গোড়া থেকে বিচার করে এসেছে, অন্য দল মানব জন্মের পর থেকে বিচার করে এসেছে। সিংহ ও ব্যাঘ্রের মিশ্রণে যে সিংঘ্র হয়েছে, তা দুই পক্ষই মানে। এই সিংঘ্র বাঘও নয়, সিংহও নয়। এখানে কেমন করে বলা যাবে সিংঘ্র এসেছে সিংঘ্র থেকে? নারীর সঙ্গে পুরুষের মিলনে সন্তান হয়। হাজার হাজার বছর পরে এমন একদিন আসে তাদের নারী-পুরুষের মিলনে মানব সন্তান হলেও পুরোনো রোগ বংশগত ভাবে এসে বংশ লোপ করে। তাই আদিবাসীদের সঙ্গে আধুনিক মানুষের মিলন না ঘটলে নিরোগ-উন্নত মানুষ হতে পারে না। আপেক্ষিকতাবাদকে এখানে আর এক ভাবে কাজে লাগানো যায়। একের পক্ষে অন্য শ্রেষ্ঠ হলে পরস্পরের মিলনে শ্রেষ্ঠ সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। সমানে সমানে ততখানি সম্ভাবনা থাকে না।

ধর্মে বলা হয়েছে, ঈশ্বরকে পেলে, তিনি তাঁর ভক্তদের চরণে ঠাঁই দেন। তারপর তাদের আর জন্ম হয় না। এখানে তাদের আত্মার পুনর্জন্ম কাম্য নয়। মনে হয় পরে জন্মান্তরবাদকে ধর্ম কাম্য মনে করেছে। আসলে মানুষ স্থিতি চায়। জন্মান্তরবাদ গৌণ। বিজ্ঞানিও এই কথা মানে। তারা স্বর্গে বাস করতে চায়। অর্থাৎ সুখে বাস করতে চায়। সুখের জন্ম ছেড়ে যেন অন্য জন্ম না হয়।

মোট কথা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলে আর উত্থান পতন হয় না। সাধনায় সিদ্ধি লাভ না করলে উত্থান পতন হয়। জন্মান্তর হয়। আত্মা সেখানে বার বার জন্মগ্রহণ করে। এক জন্মেই যে দুবার জন্ম হতে পারে সে কথা ধার্মিকরা মানে বলেই উপনয়নে তাদের দুবার জন্ম মনে করে। অর্থাৎ দ্বিজ হতে পারে। পৈতা হলেই যদি দুবার জন্ম হয়, তবে বিজ্ঞানের সাধনায় যে অধম জীবন থেকে উন্নত জীবনে যায় তবে তাকে দ্বিজ বলা যাবে না কেন? তাহলে জন্মান্তরবাদ মিথ্যা নয়। তবে স্বার্থান্বেষীর জন্মান্তরবাদকে উসকিয়ে দিলে কোনদিন একক ক্ষেত্র তত্ত্বে পৌছানো সম্ভব নয়। তাদের মতে পরম ব্রহ্ম পুনর্জন্ম নিয়ে ভগবান হয়েছেন। আসলে ভগবান অবতার হয়েছেন পরম ব্রহ্মের অনুসরী হিসাবে। সেইটাই একটা জন্ম।

মোট কথা আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে কতদূর এগুলাম বা পিছালাম সেইটাই জন্মান্তরবাদের বড় কথা। একটা ভিখারী ভালভাবে খেয়ে পরে স্বচ্ছল মানুষের স্তরে এগিয়ে এলে, সে যতখানি উন্নত হল, সেই খেয়ে পরে থাকা স্বচ্ছল মানুষটি যদি আরও ধনী হয়, সেও ততখানি উন্নত হল। ভিখারী অত বড ধনী না হলেও সে যে স্তরে বাস করত, তার সুযোগ তাকে ততখানি এগিয়ে এনেছে সে ধনী না হলেও। কোন রকমে খেতে পাওয়া মানুষ রাজা না হলেও সে যে স্তরে বাস করত, তার সুযোগ তাকে ধনীর স্তরে এনেছে। প্রত্যেকে একই পথ অতিক্রম করে চলেছে। এইটাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নীতি। সবার রাজা হওয়া সম্ভব নয়। ভিখারী কিছু লোককে হতে হবে। পথ পরিক্রমার উপর উন্নতি অবনতি নির্ভর করে।

সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী রাখতে হবে। কোন কিছুকে বিজ্ঞানের বাইরে ভাবলে বিজ্ঞানের পূর্ণতা থাকে না। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র বিজ্ঞান কাজ করছে। আলো যেমন অন্ধকারকে সরায়, বিজ্ঞান তেমনি অবিজ্ঞানকে সরায়। ধরা যাক বর্তমান সরকারের বন সৃজনের কথা। সেখানে রাজনীতি কাজ করছে বলে বন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার জীবকুল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অভাবে পড়ে আদিবাসীরা আজ বন কেটে জীবিকা অর্জন করছে। যদি তাদের চাকরি দিয়ে বন্য গাছের চাষে লাগানো যায় তাদের বেকারত্ব ঘোচে। বন সম্পদ বিক্রির টাকায় তাদের মাইনে যোগানোও সম্ভব হতে পারে। ফলে বন বাড়লে বন্য জন্তুও বাড়তে পারে। তাতে রাজনৈতিক পাহারাদারদের তুলনায় এই জন্তুদের পাহারা অনেক ভাল হত।

তারা বনসম্পদ চুরি করত না। বিনা মাইনের এমনি কর্মচারী সত্যি দুর্লভ। এই সততা দেশবাসীর কাছে বিশেষ প্রয়োজন। আজকের রাজনীতি সে জন্তুদের রক্ষা না করে সরল আদিবাসীদের বিষাক্ত করে তুলছে। তাই বন চুরির দাপটে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এই ধরনের চিন্তাধারাকে ধর্মও বিশ্বাস করে, বিজ্ঞানও বিশ্বাস করে। যা সত্য তাকে মানতেই হবে। এখানে যারা বিভেদ সৃষ্টি করবে তারা বৈজ্ঞানিকও নয়, ধার্মিকও নয়। এই চিন্তাধারায় মানুষ ভাগ হলে দরিদ্র চাষী মামলা করতে গিয়ে কোন স্বার্থান্বেষী উকিলের খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত হবে, ভদ্রলোক চাষ করতে গিয়ে অভিজ্ঞতার অভাবে লাঙল গরুর পেছনে সব খোয়াবে। সবাই সব কাজ করলে বেকার সমস্যা বাড়বে। সমস্ত কাজ একের পক্ষে সম্ভব না হলেও, সব কিছুকে অন্তত শিক্ষার ক্ষেত্রে জানতে হবে। সব কিছুকে জানতে হলে একক ক্ষেত্রতত্ত্বকে জানতে হবে। একক ক্ষেত্রতত্ত্বকে জানতে হলে কেন্দ্রতত্ত্বকে জানতে হবে।

কেন্দ্রতত্ত্ব জানলে সব জানা হয়ে যায়; তবে সেখানে জানা আর হওয়া এক জিনিস নয়। উকিল আইন জানে বলেই উকিল। উকিল এখানে একাধারে জানা আর হওয়া। আইন জানলে উকিল হওয়া গেলেও উকিল সাজা শিখতে হয়। নইলে আইন ব্যবসায় জমাতে পারবে না। আবার অনেকে আইন না জানলেও আইনজ্ঞের অভিনয় করতে পারে। সে আইনজ্ঞের ভূমিকায় থিয়েটারে অভিনয় করলেও নিজেও জানে, সে আইন জানে না বলেই আইনজ্ঞ নয়। আমেরিকায় যখন দিন ভারতে তখন রাত জানলেও ভারতে তখন দিন আনা সম্ভব না। জানা আর হওয়ার এক কেন্দ্রে এসে এক হতে হবে। তখন বোঝা যাবে দিন আর রাতকে একত্র করা যায়। আমেরিকার দিনের আলোতে ভারতে বসে বই পড়া যায় না। অবশ্য টেলিভিসনের মাধ্যমে আমেরিকার দিনকে ভারতে জানলেও দিন বলা যাবে না।

দেশলাই কাঠি জ্বাললে বস্তু দেখা যায়। না জ্বেলে পকেটে রাখলে দেখা যায় না। কাছে থাকলে শুধু হবে না, তাকে হওয়াতে হবে। আমেরিকার দিনের আলো ভারতের দিনের আলো হতে পারে না। দেশলাই কাঠি ঠুকে আলো না জ্বাললে দেশলাই কাঠির আলো হতে পারে না। আলো ব্যক্তির সামনে আলোকিত হওয়ার উপর নির্ভর করছে। আবার ব্যক্তির সামনে আলো থাকলেও আড়াল করলে বই পড়া যাবে না। অথচ আলো থাকলে পড়া যেত।

চক্ষু থাকতে না পড়তে পারাই প্রমাণ করে আলো নাই। সেই আড়ালের ওপারে যে আছে, সে কিন্তু পড়তে পারছে। ব্যক্তি বিশেষে, স্থান বিশেষে, কাল বিশেষে আলো অন্ধকার প্রমাণিত হয়। দিন কানা পাখী আলো থাকলেও তার চোখের পক্ষে অত্যধিক উজ্জ্বল বলে দিনে দেখতে পায় না। কিন্তু রাতের অন্ধকারে দেখতে পায়। রাতের অন্ধকারেও (আঁধার ও আলো এক সঙ্গে মিশে থাকে, আলোর ভাগ বেশি থাকলে তাকে আলো বলি, আঁধারের ভাগ বেশি থাকলে তাকে আঁধার বলি) দ্রষ্টব্যের আলোর সঙ্গে তার দৃষ্টির সংঘাত হচ্ছে। কাজেই দ্রষ্টার পরে আলো ও অন্ধকার নির্ভর করছে। আলোর অর্থ দৃষ্টির সঙ্গে সংঘাত, অন্ধকারের অর্থ দৃষ্টির সঙ্গে অসংঘাত। এখানে দৃষ্টি ও দ্রষ্টব্যের চরিত্রের উপর সব কিছু নির্ভর করছে। আলোর তীব্রতা বাড়লে আবার দৃষ্টিতে অন্ধকার নেমে আসে। তৃষ্ণা থাকলে জলে তৃষ্ণা মেটে। যেখানে তৃষ্ণা নাই সেখানে জলও নাই। তৃষ্ণা ছাড়া জলে জল টানে না।

কাঁচা আমের ভেতরের সাদা রঙ আমরা আলোতে দেখি। ভেতরে থাকা অবস্থায় আলোর অভাবে কালো। যেহেতু রাত্রের অন্ধকারে সাদাকেও কালো দেখা যায়। অবশ্য এ সত্য চলন্ত ট্রেনে বসে দেখার সত্য, আসল সত্য নয়। আলোর সৃষ্টি হতে হয়, রঙেরও সৃষ্টি হতে হয় একাধিক বস্তুর সংঘাতে। অন্ধকারকে সৃষ্টি হতে হয় না। যেহেতু তার সংঘাত নাই, সেই হেতু সে একেও অন্ধকার, একাধিকেও অন্ধকার। কেন্দ্র তার বাসভূমি। অন্ধকার হল পটভূমি, আলো তার পরে দৃশ্যমান হয়।

অন্ধকার আমাদের চিরদিনের জানা। তাই আমরা জ্ঞানের জন্য অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যেতে চাই। শিশু জানে না হাত পা নাড়লে যে শক্তি সঞ্চয় হয়, তা তার পরবর্তী জীবনে কাজে লাগবে। অর্থাৎ অনন্ত অন্ধকার থেকে চলতে গেলেই আলোয় পা বাড়াতে হয়। এই শিক্ষা শিশু কিন্তু জ্ঞান থেকে পায় নি। চলতে চলতে পেয়ে গিয়েছে তার অজান্তে।

আলো জ্বাললে অন্ধকার দূরে সরে যায়। সেই আলো নিভলে আবার সে অন্ধকার ফিরে আসে। আলো অন্ধকারের সঙ্গে পার্থক্য সৃষ্টি করে। এই আলো নেভালে পার্থক্য শেষ হয়ে যায়। তখন চারদিকে একই ধরনের অন্ধকার। জল ঠেললে শূন্যস্থানে আবার জল ফিরে আসে। তখন শূন্যতার সঙ্গে জলের পার্থক্য ঘুচে যায়। আলো বৃত্তাকারে অন্ধকারকে ঠেলে রাখে যত সময় জ্বলতে থাকে। জলে ঢেউ তুললে সে ঢেউ বৃত্তাকারে বাড়তে থাকে। এই সব বৃত্তের

মধ্যে যারা থাকবে তারা তার দ্বারা প্রভাবিত হবে। গান গাইলে তার তরঙ্গও বৃত্তাকারে বাড়তে থাকে। সেই বৃত্তের মধ্যে যারা থাকবে তারা সেই গানের সমস্ত কথা ও সুর শুনতে পাবে।

এই বৃত্ত যদি না হত, তবে যেদিকে ফিরে গান গাওয়া যেত সেদিকের লোক শুনতে পেত, পাশের লোক শুনতে পেত না। মুখ এদিক ওদিক ঘোরালে অবশ্য শুনতে পেত, কিন্তু সবাই সব কথা শুনতে পেত না। 'জনগণ মন' এই শব্দগুলো কেউ পুরো শুনতে পেত না। কেউ শুনত জন, কেউ শুনত গণ, আবার কেউ শুনত মন। শব্দ বৃত্ত সৃষ্টি করে বলে, সেই বৃত্তের মধ্যে যারাই থাকবে, তারাই 'জনগণ মন' সম্পূর্ণ কথাটাই শুনতে পাবে। সোজা চলা আর বৃত্তে ঘোরার মধ্যে তাই পার্থক্য আছে। সোজা পথে চলতে হলে প্রখর শক্তির দ্বারা চলতে হয়। তাই তার পূর্ণ ধারা পাশের লোক পায় না। যেমন তীব্র আলোর ফোকাস সোজা পথে যত তীব্র হতে থাকবে, আশপাশে তত অন্ধকার সৃষ্টি হতে থাকবে। এই তীব্রতা বৃত্ত বিরোধী। বৃত্ত কেন্দ্রভিত্তিক বলে কেন্দ্র থেকে শক্তি সোজা যেমন চলছে, পাশাপাশি বৃত্তাকারে তেমনি ঘুরছে। শব্দ এইভাবে বৃত্ত সৃষ্টি করে বলে দূরত্ব অনুযায়ী কম বেশি শোনা গেলেও সবাই সব কথা শুনতে পায়। একমুখী তীব্র আলো সবাই পায় না। আলোর কণিকা শুধু সেই দিকে ঠেলা রাখে বলে, পাশের ঠেলায় ঘাটতি থাকে। বৃত্ত চরিত্রের আলো একদিকে চললে অন্যান্য দিকের ধারা বেঁকে গতি বাড়ায়। এখানেই টর্চ ইত্যাদির ফোকাসের মূল্য। তবু ফোকাসে আলোকে সজ্যবদ্ধ করলেও সেণ্টারিজম মেনে কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়তে চায়। আবার অনেকগুলো আলোর শক্তি আকাশে মিলে একাকার হয়ে যায়। এই শক্তিভরা আকাশ তাই অন্যান্য কণিকাদের চলার পথ বজায় রাখে। এই চলায় শক্তি উৎপাদন হয় অন্ধকারের স্থবিরত্বের সঙ্গে সংঘর্ষে।

আলোক কণিকা সব থেকে প্রভাবশালী হয় শক্তি উৎপাদনের দিক থেকে। সে আকাশকে তাই বেশি ঢেউযুক্ত করে এবং ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলে। শব্দ তরঙ্গ সেই কারেণ্টের সঙ্গে চললে প্রায় আলোর সমান শক্তি পায়। তা না হলে আকাশের ঢেউয়ে নিজের গতিতে চলে। আলো এই সব গতি অতিক্রম করে চলে গেলে ছোট ঢেউযুক্ত দ্রুততম ও শক্তিশালী আলোক কণিকা সৃষ্টি করে। লাল আলোক কণিকারা সজ্যবদ্ধ বলে ঢেউযুক্ত, কম দ্রুতগামী। গতি কম হলে ঢেউয়ে দানা বাঁধে। আকাশের নানা গতি বস্তুর মধ্যে চলতে চলতে পরমাণু

সৃষ্টি করে। আবার উৎস থেকে আলোক কণিকা বেরুলে কাছের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে চেনা যায়। দূরে চলে যাওয়ায় গতির ঢেউরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকায় কণিকাগুলোকে আলাদা আলাদা চেনা যায় না। আলো ছাড়া এই পরিবেশে সবার গতি কমতে থাকে। এমন কি মৃদু আলো বাধা পড়ে যায় এই পরিবেশে। এই গতি কমের জন্য শব্দ চলার সময় যেমন সব দিকে সম্পূর্ণ গানটা শোনাতে শোনাতে যায়, তেমনি বাইরের আবহাওয়ার চাপে শোনাতে শোনাতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে। এই যাওয়া ও আসার ফলে জনগণমন ইত্যাদি কথা আলোর মত আবহাওয়া ভেদ করে নিরুদ্দেশ না হওয়ায় সম্পূর্ণ শুনবার সুযোগ পাই। গান বৃত্তাকারে চলার সময় প্রথমবার যে শ্রোতা যে কথাগুলো শোনে দ্বিতীয়বার সেই কথাগুলো শুনতে পায় না আবহাওয়ায় প্রতিফলন হলেও। গান চলাকালীন প্রতিফলন ফিরে আসতে পারে না বিরোধী শক্তি প্রবল থাকায়। গান বা কথা শেষ হলে প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ফাঁকা মাঠে অনেকগুলো শব্দ করলে শেষ শব্দটা প্রতিধ্বনি হয়ে আসে। আগের গুলো আসে না বিরোধী শব্দের গতি প্রবল থাকায়।

সূর্য তার আবহাওয়াতে মিশতে শক্তি প্রকাশ করছে। আবহাওয়াও তার সঙ্গে মিশতে শক্তি প্রকাশ করছে। দুই শক্তির সংঘর্ষে উভয় উভয়কে গ্রহণ করছে। এই মেশামিশি জানতে হলে সূর্যে এবং আবহাওয়ায় দাঁড়াতে হবে। তখন দেখা যাবে উভয়ের দূরত্বের মধ্যে স্তরে স্তরে কত রঙ সৃষ্টি হয়েছে। এই এক এক স্তরে দাঁড়িয়ে সূর্যকে এক এক রঙের দেখা যাবে। কোন দর্শকের যদি চোখের রোগ অথবা জণ্ডিজ হয়, সে আবার অন্য রকম দেখবে। এই নানা দেখা নানা কবির মনে নানা কবিতা সৃষ্টি করতে পারে। কারণ মন এখানে নির্ভরযোগ্য। এই সমস্ত বৈচিত্র্যই চরিত্র গঠন করে। এই সব বৈচিত্র্যময় চরিত্রের প্রভাব পড়ে সংসারে। আবার সংসারের প্রভাব পড়ে মনে। তাদের মধ্যে তখন চলতে থাকে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বই ঠিক করে কোনটা নশ্বর কোনটা অবিনশ্বর। হয়তো দেখা যাবে যাকে অবিনশ্বর বলা হচ্ছে সেই নশ্বর। নশ্বরই হয়তো ঈশ্বর বা বিজ্ঞানের পরম কেন্দ্র হয়ে পড়ছে। বাইবেলের ঈশ্বর বলেছিলেন, পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ঘোরে। এই ধারণাকেই অবিনশ্বর ভাবা হয়েছিল। বিজ্ঞানের ঈশ্বর সেই ভুল আজ ভেঙে দিয়েছে। সূর্যের চারদিকেই যে পৃথিবী ঘোরে তা সবাই মেনে নিয়েছে। আসলে সবার ঈশ্বর তো একই। তাই আলোর মধ্যে অন্ধকার মেশে, অন্ধকারের মধ্যেও আলো মেশে এবং এখন সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে। এ সবই একেরই ইঙ্গিত।

এক থেকে বেরিয়ে ঘুরে এলেই দ্বন্দ্ব। অন্ধকারে আলো দেখা না গেলেও আলো শক্তি হিসাবে কাজ করছে বলেই অনেক জীব রাত্রে দেখতে পায়। যে অন্ধকারে আলো নাই সে অন্ধকার পরম একের কেন্দ্রে বাস করে দ্বন্দ্বহীন হয়ে। তাকে দেখা না গেলেও স্বতঃসিদ্ধ। কেন্দ্রের নিশ্চলতা আছে বলেই সেখানে বাইরের শক্তি ঘা খেয়ে বেরিয়ে এসে শক্তি প্রকাশ করে। সমান বেগে দুটো শক্তি চললে নূতন শক্তির জন্ম দিতে পারে না। শক্তি দুটি আগুপিছু হলে এক অপরকে অতিক্রম করবার সময় সংঘর্ষে নূতন শক্তির জন্ম দিতে পারে। মন্দ গতি পিছু-শক্তি হিসাবে ক্ষেত্রের কেন্দ্রের কাজ করে। এই সব কেন্দ্র পরম কেন্দ্র বা পরমাত্মা থেকে আসা জীবনকেন্দ্র বা জীবাত্মা, বস্তুর কেন্দ্র বা বস্তুর আত্মা। এদের বলে আপেক্ষিকক্ষুদ্র স্থির কেন্দ্র।

এমনি আকাশে বাতাসে মাটিতে সর্বত্র পারমাণবিক চরিত্র সৃষ্টি হচ্ছে, স্থিতি হচ্ছে, লয় হচ্ছে। আমাদের শরীরের কেন্দ্র তো আছেই, শরীরের কোষের কেন্দ্র, রক্ত চলাচলের জন্য বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিরাদের সংযোগস্থলের কেন্দ্র। যেখান থেকে পরিবর্তন সূচিত হয় সেখানটাই কেন্দ্র। এই সব চলমান কেন্দ্রের জন্য এক তারকা প্রথম স্তর থেকে পরিবর্তিত হতে হতে মৃত্যু পর্যন্ত চলে যায় নতুন নতুন নাম নিতে নিতে। একই ক্রমে বহু হয়ে চলে। কোন নিয়ম আমাদের কাছে নতুন ঠেকলেও প্রকৃতির কাছে তা চিরদিনের।

পালসার (Pulsar) এক ধরনের তারা। তার শরীরের অণু পরমাণু বা ইলেকট্রন প্রোটন নাই। তার শরীরের প্রায় সর্বাংশ নিউট্রন দ্বারা গঠিত বলেই তাকে নিউট্রন তারা (Neutron star) বলে। তাতে নিউট্রনের মত স্থূল বস্তু থাকায় সে স্পষ্ট আলো বিকিরণ করতে পারে না। তবে কোন কোন পালসার আলো বিকিরণ করে ইলেকট্রন ইত্যাদি কণারা স্থূল পর্যায়ে পৌছায় নি বলে। তারা স্থূল পর্যায়ে পৌছালে শুধু রেডিও তরঙ্গ উৎসারিত হবে। এই রেডিও তরঙ্গই প্রমাণ করে তারকা জগতেও অণুপরমাণুদের ধ্রুবত্ব নাই। কেন্দ্রভিত্তিক চাপ ও উৎসারণের পরে তাদের অবস্থা নির্ভর করে।

আলোর মত একাধিক্রমে পালসার বা স্পন্দমান রেডিও তারা (Pulsaring radio star) রেডিও তরঙ্গ প্রকাশ করে না। প্রকাশ করে স্পন্দনের মত ঝলকে ঝলকে। অবশ্য আলোকে তরঙ্গ বললে তারও স্পন্দন আছে তরঙ্গায়িত আবহাওয়া অতিক্রমের জন্য। স্পন্দন দুই প্রকারের হতে পারে, উৎসের স্পন্দন ও চলনের স্পন্দন। এই সব কারণে তারাদের মিটমিট করতে দেখা

যায়। আমরা ঠিক মত দেখলে গ্রহকেও মিটমিট করতে দেখব, কারণ সূর্যের আলো একভাবে পেতে থাকলে এবড়ো খেবড়ো গ্রহরাও ঘুরছে। আকর্ষণ বিকর্ষণ মেনে নিতে হলে স্পন্দন মেনে নিতে হয়। আলোর উৎসের স্পন্দনও মেনে নিতে হয় অক্সিজেনের পতনের জন্য। মৌল হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ামে, হিলিয়াম থেকে অন্য ভারী বস্তু সৃষ্টি হওয়ার ফলে পালসার ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। ক্রমে তার নাম হয় শ্বেত বামন, কৃষ্ণ বামন ইত্যাদি। কোন তারার এখানেও শেষ নয়। কোন তারা সূর্যের চেয়ে ১—৪ গুণের বেশি ভর বিশিষ্ট হতে পারে না। কিন্তু সে তারা আরও ভর বিশিষ্ট হয়ে গেলে বিস্ফোরিত হয়ে চন্দ্রশেখর সীমার মধ্যে আসবে।

সূর্য যেখানে একটি ঘূর্ণন সম্পূর্ণ করতে সময় নেয় এক মাস, নিরেট হওয়ার ফলে সেই ঘূর্ণন সম্পূর্ণ করতে পালসারের সময় লাগে মাত্র এক সেকেণ্ড। পালসারের বিকিরণ কমে যাওয়ায় বাইরের চাপ বাড়লেও ঘূর্ণন বেগ বেড়ে যায়। আকর্ষণ বিকর্ষণের ডালপালা আর বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এমনি নানা কারণে সৃষ্টিতে চলার চেয়ে ঘূর্ণন সোজা। প্রকৃতির সমস্ত সূর্য গ্রহ উপগ্রহদের ঘূর্ণনের আবহাওয়া সবাইকে ঘোরাতে চায়। কোন ঠিকানায় পৌঁছাতে ঘুরতে হয়, সেই ঠিকানা না পেলে অন্ধের মত ঘুরতে হয়। নিজের নিজের শক্তি অনুযায়ী ঘুরে ঘুরে ঠিকানা বের করা যায়। নক্ষত্রের বিরাট বিস্ফোরণে অণুপরমাণুর সৃষ্টি হয় না। সেই বিস্ফোরণজনিত ছোট ছোট ধাক্কায় অণুপরমাণুর সৃষ্টি হয়। মূল ব্যক্তিতে সব ব্যক্তিত্ব বাঁধা। একক ক্ষেত্রতত্ত্ব এই মূলকেই জানতে চায়। প্রতি মুহূর্তে সূর্যের বিকর্ষণ গ্রহদের ঠেলে দিচ্ছে, আবার আকর্ষণে টেনে ধরছে। এই কারণে গোলাকার বস্তুর না ঘুরে উপায় থাকে না।

সূর্য শুধু একমাত্র সূর্য নয়। সমগ্রকে নিয়ে একটা মহাসূর্য ধরতে হবে। তাদের সম্মিলিত শক্তি সূর্যের শক্তির অসংখ্য গুণ বেশি। সেখানে অনেক তারা সূর্যের ভরকে অতিক্রম করে বেঁচে থাকে। তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সীমা। এই সব সীমারা আছে অনন্তে। ঠিকানা না পেয়ে ঘুরতে থাকা হল অনন্তে ঘোরা। অনন্তের সীমানা আমরা পাচ্ছি না বলে অনন্তে ঘুরছি। চন্দ্রশেখর সীমা একটা ঠিকানা। সে ঠিকানা সত্য হলেও অন্য ঠিকানার ক্ষেত্রে নাও হতে পারে।

ছোট-বড়র আপেক্ষিকতাবাদও এখানে চলে না। একটার চেয়ে অন্যটা বড় অথবা ছোট। এই হিসাব কয়েকটার মধ্যে চলে। আইনস্টাইনের এই সীমাও

অনন্তে অচল। দুয়ের হিসাব যেখানে পাচ্ছি, সেখানে আপেক্ষিকতাবাদের কি দাম? পাঁচ হাত একটা দড়ির চেয়ে অন্য দড়িটা দশ হাত বড়। এই হিসাব সত্য হলেও অনন্তে চলে না। সেই পাঁচ হাত দড়ির চেয়ে অনন্ত কত বড় বলা সম্ভব নয়। গ্রহ উপগ্রহদের আলো বিচার করে ছোট বড় মাপা যায়। কিন্তু সেই হিসাব বলে দেয় না অনন্ত কত বড়। আমরা যে সূর্য গ্রহ উপগ্রহদের দেখতে পাচ্ছি না তাদের হিসাব কেমন করে করব? যাদের দেখতে পাচ্ছি না, তাদের রঙ জেনে মাপা সম্ভব নয়। রঙ যদি সবার এক হত, তাহলে বলে দেওয়া যেত যাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি না, তাদের সবাই দেখতে পাওয়া গ্রহ উপগ্রহদের মত বড়। সবাই তো এক আকাশের নয়। সূর্য গ্রহ উপগ্রহ সবাই কি এক আকারের। বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন রঙের অনন্তের হিসাবকে বরং দুরূহ করে তুলেছে।

একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য না থাকলে সবাই একে মিশে পিণ্ড হয়ে যেত। আর শূন্য অনন্তের বাকী স্থান জুড়ে থাকত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। শূন্য তাদের আকর্ষণ করে নানা আকারে ভাঙবে এবং গড়বে। বস্তুর মধ্যে শূন্য আছে এবং শূন্যের মধ্যে বস্তু আছে। তাই এক থেকে অপরকে আলাদা করা যায় না। শূন্য হল বস্তুর তুলনায় আপেক্ষিক শূন্য, বস্তু হল শূন্যের তুলনায় আপেক্ষিক বস্তু। অনন্তের আদি ঈশ্বর কেন্দ্র এই সম্পর্ক আকর্ষণ বিকর্ষণে গড়ে দিয়েছে।

কেন্দ্র ছাড়া যেমন বস্তু ও শূন্য হয় না। বস্তু ও শূন্য ছাড়াও তেমনি কেন্দ্র হয় না। তবে আমরা বস্তু ও শূন্যকে ছেড়ে কেন্দ্রের এত গুরুত্ব দেব কেন? গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নাই। সবাইকে এক নিয়মে বাঁধতে হলে বস্তু ও শূন্যে সমগ্রকে দুই ভাগ না করে কেন্দ্রকে চাবিকাঠি ভাবতেই হবে। কেন্দ্র ধর্মের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সব সময় এক পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণার কেন্দ্র আছে। সেই বহু কেন্দ্রকে পৃথিবীর এক কেন্দ্র পরিচালনা করছে। বিজ্ঞান আর ধর্ম সেই ধূলিকণাদের নিয়ে পড়ে আছে একক ক্ষেত্র তত্ত্বে আসবার জন্য। ধর্ম যতই বিজ্ঞানকে গালাগালি দিক, বিজ্ঞান যতই ধর্মকে গালাগালি দিক দুই-ই ক্রমে পরমাত্মাকে ছেড়ে বহু আত্মায় চলে যাচ্ছে। যত তারা নানা উপলব্ধি ও আবিষ্কারে যাচ্ছে, তত তারা বহুর বিভ্রান্তিতে ভুগছে।

অনন্ত তো বিরাটই। সেই অনন্তকে আমরা হাতের মুঠির মধ্যে আনতে পারি। একটা খেলার বল, সে ছোট হলেও অনন্ত। তার গায়ে একটা পিপীলিকা ছেড়ে দিলে সে হাঁটতেই থাকবে কিন্তু অন্ত খুঁজে পাবে না। একটা

পরমাণু তো আরও কত ছোট, তবু তারও অন্ত নাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেমনি অনন্ত। তার আকাশ মহাকাশ তার কেন্দ্রেরই রূপ। এই একেশ্বরই বিজ্ঞান ও ধর্মকে ঘোল খাওয়াচ্ছে।

একটা পরমাণুর কেন্দ্রে আছে ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটন ও আধানবিহীন নিউট্রন। এই দুটিকে ঘিরে আছে যে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিন, তার বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইলেকট্রন। এই পরমাণুর সঙ্গে হাইড্রোজেন পরমাণুর পার্থক্য আছে। তার আছে একটা প্রোটন ও একটা ইলেকট্রন। অন্যান্য পরমাণুর ক্ষেত্রে এসব একটা করে নাই, একাধিক আছে। একক ক্ষেত্র তত্ত্বে হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে অন্যান্য পরমাণুর পার্থক্য দেখলে হবে না। তার কারণ খুঁজে বের না করলে নির্বাণ অসম্ভব। এই দেখা ঈশ্বরের সংখ্যা বাড়ায়। আর কারণ খোঁজা ঈশ্বরের সংখ্যা কমায়। একক ক্ষেত্র তত্ত্বে আমরা পরমাণু কাকে বলে তাই জানি না। Strong interaction বা Weak interaction তো দূরের কথা। আমরা ঈশ্বরকে সর্বকারণের কারণ বলেই উদ্ধার পেতে চাই। কারণ উপলব্ধি করতে পারি না বলেই সাম্প্রদায়িকতার চক্রে জড়িয়ে পড়ছি। মুক্তি নাই।

আমরা দেখছি, ধনাত্মক নিউক্লিয়স ইলেকট্রনকে টানছে। আসলে নিউক্লিয়স টানছে না। নিউক্লিয়াস প্রোটন ও ইলেকট্রনের মাঝখানে থেকে শূন্যতা পূর্ণতার আপেক্ষিকতা রক্ষার জন্য ছাঁকনির কাজ করছে। ছাঁকনিতে বস্তু ছেঁকে আপেক্ষিক শূন্যতায় যায়। শূন্যতা যেখানেই ছাঁকনি সেখানেই আছে। আর সেখানেই বস্তু কণারা ভিড় করবেই। এই কারণেই জরায়ুতে ডিম্বাণুর চারধারে শুক্রাণুরা ভিড় করে। ছোট পরমাণুতে মাত্র একটা কেন্দ্র থাকে বলে বেশি শক্তিশালী। বড় বস্তুতে একটা মূল কেন্দ্র থাকলেও অণু পরমাণুদের কেন্দ্র শক্তি প্রশমিত করে। বস্তুধারা ছেঁকে হচ্ছে শূন্য ধারা। এই ছাঁকা শূন্যধারা প্রোটনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের পতন ঘটাচ্ছে। আবার সেই ধারা আরও সূক্ষ্ম হয়ে এসে ইলেকট্রনকে ঠেলে ধরেছে। এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুর বাইরের ধারা পরমাণুকে আকার দিচ্ছে, ইলেকট্রনকে চেপে ধরছে। সেই ধারাই নিউক্লিয়স ভেদ করে পূর্বকথিত ভাবে কাজ করছে। অর্থাৎ সেই ধারা নিউক্লিয়সে ছেকে প্রোটনের কাছে গিয়ে হচ্চে শূন্যধারা। তা প্রোটনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় শূন্যতা সৃষ্টি করে ইলেকট্রনকে টানছে। এই নীতিরই রকমারিত্বে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে।

এই কারণেই ধনাত্মক নিউক্লিয়স এবং ঋণাত্মক ইলেকট্রনের মধ্যে পারস্পরিক

ক্রিয়া ঘটিয়ে Electro magnetic interaction সৃষ্টি করেছে। ইলেকট্রনরা একই স্তরে থাকে বলেই শূন্যতা পূর্ণতার পার্থক্য না থাকায় পরস্পরকে না টেনে ঠেলে দেয়। এই যে ঠেলা ও তাদের চলার শক্তি এসেছে কোথা থেকে? সে শক্তি এসেছে নিউক্লিয়স ছাঁকা পার্থক্য থেকে। একই স্তরে সেই পার্থক্য থাকে না। স্তরভেদে পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

এই পার্থক্য সৃষ্ট তড়িৎ-চৌম্বক ক্রিয়ায় বাড়ির বৈদ্যুতিক পাখা ঘোরে, বৈদ্যুতিক ট্রেন চলে ইত্যাদি। একই স্তরের ইলেকট্রনরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করলেও একই স্তরে থেকে প্রোটন নিউট্রনগুলো পরস্পরে ভীষণ ভাবে আটকে আছে কেন? একেই বলে প্রবল পারস্পরিক ক্রিয়া বা Strong intraction। এর কারণ হচ্ছে, কেন্দ্রের সংকীর্ণতা ও প্রোটন ও নিউট্রনের পার্থক্য।

একই স্তরে সব ইলেকট্রনের পার্থক্য থাকল না তবে, এদের বেলায় কেন পার্থক্য এল? তার উত্তরে বলতে হয়, একটা পরমাণুর কেন্দ্র তো একটাই। হাইড্রোজেনের বেলায় প্রোটন যেমন আছে (প্রোটনও কেন্দ্র নয়, তারও কেন্দ্র আছে ক্রমঅনন্তে) অন্যান্য পরমাণুর বেলাতেও প্রোটন কেন্দ্রে আছে। নিউট্রনকে কেন্দ্র ধরলে হাইড্রোজেনের প্রোটনকে তবে নিউট্রন বলতে হয়। নইলে পরমাণুর একত্ব থাকে না। তাই প্রোটন ও নিউট্রনের আপেক্ষিক শূন্যতা পূর্ণতা পরস্পরকে প্রবল ক্রিয়ায় ধরে রেখেছে।

এই কারণের কাছে পদার্থ বিজ্ঞানীদের মন গড়া কারণ দাঁড়াতে পারে না। তাঁরা বলেছেন, একটা টেনিস বল নিয়ে দুই খেলোয়ার টেনিস খেলছে। এই টেনিস বলের আদানপ্রদানের জন্য তাদের কেউ কাউকে ছেড়ে যাচ্ছে না। এদের মধ্যে কেউ এই খেলা না বুঝলে অথবা তার নিজের প্রিয় খেলার খবর পেলে কিন্তু ছেড়ে যাবে। তাছাড়া পদার্থদের ব্রেন নাই যে, তারা চিন্তা করে একে অপরকে ধরে রেখেছে। এখানে চাই সর্বাত্মক শৃঙ্খলা।

তাঁরা বলেছেন, এখানে খেলোয়াড় দুজন হচ্ছে প্রোটন বা নিউট্রন। বলটা হচ্ছে মেসন। সরকারী মেসোর মত এই মেসন। ঘা খেয়ে একবার ওর কাছে যাচ্ছে, আবার ওখানে ঘা খেয়ে এর কাছে আসছে। একটা বলে এমনি দুজনে ঘা দিলে দুজনেই পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। কারণ শক্তি যেদিকে প্রয়োগ করা হয়, তার বিপরীত দিকে একটা ঠেলা থাকে, যার জন্য পরস্পরের মধ্যে বিকর্ষণ ছাড়া আকর্ষণ থাকতে পারে না। প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে বল ছোড়াছুড়ি হচ্ছে অনেক। একের শূন্যতার আকর্ষণে অন্যের বল তাকে পূর্ণ

করছে, তার শূন্যতার আকর্ষণে আবার একে পূর্ণ করছে। বহিরাগত ধারা পরমাণুর কেন্দ্রে আঘাত করে। তাই প্রোটন তাতে পূর্ণ হয়ে নিউট্রনের শূন্যতাকে পূর্ণ করছে। প্রোটনের পূর্ণতা নিউট্রনকে ছাপিয়ে আবার প্রোটনকে পূর্ণ করে। প্রশ্ন আসতে পারে, যে প্রোটন পূর্ণ হয়ে নিউট্রনকে পূর্ণ করল, সে কেমন করে নিউট্রনের বিকর্ষিত বস্তুকে স্থান দিল? তার উত্তরে বলা যায়, যে পাত্রে ইটের খোয়া ভরা আছে, সে পাত্রে আর ইটের খোয়া না ধরলেও বালি ধরে। বালি খোয়ার ফাঁকে ফাঁকে স্থান নেয় এই আপেক্ষিক চূর্ণতাই তো আপেক্ষিক শূন্যতা সৃষ্টি করে। এই ধারা এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে গেলে বিক্রিয়ায় চূর্ণ হয়ে যায়। সেই চূর্ণ বস্তু ছাঁকাছাকি হয় নিউক্লিয়াসের মত ছাঁকনিতে।

ছাঁকাছাকি না হলে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তির পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। পার্থক্য না হলে শূন্যতা পূর্ণতা হয় না। একটা হাওয়ার সঙ্গে অন্য হাওয়ার পার্থক্য হল, একটার ঘনত্ব বেশি, অন্যটার লঘুত্ব বেশি। শূন্যতারও ঘনত্ব লঘুত্বের পার্থক্য আছে। লঘুত্ব ঘনত্বকে গড়ে লঘু শক্তির পূরণের দ্বারা। ঘনত্বও লঘুত্বকে গড়ে ঘনশক্তির ক্ষয়ের দ্বারা। ঘনশক্তি ক্ষয় হতে হতে চলায় শেষ ক্ষয় হয়ে আকাশ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। ঘনত্বের ক্ষয় হতে সময় বেশি লাগে বলে বেশি দূর যেতে পারে, লঘুত্বের ক্ষয় হতে সময় কম লাগে বলে বেশি দূর যেতে পারে না। বেশি দূর যেতে না পারলেও এই দূরত্ব ঘনত্বের দূরত্বের মধ্যেও দেখা যেতে পারে। যখন ঘনত্ব ক্ষয় হতে হতে লঘুত্বের স্তরে আসে তখন দুই-এর লঘুত্ব এক হয়ে যায়। মূলতঃ ঘনত্ব লঘুত্ব এক কেন্দ্রিক।

লঘুশক্তি আকাশে মুখ লুকিয়ে আকাশ সৃষ্টি করছে ঘনত্বকে ক্ষয় করে নিয়ে গিয়ে। ঘনশক্তিও বস্তুতে মুখ লুকিয়ে বস্তু সৃষ্টি করছে লঘুত্বকে ঘন করে নিয়ে গিয়ে। লঘুত্বের প্রসারতায় নানা দিকে লঘুগতি বলে সত্য সত্তা থাকে না। ঘনত্বের কেন্দ্রভিত্তিক সংকীর্ণতায় একদিকে ঘনগতি বলে সত্য সত্তা থাকে। তাহলে কেন্দ্রই সত্য। প্রসারতাও মিথ্যা নয়, বিভ্রান্তিকর। প্রসারতায় না থাকাকে মিথ্যা বলে না, মিথ্যা বলে বিভ্রান্তিকে। সেখানেও বিভ্রান্তি থাকে না তার ব্যাখ্যা দিতে পারলে। এই শক্তির তরঙ্গ দৈর্ঘ কম বলে দেখতে পাই না। তাই এত বিভ্রান্তি। তবে আলোর মত ঘনশক্তিকে আমরা দেখতে পাই বলে এতটা বিভ্রান্তি থাকে না।

আমরা যে নিশ্বাস গ্রহণ করি, তা ঠাণ্ডা গুরুশক্তি। আমরা যে প্রশ্বাস ছাড়ি তা গরম লঘুশক্তি। নাকে হাওয়া ছেড়ে আবার টানার মধ্য সময়ে কার্যকরী

সময়। এই সময়ের মধ্যে চিন্তা দানা বেঁধে যায়। নইলে গভীর চিন্তা হাওয়া ছাড়ার সময় দানা বাঁধে না, আবার শুধু গ্রহণের সময় দানা বাঁধে না। মানুষ ছুটতে থাকলে ছোটার শক্তি বাড়তে থাকে। অবশ্য তখন পায়ের পক্ষে সেই শক্তি গ্রহণ করার ক্ষমতা চাই। বস্তুর মত জীব ছুটলেও শক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। এই শক্তি যখন চরমে ওঠে, তখন দেহ সে শক্তি ধারণ করতে পারে না বলেই হাঁপায়। এমনি আলোক কণিকা যত ছুটতে থাকে তত হাঁপায় বা কম্পন সৃষ্টি করে বলেই আলোর গতি তীব্র হয়। এই চলনে কণিকার শরীরে ঘর্ষণে বাইরের ময়লা না পড়ায় আলো দেখতে পাই। গতি কমলে আবহাওয়ার ময়লা জমে বলে অন্ধকার অনুভব করি। শক্তি বস্তু নয় আবার ভাবও নয়। সে উভয়েরর যোগাযোগের বাহন। সে সবসময় বস্তু ও ভাবের সঙ্গে পার্থক্য রেখে চলে বলে চলাচল করে। যাকে দেখা যায় সেই বস্তু। যাকে দেখা যায় না সে ভাব। আলোক শক্তিকে তরঙ্গের বিচারে দেখাও যায়, আবার দেখাও যায় না। দেখা নির্ভর করে তরঙ্গের উপর।

অনেক কাজ করায় সময় অনেক টুকরো হয়ে যায় দ্রুত, কাজ করার সময় দ্রুত হয়ে যায়। আলোক কণিকাও সেই সময় মেনে চলে বলে অন্ধকারের পার্থক্যে আলো দেখতে পাই। অনন্ত অন্ধকারের বুকে যেমন নানা আলো, অনন্ত সময়ের বুকে তেমনি নানা সময়। একটা বসে থাকা মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির সময় যতটা মন্থর, ছুটতে থাকা মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির সময় ততটা দ্রুত। তাহলে বসে থাকা মানুষের সময় অনন্ত সময়ের খানিকটা বেশি গ্রহণ করে। দেবতারা অমর বলেই তাঁদের সময় অনন্ত। তাই যে দেবতাকে পাঁচ হাজার বছর আগে যে বয়সের দেখা গিয়েছিল, এখনও সেই বয়সের দেখা যায়। অনন্ত সময়ের সঙ্গে তার নিকট সম্বন্ধ। গতির তীব্রতা সময়কে তাই শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে।

একটা বস্তু অনন্ত সময়ের অনেকখানি নিতে পারে। একটা অলস মানুষও, দীর্ঘ একটানা সময় একটা পেতে পারে, ঈশ্বরকে পূজা করে পাদপদ্মে দীর্ঘ সময় স্থান পেতে পারে। তাই তাতে মুক্তিও পেতে পারে। কিন্তু তাতে অনন্তের পার্থক্য ঘুচাতে টুকরো টুকরো সময়ের পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া যায় না। যেখানে অচেনাকে চেনাজনিত মুক্তি পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের ক্ষমতা বোঝা যায়।

মোটা মানুষের যেমন চর্বি আছে, পরমাণুর তেমনি চর্বি আছে। সে চর্বি হল নিউট্রন। হাইড্রোজেন পরমাণুর সে চর্বি নাই। তবু সে পরমাণু হয়ে

রোগা মানুষের মত বেঁচে আছে। মোটা মানুষকে না খেতে দিলে চর্বি তার পুষ্টতা যোগায়, যদিও পাকস্থলীর খাদ্যই চর্বিকে তৈরি করেছিল। তেমনি নিউট্রনও ক্ষয় হয়ে প্রোটন, ইলেকট্রন এবং নিউট্রিনো (আধান বিহীন ক্ষুদ্র কণিকা) তৈরি করে। এখানে নিউট্রন হল উপাদান। এই উপাদানে তৈরি ঐসব কণারা ক্ষেত্র অনুযায়ী সক্রিয় হয়। কারণ আকর্ষণ বিকর্ষণ ক্ষেত্র অনুযায়ী কম বেশি হয়। ক্ষেত্রের মূল্য দিতেই হবে। নিউট্রিনো যদি উপযুক্ত ক্ষেত্র পায় আধানযুক্ত কণাদের মত আধানযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। এই নিউট্রন, প্রোটন, ইলেকট্রন এবং নিউট্রিনোদের মধ্যের পারস্পরিক ক্রিয়াকে দুর্বল পারস্পরিক ক্রিয়া বা Weak interaction বলে। এইসব কণাদের প্রত্যেকেরই স্বকীয়তা আছে। এই স্বকীয়তার অধিকার স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়। সেই অধিকারে আঘাত না করলে শক্তি প্রকাশ হয় না। স্বাভাবিক অবস্থায় যার সম্পত্তি আছে সে শক্তি প্রকাশ করে না। তার অধিকারে হাত দিলে শক্তি প্রকাশ করে। আগুনও স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অধিকার নিয়ে। তাতে একটা বস্তু দিলে অধিকারের পার্থক্যে শক্তি প্রকাশ করে সেই স্থান দখল করতে বস্তুটিকে পুড়িয়ে ফেলে। একেই বলে শক্তি।

মহাকর্ষ ক্ষেত্রের সঙ্গে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের মিলনের চিন্তায় আইনস্টাইন একক ক্ষেত্রতত্ত্বের কথা বলেন। তিনি বস্তু জগতকে একে বাঁধতে মহাকর্ষ শক্তি, তড়িৎ-চৌম্বক শক্তি ও পরমাণু কেন্দ্রিক শক্তিদের এক শক্তিতে বাঁধতে চেয়েছিলেন। ক্ষেত্র সমীকরণের (Field equation) অর্থাৎ একপ্রকার সমীকরণ সমষ্টির জ্যামিতিক ক্ষেত্র ও মহাকর্ষ ক্ষেত্রকে এক করেছিলেন। এই হিসাব সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মধ্যে পড়ে। এই দুই ক্ষেত্রকে এক করতে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন, বস্তুর অবস্থান থেকেই মহাকর্ষ ক্ষেত্রের উৎপত্তি। এই বৈশিষ্ট্য আবার নির্ভর করে বস্তুর ভর, তার গতিবেগ এবং তড়িৎ-চৌম্বকের উপর। এই তড়িৎ-চৌম্বকের কারণ চলমান তড়িতাহিত বস্তু তার গতিপথের চতুর্দিকে সৃষ্টি করে চলে এক তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র।

তাতে দেখা গেল তড়িৎ-চৌম্বক শক্তি বস্তুভরের উপর নির্ভর করে না। সে তড়িৎ-আধানের উপর নির্ভরশীল। এই আধান ও তার নিজস্ব চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে তড়িতাহিত বস্তুর গতিপথ জানা যাবে। জ্যামিতির দ্বারা ক্ষেত্র সম্পর্কীয় হিসাব চলে ভাল। ক্ষেত্রকে হিসাব করে তার শক্তির হিসাব চলে না। পরমাণুতে ইলেকট্রনের ঘূর্ণন আছে, অণুর মধ্যে তা নাই। তাই বলে কি

স্বীকার করব না পরমাণুর দ্বারা অণু গঠিত, বস্তু গঠিত? একই পরিমাণ বস্তুর বা শক্তি, সেই বস্তু তেজস্ক্রিয় হলে তার শক্তির তুলনা হয় না। যে বস্তু যে স্তর পার হয়ে গেছে, সেই বস্তুর মধ্যে পূর্বের গুণ নাও থাকতে পারে। জ্যামিতির একটা বৃত্ত আঁকতে একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে আঁকতে হয়। তার আকার, পরিমান ও শক্তির উপর জোর দেওয়া হয়নি। সেই ভুলই আইনস্টাইন বিজ্ঞানের উপর চাপিয়েছেন। অথচ তিনি যা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, তার মধ্যে বারবার কেন্দ্রবাদ উঁকি মেরেছে, তা লক্ষ্য করেন নি।

একক ক্ষেত্রতত্ত্বের জন্য ১৯৪৫ সালে তিনি নতুন ক্ষেত্রতত্ত্বের কথা বলেন। সেই তত্ত্বে আছে দুটি সোপান আরোহণের। এই সোপান আরোহণের পথে বাধা হয়ে আছে ৬৪টি সহ সমীকরণ। এই বাধা অতিক্রম করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত সমস্ত বিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন, এ বাধা অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

তেরো

যার কোন শেষ নাই, সেই অসীমকে অঙ্ক কষে হিসাব করা যায় না। হিসাব করতে হবে সেই অসীমের বস্তুগুলোকে গুণে অথবা ওজন করে। কেন্দ্রকেও অঙ্ক কষে হিসাব করা যায় না। তাকে ভেঙেও ভাগ করা যায় না। তাকে একটা তিলের সমান ভাবলেও ভুল করা হবে, তাকে পেতে তার অনন্ত গভীরে ঢুকতে হবে। সেখানেও শেষ নাই। তাকে ভাঙতে না পারলেও ভাঙতে হবে। বস্তুকে যত খণ্ডে ভাঙা যাবে, কেন্দ্র তত খণ্ড হবে। তাছাড়া কেন্দ্রকে ভাঙা যেমন যায় না, হিসাব করাও যায় না। অনন্তের যেমন দূরত্বের শেষ নাই, কেন্দ্রের তেমনি গভীরতার শেষ নাই। যে পর্যন্ত অঙ্কের সংখ্যা বা পরিমাণ চলেছে, সেই পর্যন্ত অঙ্ক চলেছে, বিজ্ঞান চলেছে। তারপর বিজ্ঞানকে ভাবের স্তরে চলতে হবে, যে স্তরের জন্য তারা ভাববাদী বিজ্ঞানীদের পাজমন্দ করে।

সেই অসীমে বাঘ গরু একঘাটে জল খেলেও কেউ কাউকে হিংসা করে না। সেখানে পাথর জলে ভাসলে, সোলা জলে ডুবলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। অবশ্য সেখানে তাও সম্ভব নয়। অনন্তের অসীমতা যে কতখানি আশ্চর্যজনক, তাই প্রকাশ করতে এইসব উপমা। সেই অনন্ত ক্ষুদ্র কেন্দ্রই অনন্ত বৃহৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আকর্ষণে বিকর্ষণে নাচাচ্ছে, তাই সে নাচছে। কেন্দ্র হতে হলেই

তার একটা শরীর হতে হবে। তাই অনন্ত বৃহৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শরীর হওয়ায় নাচুনির নেতৃত্বের জন্য কেন্দ্রের প্রয়োজন হয়েছে। কেন্দ্রেরও তার প্রয়োজন হয়েছে। কেন্দ্র না থাকলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হত না। অর্থাৎ এখানে একের জন্যই দুই। সেই এক হল সত্য। নেতৃত্বের জন্য কেন্দ্রই মূল সত্য।

সেই সত্যকে সবার মানতে হয়। সেই সত্যের জন্য গোঁড়া ধর্ম গ্যালিলিওকেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। সত্যকে স্বীকার না করে উপায় নাই। অবৈজ্ঞানিক কথা ধরে বসে থাকায় বহু মঠ মন্দির গীর্জা মসজিদ ইত্যাদির শিক্ষিত ভক্ত সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ধর্ম যেখানে অনন্তে পৌঁছাতে পারছে না সর্বসম্মত ভাবে সেখানে অঙ্ককে না মেনে উপায় নাই। এক সত্যে পৌঁছানো যায় নি বলে ধর্ম প্রতিষ্ঠানশাসিত স্কুলে যে বিজ্ঞান মানুষকে সৃষ্টিকর্তা মানতে রাজি নয়, অথচ সেই স্কুলে বিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছে। আবার সেই স্কুলের বিজ্ঞান পড়া ছেলেদের দিয়ে সংগঠনের গুরুকে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বানিয়ে পূজা করাচ্ছে। বিজ্ঞান শাসিত স্কুলেও আবার দেবদেবীকে অস্বীকার করা হচ্ছে। অথচ সেখানে প্রতি বছর সরস্বতী পূজাও হচ্ছে। এই টানা পোড়েনে বিজ্ঞানকে ও ধর্মকে এক সত্যে বাঁধা যাচ্ছে না। সেইসব স্কুলের ছাত্ররা সত্যের ক্ষেত্রে অমানুষ হচ্ছে, আর তাদের অভিভাবকরা ভাবছেন তাঁদের ছেলেরা কত না শিক্ষার আলোক পাচ্ছে।

বর্তমান পোপ দ্বিতীয় জনপল এই ধরণের একটা গলদ ভেঙ্গে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর এই নীতিকে আশা করি পৃথিবীর অন্যান্য শিক্ষিত ধর্মগুরুরা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবেন। এই ১৯৮৪ সালেই তিনি গ্যালিলিওকে স্বীকার করে নিলেন সেই সুপ্রাচীন ধর্মীয় গোষ্ঠীর নির্বাচিত প্রধান হয়ে।

এই গ্যালিলিওর জন্ম ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারী ইতালির পিসা নগরে। তিনি সঙ্গীত শিল্পীর ঘরে জন্ম নিয়েও অঙ্কের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। নিউটন আপেল পড়া দেখে যেমন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন তিনিও তেমনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র থাকাকালীন পিসা ক্যাথিড্রালে লণ্ঠন দুলতে দেখে ঘড়ির পেণ্ডুলাম তত্ত্ব অবিষ্কার করেন। সেই আলোর দোলন পথের দৈর্ঘ্য যা-ই থাকুক না কেন পূর্ণ একটা দোলনকে তিনি সময়ে বাঁধলেন এক ধরে।

আইনস্টাইন যেমন অ্যালজেবরা জ্যামিতির পথ ধরে বিজ্ঞানে এসেছিলেন, তেমনি গ্যালিলিও জ্যামিতির পথ ধরে বিজ্ঞানে এসেছিলেন। অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, বহু বিষয়ে তিনি আজও পথিকৃৎ। ধার্মিকরা তখন ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তাই প্রাচীন পন্থী অধ্যাপকদের সঙ্গে গোঁড়া ডমিনিকান

ধর্মযাজকরা মিলে তাঁর বিরোধিতা করতে লাগলেন। তাঁদের ধারণা অঙ্ক ও বিজ্ঞান দিয়ে হয়ত ধর্মকে গ্যালিলিও বিকৃত করতে চাইছেন। তাই তাঁর বিচার চালানো হল ধর্মীয় আদালতে। পরে তাঁর জেলও হয়ে যায়। এই মহান জ্ঞান তপস্বীর মৃত্যু হয় ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে।

এমনি বহু জ্ঞানতপস্বী আজও ধর্মের স্বীকৃতি পান নি। তাঁদের এখনই স্বীকৃতি দিতে দ্বিতীয় জন পলের আদর্শ অনুসরণ করুন সবাই। এই আদর্শ ধর্মগুরু আজ কেন্দ্রবাদী গণনীতিকে সমর্থন জানাতে পোল্যাণ্ডের শ্রমিক নেতা ওয়ালেসার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। এই কারণে আমিও তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। ভারতীয় কেন্দ্রবাদকে তিনি ইউরোপেও ছড়িয়ে দিতে যে সাহায্য করছেন, তার বৃত্তান্ত জানতে হলে আমার 'দলাদিষ্ট রাজনীতি বনাম ভোটোত্থিত গণনীতি' পুস্তকখানা পড়তে অনুরোধ করি। এই সব নানা কারণে তিনি অন্য ধর্মেরও ঈশ্বরবাদী, অনীশ্বরবাদী, রাষ্ট্র নেতা, বৈজ্ঞানিক সবার শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

এমনি ধর্মীয় সংস্থার স্বীকৃতি আইনস্টাইন জীবিত কালেই পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তার তেমন মর্যাদা দিতে পারেন নি। ধর্মকে তিনি তেমনভাবে জানতে চাননি। যদি তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মকে জানতে পারতেন, তবে তিনি মানব সমাজকে আরও অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারতেন। তাঁর যা প্রতিভা ছিল তা সর্বতোমুখী হওয়ার উপযোগী ছিল। তা প্রমাণ করে তাঁর একক ক্ষেত্রতত্ত্বের পরিকল্পনা। ক্ষেত্র থাকে পদার্থ-ভিত্তিক যাকে ধরা ছোঁয়া যায়। রসায়নে সেই ক্ষেত্র ভাঙতে থাকে অন্য সৃষ্টির জন্য। পদার্থ বিজ্ঞানী ও রসায়নবিজ্ঞানী তাই উভয়ে চরমে গেলে কাছাকাছি আসে। অথচ উভয়ের সঙ্গে উভয়ের সংযোগ না ঘটিয়ে বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। অবশ্য একজনের পক্ষে সব জানা সম্ভব নয় আইনস্টাইনের মত প্রতিভা থাকলেও। শুধু কেন্দ্রবাদ জানলে সব বিভাগ এক আধারে চলে আসে। তখন আর আলাদা আলাদা বিভাগ মনে হয় না। তাই কেন্দ্রবাদই বলতে পারে Unified field made by Unified centre theory। আইনস্টাইনের জীবনে এই মতবাদের সুযোগ ঘটেনি।

যত কেন্দ্রের সংকীর্ণতায় যাওয়া যাবে, তত অন্ধকার, তত কাঠিন্য। সংকীর্ণতার চাপে সেখানে শক্তি সঞ্চিত হয়। তেমনি যত কেন্দ্রের বাইরে অর্থাৎ প্রসরতায় আসা যাবে, তত আলোর প্রকাশ, আকাশের প্রকাশ। তা বার বার নানা ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। কালো সব রঙের ভিত্তি স্থল। প্রত্যেক রঙের নিজের নিজের প্রতিফলিত উচ্চতা আছে। সেই উচ্চতা নির্ধারিত হয় অন্ধকার থেকে দূরত্ব

অনুসারে। রাতের বেলায় কেউ আলো নিয়ে পুকুরের ঘোলা জলে আলো ফেললে তেমন উজ্জ্বল দেখাবে না। এই ঘোলা জল আমরা দেখতে পাই আলোর গতির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টির গতি সেই দিকে মিলিয়ে দিলে। তখন ওপার থেকে অর্থাৎ আলোর, প্রতিফলনের গতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেখলে আমরা কি দেখতে পাব ?

ঘোলা জলকে সেখানে দাঁড়িয়ে আয়নার মত স্বচ্ছ মনে হবে। আসলে জলের প্রতিফলিত আলো চোখের দৃষ্টিকে জলের দিকে নিয়ে গেল না, কারণ আলোর গতির সঙ্গে দৃষ্টি প্রবাহিত হয় নি বলে। চোখের দৃষ্টি সেই প্রতিফলনের বিরুদ্ধে জল থেকে উপরে থাকায় ঘোলা জল দেখা গেল না। দেখা গেল জল থেকে প্রতিফলনের উচ্চতা। আয়নাতেও আমরা এমনি প্রতিফলনের উচ্চতায় মুখ দেখি। পূর্বে বলেছি নানা রঙ নানা উচ্চতায় প্রকাশ পায়। এই প্রতিফলনের ফলে জলের ময়লা দেখা না গেলেও লোকটির ছায়ার নানা রঙ নানা উচ্চতায় দেখা গেল। নানা রঙের আলোর নানা উচ্চতায় দৃষ্টি বাধা পড়ে গিয়েছে বলে ঘোলা জলকে দেখা গেল না। সেই উচ্চতার সঙ্গে জলের ছায়ার সম্বন্ধ আছে, রঙের সম্বন্ধ আছে। আলোর পার থেকে দেখা ছায়াকে পটভূমি করে বস্তুর ছায়া জলের নিচে উল্‌টিয়ে গিয়েছে নিজের নানা রঙ নিয়ে। জলের নিচে বস্তুর ছায়ার উচ্চতাই নিম্নতা হয়েছে। চোখ তা দেখছে দৃষ্টি নানা রঙের উচ্চতায় বাঁধা বলে। প্রতিফলনে জলকে দেখা না গেলেও দৃষ্টিকে জলের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায়। সেই প্রতিফলনের স্থানে যে কোন কালো বস্তু রাখলে দৃষ্টি সেইটুকু স্থানে জলে নামে। কালো রঙ তেমনি দৃষ্টি টেনে রাখলেও তার পরে যে কোন রঙের বস্তু রাখলে দৃষ্টিকে ঠেলে রাখবে। কারণ প্রতিফলনের সাদা ও কালোর মধ্যে সব রঙের সৃষ্টি।

আলোর গতির সঙ্গে তাকিয়ে জলের নিচের ময়লা দেখা গেল। আলোর প্রতিফলনের গতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জলের নিচের ময়লা দেখা গেল না। দেখা গেল জলের উপর স্তরের নানা রঙের স্বচ্ছতা। তবু জলের নিচে ময়লার স্তরেও কিছুটা আলো ঢুকে গিয়েছে। প্রতিফলনের বিরুদ্ধে তা দেখা গেল না। সেখান থেকে জলের উপর পর্যন্ত ফাঁকে লোকটির ছায়া উল্টে পড়েছে। এই ফাঁকে শূন্যতার আকর্ষণ আছে বলেই ছায়া আকর্ষিত হয়েছে এবং জলের উপরে ছায়ার ভিত্তি এক বলে ছায়া উল্টে যেতে বাধ্য হয়েছে। আলোর গতির সঙ্গে তাকালে রশ্মিদের আলাদা আলাদা তীব্রতা কাজ করে তাই দৃষ্টি তাদের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।

আলোর গতির বিরুদ্ধে তাকালে রশ্মিদের সম্মিলিত গতি কাজ করে। তাই দৃষ্টি ছড়িয়ে না পড়ে আলোর দিকে আবদ্ধ হয়।

দর্শক যতটা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে, আয়নায় তা ধরা পড়ে দৃষ্টি আয়নার ততটা প্রতিফলন থেকে দূরে থাকে বলে। কোন কোন মসৃণতায় মুখ দেখা গেলেও আয়নার মত দর্শকের দূরত্ব এমনভাবে পাওয়া যাবে না প্রতিফলনের জোর না থাকায়। চকচকে বস্তুতে মুখ দেখা যায়, কোন কোন চকচকে বস্তুতে মুখ দেখা যায় না। কারণ দৃষ্টির অনুযায়ী প্রতিফলন নাই। যাতে মুখ দেখা গেলেও দূরত্ব দেখা যায় না, বুঝতে হবে তাতে প্রতিফলন কম। যাতে দূরত্ব দেখা যায় তাতে প্রতিফলন বেশি। সেখানে রৌদ্রের প্রতিফলন হলে জোর এত বেশি হবে যে, দৃষ্টি জল পর্যন্ত পৌঁছাবে না। জলে সেই অবস্থার বস্তুর রঙসহ ছায়া দেখা যাবে না। সেক্ষেত্রে অপর পার থেকে পাশ দিয়ে দেখলে রঙসহ ছায়া দেখা যাবে। কারণ আলো নানা রঙের স্তরে স্তরে ওঠে।

আয়নার ফ্রেম বা চারপাশের দেওয়াল ইত্যাদির দ্বারা সীমিত না থাকলে আয়নাটা কত দূরে আছে ধরা যায় না। কিন্তু অস্বচ্ছ বস্তুর দূরত্ব ধরা পড়ে। আয়নায় দৃষ্টি ঘা খেতে পারে না, প্রতিফলনে ঘা খায়। তাই আয়নার দূরত্ব বুঝতে পারা যায় না। অস্বচ্ছ বস্তুর প্রতিফলন না থাকায় দৃষ্টির আঘাতে দূরত্ব ধরা পড়ে। আয়নায় যে দূরত্বে দাঁড়িয়ে মুখ দেখা যায় সেই দূরত্ব বোঝা যায়। তখনও দৃষ্টি প্রতিফলনে বাধা পায়, কারণ দৃষ্টি আলো অনুযায়ী চলে। আয়নায় কালো বস্তু ধরলে, না দেখার জন্য তাকে কালো মনে হলেও তাকে কত দূর থেকে আয়নায় দেখানো হয়েছে, সেই দূরত্ব ধরা পড়ে দৃষ্টি কালো পর্যন্ত নেমে যায় বলে। দূরত্ব ও নিকটত্ব কালোকে নির্ভর করে সম্ভব অন্যান্য রঙের প্রতিফলনের জন্য সম্ভব নয়। সাদা থেকে যত কালো রঙের দিকে আসা যাবে, তত না দেখার দিকে আসা যাবে। দৃষ্টি সেখানকার মাপ বলে দেবে। যত কালো থেকে সাদার দিকে যাওয়া যাবে, তত দেখার দিকে আসা যাবে। দেখার দূরত্ব রঙের উপর নির্ভর করে।

পূর্ব দিক থেকে যখন সূর্য ওঠে, আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় পশ্চিমমুখী জানালা থাকলে সেই ভোরের আলো আবহাওয়ায় প্রতিফলিত হয়ে বেঁকে ঘরে ঢোকে। এখানেই প্রমাণিত হয় আলোক তরঙ্গ আলোর গতি বাড়ার জন্য নয়, আলো সৃষ্টির ঘর্ষণের জন্য। মহাকাশ কালো। সূর্য থেকে আসা শক্তি কণিকা এই কালো মহাকাশ ভেদ করে আসার সময় সংঘর্ষে কিছুটা চকচক

করে মাত্র। কিন্তু পৃথিবীর আবহাওয়ার সংঘর্ষে আমরা রৌদ্র পাই। এসব আবহাওয়ায় এক এক শক্তি কণিকার এক এক গতি। এই গতি দেখেই চেনা যায় আলোর গতি কি হাওয়ার গতি। ক্ষুদ্র কণার গতির মধ্যে আলোক কণার গতিকে আমরা বুঝতে ও অনুভব করতে পারি বলেই বলা হয়েছে। কারণ অনুভবযোগ্য পৃথিবীতে আলোর গতিই চরম গতি। আমার দেখার আড়ালে আরও সূক্ষ্ম গতি আছে যা আলোর গতিকেও হারায়। প্রশ্ন আসতে পারে, যেখানে হাওয়া শব্দ ইত্যাদি স্থূল ধারা চলতে বাধা পায়, সেখানে তারা চলে কেমন করে? তার উত্তরে বলা যায়, এক বস্তা খোয়ার মধ্যে আর খোয়া ধরে না ঠিকই, কিন্তু বালি ধরে। বালি তার ফাঁকে চলে যায়। এমনি ভাবে সবার চলা সৃষ্টিতে অব্যাহত আছে। এমনিভাবে চারদিকে প্রতিফলিত হওয়ার কারণে আলো হলেই আমাদের দৃষ্টি চলতে থাকে, তার ঠেলা অন্যান্য কণার তরঙ্গের চেয়ে বেশি হওয়ায়। জোর বিরোধী আলোর স্রোতের বিরুদ্ধে দৃষ্টি বাধা পায়। আয়নার প্রতিফলনে দৃষ্টি বাধা পেয়ে থেমে থাকে, যেমনভাবে বদ্ধ কোণে বাতাসের গতি থেমে থাকে। না চললেও বাতাস সেখানে থাকে।

নানা চলা নানা রঙ আলো বিকিরণ করে। কালো থেকে সাদা যত প্রকার রঙ আছে তাদের মাঝের রঙ লাল। লাল আগুনের মত তা চরম শক্তি সম্পন্ন। এই শক্তি ক্ষয় হতে হতে সাদায় এসে চরম প্রতিফলক হয়। লাল থেকে কালোর দিকে গেলে আত্মস্থ পটভূমি সৃষ্টি হয়। সাদার দিকে বস্তু ভাবাকারে প্রতিফলক হয়। কালোর দিকে সেই ভাব বস্তু-আকারে স্থিত হয়। কেন্দ্রের কালো শিশুকাল, লাল যৌবনকাল ও সাদা বার্দ্ধক্য। সে আর নেয় না, শুধু দিয়েই শেষ হয়। এই ভাবাকারের দেওয়া কিন্তু আবহাওয়ার শূন্যতার আকর্ষণে বস্তু হতে হতে কেন্দ্র হয়ে কালোর দিকে আসে একই ভূমিকা পালনের জন্য। এই হল সৃষ্টি কোষ ধারা।

সাদা রঙের বার্দ্ধক্যের সাদা চুল, সাদা মন, সব ত্যাগ করতে শেখায়। এই ত্যাগ না শিখলেও সব ত্যাগ করতে হয় নূতনকে স্থান দেওয়ার জন্য। নতুন সব নিয়ে বাড়তে থাকে। এই নেওয়া অনেক সময় স্বার্থ হয়ে দাঁড়ায়। তাই স্বার্থান্বেষী বলে, সৎ কাজ করলেও যখন মৃত্যু, অসৎ কাজ করলেও তেমনি মৃত্যু। তবে কেন স্বার্থান্বেষী হয়ে ভোগ করব না? যারা স্বার্থ গোছায় তারা ভোগ করতে জানে না। যারা ভোগ করতে জানে তারা আবার তেমন ভাবে ত্যাগ করতে জানে না। ত্যাগ করতে গেলে ভোগে ঘাটতি পড়বে। স্বার্থান্বেষীর

অভ্যাস ভোগ করতে পারে না, সঞ্চিত অর্থ খরচ হয়ে যাবে বলে। আবার সবাই যদি খারাপ করতে চায়, তবে কেউই খারাপ কাজ করতে পারবে না সুযোগের অভাবে। সবাই ভাল কাজ করতে গেলেও ভাল কাজের নেতৃত্ব থাকবে না। কে কার উপকার করবে সেটাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। দেখা দেবে এমন একটা বিশৃংখলা, যার দ্বারা খারাপ কাজ হতে বাধ্য। খারাপ ভাল সব কিছুর মধ্যে কেন্দ্র ভিত্তিক দ্বন্দ্ব কাজ করে চলেছে সৃষ্টির জন্য। দুই না হলে দ্বন্দ্ব হয় না। তাকে খারাপ মন্দে ভাগ করে সৃষ্টির কাজে লাগানই সবার আদর্শ হওয়া উচিত। এমনি আলো ও আঁধারের দ্বন্দ্বে এত বৈচিত্র্য দেখানো হল, এই সব বৈচিত্র্য না থাকলে মানুষ খুনোখুনি করে মরত। কাজ তো একটা করতে হবে। একাজ কেন্দ্রের কাজ। একাজ চিরদিনের বলে একটা মানুষ একাজ করতে পারে না। কারণ মানুষ মরণশীল। এই কাজের জন্ম মৃত্যু নাই বলে, প্রকৃত জন্ম মৃত্যুর প্রশ্ন ওঠে না।

কাজের সুযোগ যত বাড়বে, কেন্দ্রকে যাচাই করার সুযোগ তত আসবে। একক ক্ষেত্র তত্ত্ব সব প্রমাণের এক প্রমাণ না হলে বিফল হতে বাধ্য। এই বিফলতার নিদর্শন দেখতে পাই ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের ঝগড়া, আবার ধর্মের এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের ঝগড়া, বিজ্ঞানের এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের ঝগড়া। এই ঝগড়াকে জ্ঞানের দ্বন্দ্বে আনতে না পারলে বিশ্বমানব এক হতে পারে না। আইনস্টাইনের পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রতত্ত্ব তাই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

যাকে জানলে সব জানা হয়, যাকে ভাবলে সব ভাবা হয়, যাকে দেখলে সব দেখা হয় সেই কেন্দ্রতত্ত্বের সন্ধানই সব তত্ত্বের সন্ধান দিতে পারে। বিজ্ঞানী পেতে পারেন তাঁর গবেষণাগারের আরাধ্যকে, ধার্মিক পেতে পারেন তাঁর উপাসনাগারের আরাধ্যকে, গণনীতিজ্ঞ পেতে পারেন জনগণের সব সমস্যার সমাধানকে।

আমাদের অজান্তে প্রকৃতির সবাই সবাইকে চেনে কেন্দ্রের আইন মেনে। আমরা তাদের চিনতে চাই, কিন্তু আমরা তাদের সর্ব কারণের কারণকে জানতে চাই না। যে গাছে যে ফুল ফুটবে, সেই গাছ তার উপযোগী আলোকে আহ্বান করে। তার ছাকনিতে আলোর যে গুণ দরকার তাই গ্রহণ করে। সে ছিদ্রে অন্য গুণ বা কণিকা ঢুকবে না। ঠিক মত গুণে ঠিক মত ফুল ফোটে। সেখানে অনিয়ম নাই। একটা দেওয়াল গাঁথতে হলে সোজা হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য ওলন

দড়ি চাই। সুতায় ঝোলানো ওজনের ভারটাকে পৃথিবীর কেন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ টেনে রাখে বলেই আমরা দেওয়াল সোজা হয়েছে কিনা বুঝতে পারি। এইভাবে প্রকৃতি আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করছে।

একটা ফুল ফোটাতেও কেন্দ্রবাদ কি দারুণভাবে সাহায্য করছে। কেন্দ্রযুক্ত উদ্ভিদকোষে আছে এমন কিছু কণা যা সূর্যের আলোতে সাড়া দেয়। সেই কণাগুলি হল ডাইমেরিক প্রোটিন গোত্রের বড় বড় অণু। বিজ্ঞানীরা বাতাসের আর্দ্রতা, জলের পরিমাণ, পুষ্টির পরিমাণ, উষ্ণতা ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটিয়ে দেখেছেন ম্যারীল্যাণ্ড ম্যামথ প্রজাতির তামাকের ফুল শীতকালে ফুটলেও গরমকালে ফোটানো যায় না। শীতকালের উষ্ণতা এনেও সে ফুল ফুটানো গেল না, কিন্তু আলোতে তার সাড়া পাওয়া গেল। শীতের আলো যত সময় থাকে, তত সময় আলোতে রেখে ২৪ ঘন্টার বাকী সময় ঘরের অন্ধকারে রেখে দেখা গেল ফুল ফোটার সম্ভাবনা ও গাছের বৃদ্ধি প্রকট হয়ে উঠেছে। এইভাবে গাছকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগের নাম লং ডে প্লাণ্ট অন্য ভাগের নাম সর্ট ডে প্লাণ্ট। আরও তাঁরা আলোর রঙ পাল্টিয়ে নানা ফুল ফোটানোর কৌশল আয়ত্ত করেছেন। তারা দেখলেন লাল আর নীল আলো শীতের ফুলের উপযোগী নয়। সেখানে উপযোগী অবলোহিত রশ্মি (ইনফ্রা রে)। দেখা গেল ফুল ফোটাতেও আলো ও আঁধারের কতখানি উপযোগিতা।

জগতের সৃষ্টির যতকিছু কাজ চলছে সেণ্টারকে কেন্দ্র করে। তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গেলেও প্রথমে দরকার হয় এক ধরণের ইঞ্জিন যা ডিজেল হোক পেট্রল হোক বা স্টীম হোক। সেই ইঞ্জিনে তরল বা গ্যাসীয় পদার্থকে কেন্দ্রায়ণ মেনে চক্রাকারে ঘোরাতে হয়। এই কাজ বা ওয়ার্কে অর্থাৎ জ্বালানি দহনের ফলে শক্তির রূপান্তর ঘটে। তবে এমন ইঞ্জিন জগতে নাই, যার উৎপাদিত সমস্ত তাপ কাজে লাগানো যাবে। প্রকৃতিতেও এমনি বাড়তি কাজ প্রয়োজনে না লাগলেও বৈচিত্র্য বাড়াচ্ছে বৈকি !

ইঞ্জিনের উৎস আধার থেকে তাপ গ্রাহক আধারে স্থানান্তরিত হয়। তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনে কেন্দ্রভিত্তিক চক্রাকারে চালিত করা হয় যে তরল পদার্থ তা হল জল, বয়লারের মধ্যে কয়লার দহনের উচ্চ চাপে ও তাপে স্টীম তৈরি হয়। অসংখ্য টিউব তার জল যোগায়। উচ্চ চাপ ও তাপের স্টীম পরে প্রবেশ করে টারবাইনে। এই টারবাইনও কেন্দ্রভিত্তিক ঘূর্ণায়মান যন্ত্র। তার শ্যাফ্টের উপরের ব্লেডগুলির মধ্য দিয়ে সেই স্টীম যাওয়ার সময় ভর বেগের পরিবর্তন

হয়। টারবাইনের একটির পর একটি ব্লেডের মধ্য দিয়ে বয়লার থেকে নির্গত স্টীম চালিত হতে থাকে। এই ভাবে চলে বাষ্প চালিত টারবাইন।

সেই টারবাইনের সঙ্গে যুক্ত থাকে যে জেনারেটর সেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। ফ্যারাডের সূত্র অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য দরকার একটা চৌম্বক আবেশ ও বিদ্যুতের সুপরিবাহী বস্তুর (কণ্ডাক্টর)। এই দুয়ের মধ্যে আপেক্ষিক গতির উদ্ভব হলেই বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। কতকগুলি সুপরিবাহীর মধ্যে চৌম্বক আবেশকে ঘোরানো হয় বৈদ্যুতিক জেনারেটরে।

টারবাইন থেকে যে স্টীম একটা শীতকে প্রবেশ করে ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য, সেখানে নদী অথবা জলাধার থেকে আসা জল স্টীমকে ঘনীভূত করে আবার জলে পরিণত করে। এই জলকে পাম্প করে আবার বয়লারে ফেরত পাঠানো হয়। এই ভাবে জলের একটা চক্র সৃষ্টি হয়। এই চক্র র‍্যানকিন উদ্ভাবন করেন বলে এই চক্রের নাম র‍্যানকিন চক্র। এখানে তাপের উৎস হল বয়লার ফারনেস, আর গ্রাহক হল শীতক। এই জল যন্ত্রকে মরিচা ধরা থেকে রক্ষা করার জন্য পরিস্রুত করা হয়। তাই এই স্টীমকে শীতকে জলে পরিণত করে আবার বয়লারে ফেরত পাঠানো হয়।

র‍্যানকিন চক্রে বিদ্যুৎ কোষ চক্রে প্রয়োজনীয় বস্তুশক্তি ঘুরে ফিরে কাজে লাগে। তেমনি ভাবে জ্বালানিকে কাজে লাগাতে না পারলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাবে। তার সঙ্গে কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক ট্রেড ইউনিয়নের কাজে ফাঁকী তো আছেই। এই বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার দহনে যে তাপ উৎপন্ন হয় তার ৬২ থেকে ৬৫ শতাংশই অপচয় হয়। বিদ্যুতের প্রয়োজন মেটাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র না গড়ে অল্প সংখ্যক বড় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়লে অনেক অপচয় রোধ হবে। এই অপচয় আরও কমে স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে। উন্নত দেশগুলিতে কম্পিউটারের সাহায্যে উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এক্ষেত্রে আবার বেকার সমস্যা বাড়তে বাধ্য। জ্বালানি বাঁচাতে গিয়ে যাদের জন্য বাঁচানো তারাই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে। এই দুটো দিক বাঁচাতে প্রচলিত রাজনৈতিক গণতন্ত্র সাম্যবাদ অক্ষম। গণনৈতিক পদ্ধতিতে সমস্ত উৎপাদনের অধিকারী জনগণকে মেনে নিয়ে গণবেন্ট গড়লে জ্বালানি বাঁচবে, বেকার সমস্যাও কমবে। মানুষ এখানে সমান ভাগ করে খাওয়ার অধিকার পাবে, কারণ মালিক তখন গণ-মালিকের প্রকৃত প্রতিনিধি হতে পারবে। তখন ম্যানেজারিয়াল শাসন থাকতে পারবে না। এই পদ্ধতি জানতে হলে বর্তমান

লেখকের 'দলাদিষ্ট রাজনীতি বনাম ভৌমোত্থিত গণনীতি', 'আন্দোলনে জয় প্রকাশ সেণ্টারিজমের ইতিহাস,' 'সেণ্টারিজমে ধর্ম বিজ্ঞান দলহীন গণতন্ত্র' ইত্যাদি পুস্তক পড়তে হবে।

এই চিন্তাধারা বিজ্ঞানের বাইরের নয়, কারণ একক ক্ষেত্রতত্ত্ব গড়তে তা বিজ্ঞানকেও সহায়তা করবে। প্রকৃত সাম্য না হলে অপচয় রোধ করা সম্ভব নয়। একটা দেশে এক কোটি লোক বাস করে। সেই মত সামগ্রী দেশে আছে। তবু সে দেশের কিছু লোক খেতে পায়না কয়েক জনের শোষণ জনিত বেকারত্বের জন্য। সেই দেশের সঙ্গে যদি অন্য দেশের যুদ্ধ হয়, কিছু লোক চাকরি পেলেও পূর্বের খাদ্যে আর চলে না। দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। এই খাদ্য যায় কোথায়? এই খাদ্য বেরিয়ে যায় অপচয়ের ফাঁক দিয়ে।

সাম্যের ভারসাম্য ঠিক না রাখলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, সমাজের ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে সর্বত্র অপচয় হতে বাধ্য। প্রয়োজনের সাম্য সমতলে দাঁড়িয়ে থাকে। এক কাপ চা প্লেট উপুড় করে সমতলে রাখলে পড়ে না। একদিকে কাত করে অসমতল করলেই চা পড়ে যাবে। এই সাম্যের বিজ্ঞান জানা থাকলে বর্তমান বিশ্বের প্রয়োজনে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে জ্বালানি খরচ হচ্ছে, তার অর্ধেক খরচে সেই একই প্রয়োজন মেটাবে।

সমতলকে সামান্য অবহেলায় চা ভর্তি কাপ প্লেটে উল্টালে চা পড়ে যায়। এখানে সমতল বললে বুঝতে হবে পৃথিবীর কেন্দ্রভিত্তিক সমতল। গ্রহ উপগ্রহরা একটু কাত হয়ে চলে বলেই কিছু জ্বালানি বেরিয়ে যায়। সেই জ্বালানি তাদের চলার দহনে কাজে লাগে। পরমাণুর নিউট্রনও এক ধরণের অপচয় হওয়া জ্বালানির একত্রিত সংগ্রহ। তা প্রয়োজনে পরমাণুর প্রোটনের ইলেকট্রনের কাজে লাগে। তা প্রয়োজনে তাদের সৃষ্টিও করতে পারে। নিউট্রন না থাকলেও হাইড্রোজেনের একটি প্রোটন একটি ইলেকট্রন থাকে। পরমাণুতে নিউট্রন জমলে অতিরিক্ত প্রোটন ইলেকট্রন গড়তে পারে। যেমন অনেক বড় বড় কারখানার পরিত্যক্ত বস্তু নিয়ে ছোট ছোট কারখানা গড়ে ওঠে। অপচয় আসলে অপচয় নয় পরমাণুর আওতার বাঁধনে সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহদের মাধ্যাকর্ষণের বাঁধনে। এই অপচয় যাতে কাজ চালাতে পারে ও সৃষ্টি করতে পারে সেদিকে বিজ্ঞানীদের নজর দিতে হবে। বিজ্ঞানই জনস্ফীতির সমস্যাকে রুখতে পারে।

একটু কাত করলে সাম্যের অবহেলায় চা পড়ে গিয়ে নষ্ট হয়। কাত হয়ে

চলা গ্রহ উপগ্রহদের অপচয় সীমাবদ্ধতার জন্য শৃঙ্খল সৃষ্টি করে এবং কাজ করে। প্লেটে উপুড় করা কাপের চা একটু কাত হয়ে পড়ে গিয়ে প্রমাণ করল যে পৃথিবীর আবহাওয়ার স্তর ও চায়ের পড়ে যাওয়ার কারণ কি সূক্ষ্মভাবে কাজ করে। সমতলে বরফ না জমলেও পাহাড়ের মাথায় বরফ জমার কারণও তাই। এই আবহাওয়ার তারতম্যে নিচে যাকে জল দেখছি, পাহাড়ের মাথায় তাকে বরফ হতে দেখছি। সেই জলই সেখানে বরফ হচ্ছে শূন্য পূর্ণতার পার্থক্যের ব্যাপকতায়। এই পার্থক্য চায়ের ক্ষেত্রে পতন ঘটাল। বিরাট ক্ষেত্রে জল বরফ হল।

পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকলে উভয়ে উভয়দিকে একটু ঝোঁকে। নিজের নিজের ব্যক্তিত্ব সবার একমাত্র কেন্দ্রে বাঁধে। দুই সেখানে একে মেশে। গ্রহদের ক্ষেত্রে সেই এক হল সূর্য। পৃথিবীর চাঁদটাকে যদি পৃথিবীকে উপেক্ষা করে সূর্যের গ্রহ করে দেওয়া যায়, তবে সে সূর্যে পতিত হয়ে হারিয়ে যাবে। সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে, পৃথিবীর চারদিকে চাঁদ ঘোরে বলেই শৃঙ্খলা বজায় থাকে। আকর্ষণ বিকর্ষণ উপযোগী থাকে। বড় ছোটর সূক্ষ্ম ধারা নেয় বলেই, ছোটর বড়র কাছ থেকে সূক্ষ্ম ধারা নিতে হচ্ছে। তাই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করছে এবং বিকর্ষণ করছে আপেক্ষিক শূন্যতা এবং আপেক্ষিক পূর্ণতা বিস্তার করে। ধরা যাক বড়র মধ্যে খোয়া পূর্ণ আছে, সেখানে আর খোয়া স্থান না পেলেও ছোটর বালি স্থান পেতে পারে। তাদের যোগাযোগের রাস্তাও তেমনি ভাবে তৈরি।

যার যা প্রয়োজন চৌম্বকত্বে নিচ্ছে, নেওয়ার ফলে যার যা অপ্রয়োজন বিকর্ষণে ছাড়ছে। বিকর্ষণে শূন্যতা সৃষ্টি না হলে আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টির সব আকর্ষণ শূন্যতা থেকে। পূর্বদিকের সূর্যের আলো পশ্চিমের আবহাওয়ায় বাধা পেয়ে পশ্চিমের জানালায় ঢোকে, শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে আকর্ষণের জন্য। কোন শক্তির সামনে চলা হলে একটা পিছুটান থাকে। এই আকর্ষণ এবং চুম্বকের লোহাকে আকর্ষণ একই প্রকারে হচ্ছে। প্রচণ্ড শব্দ আবহাওয়াকে ঠেলে দেয় বলেই শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে, তাই সেই শব্দকে শূন্যতা সূক্ষ্ম আকারে আকর্ষণ করছে। আলোর ক্ষেত্রেও তাই। পার্থক্যের কাজ লোহা ও চুম্বকের ক্ষেত্রে স্থায়ী হয় মাত্র। প্রতিধ্বনি, প্রতিবিম্ব, প্রতিফলন অস্থায়ী চৌম্বকত্ব। লোহাকে চৌম্বকে পরিণত করলে সে লোহা টানে। আবার তাকে পুড়িয়ে পেটালে চুম্বকত্বের পথ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আকর্ষিতকে রাখার আর স্থান থাকে না। আর

চুম্বকত্বও থাকে না। এই পরীক্ষায় বোঝা যায় আকর্ষণ বিকর্ষণের ধারা আছে, সেই ধারার চলার পথও আছে।

এক অপরকে আকর্ষণ বিকর্ষণ করে পরিবেশের জন্য। সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে আবার তারা নিজেরাই। সমাজের ক্ষেত্রেও তেমনি মানুষ অনুযায়ী পরিবেশ রচনা চলে। তবে সেই পরিবেশের উপযোগী স্থানও চাই। তেজস্ক্রিয় বস্তুর খনিতে তেজস্ক্রিয় বস্তু খানিকটা অক্ষয় থাকে, অন্য পরিবেশে আনলে তা বেশি ক্ষয় হতে থাকে। কারণ তার পরমাণুর অন্য পরিবেশের পার্থক্যে বিকর্ষণ বেশি হয়। সমতা আর থাকে না। এখানে অন্য বস্তু হয়তো তেমনি ক্ষয় হবে না বিকর্ষণ তেমন না থাকায়। আকর্ষণ বিকর্ষণ সব সময় সর্বক্ষেত্রে থাকে, ক্ষেত্র বিশেষে কম বেশি হয়। কেন্দ্র ছাড়া কোন কিছুর ধ্রুবত্ব নাই।

বস্তুর ধ্রুবত্ব নাই। এমনকি পরমাণুরও ধ্রুবত্ব নাই। নক্ষত্রের মৃত্যুতে তা প্রমাণিত হয়েছে। চাপে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। তাদের আর কেন্দ্র থাকে না চরিত্র প্রকাশ করবার জন্য। তবে মৃত্যুপথ যাত্রী নক্ষত্রের কিন্তু কেন্দ্র থাকে। সেই কেন্দ্র থাকে বলেই সবাইকে আকর্ষণ করে, অন্যকে জন্ম দেওয়ার জন্য। হয় সে একদিন বিস্ফোরিত হবে, নইলে তিলে তিলে ক্ষয় হতে থাকবে অন্যদের পুরণের জন্য।

নক্ষত্রের মৃত্যুর সময় হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হয়। হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম হওয়ার মধ্য পথে অনেক রূপান্তর ঘটে। অর্থাৎ অনেক চরিত্রের জন্ম হয়। পৃথিবীর আবহাওয়াতে হাইড্রোজেন ধরা দেয় না। বিশেষ কারণ না ঘটলে তার জন্মও হয় না। হয়তো অতিকায় নক্ষত্রের বিস্ফোরণে নানা আকারের বস্তু নানা দিকে ছুটে যাওয়ার সময় ধুলিকণারাও ছুটতে থাকে। এই ছোট বস্তুর মধ্যে ছুটলে পথ না পেয়ে ইলেকট্রনের মত ছুটতে হবে। এখানে পরমাণু সৃষ্টির মূলমন্ত্র পাওয়া যায়। তারা আবার আপেক্ষিক শূন্যতায় আরও বস্তুদের আশ্রয় দিতে থাকে। এইভাবে গড়তে থাকে অণু, বস্তু, গ্রহজগৎ ইত্যাদি। কারণ সবার মধ্যে পরমাণু আছে। বস্তুর ভাব যেখানে বেশি সেখানকার পরমাণু হাইড্রোজেনের মত একটা ইলেকট্রনে সন্তুষ্ট থাকল না। একাধিক ইলেকট্রন, নিউট্রন নিয়ে নানা ধরণের পরমাণু সৃষ্টি হতে থাকে। কেন্দ্রভিত্তিক শূন্যতার আকর্ষণে, পূর্ণতার বিকর্ষণে তাই চিরদিন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় চলছে। পৃথিবীর শূন্যতার মধ্যে এমনি ঘূর্ণন চলছে।

যে বস্তু কেন্দ্রে আকর্ষিত হচ্ছে, তা কেন্দ্রের শূন্যতার পক্ষে উপযোগী হলেও

আবহাওয়ার পক্ষে ভারী। কেন্দ্র থেকে যা বিকর্ষিত হচ্ছে, আকর্ষিত বস্তুকে স্থান দেওয়ার প্রয়োজনে হলেও আবহাওয়ার কাছে তা হাল্কা। হাল্কা ও ভারী বস্তুর সৃষ্টি এই ভাবে। এই চলা সৃষ্টি করছে শূন্যতার সময়। শূন্যতা অনুযায়ী চলার সময় বাড়ে কমে। শূন্যতা থেকে বস্তুধারা কমাতে কমাতে যত চরম শূন্যতায় আনা যাবে, তত বস্তু আকর্ষণের সময় সীমা কমবে। তত শক্তি উৎপাদন বাড়বে। সময়ের শক্তি পেতে হলে বস্তুকেও অসীম ক্ষুদ্রতায় ভাঙ্গতে হবে। কারণ শূন্যতার আকর্ষণ শক্তি বস্তুর ক্ষুদ্রতার উপরও নির্ভর করে।

শক্তি উৎপাদনে দুয়ের চরিত্র বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যেকের নিজের নিজের চরিত্র থাকার জন্য মহাসাগরও বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সূর্যের যে সম্পর্ক, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে সূর্যের সেই সম্পর্ক নয়। এই সম্পর্ক অনেক গভীর। তাই পৃথিবীর ভৌগোলিক মেরু ও চৌম্বক মেরু এক নয়। চৌম্বক ক্ষেত্রটি ঘণ্টায় ১৮ থেকে ২৪ কিলোমিটার বেগে পশ্চিমদিকে ঘুরে চলেছে। হিসাবে বলা হয়েছে চৌম্বক ক্ষেত্রটি ১৬০০ বছরে পুরো একবার ঘোরে। এই কারণে একসঙ্গে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর স্থানও বদল হয়।

ভাঙ্গচুরের সৃষ্টিতে ধ্রুবত্ব নষ্ট হয়ে যায়। এই সংঘাত চাপ দিয়ে বস্তুকে যেমন ভারী করে, আবার সেই আঘাতজনিত কারণে সূক্ষ্ম বস্তুদের হাল্কা করে ছিটকে দেয়। আগুন দাহ্য পদার্থ। অক্সিজেনের দ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আলো ও উত্তাপ দান করে। এখানেও পটভূমি কালো অঙ্গার। তাকে খুঁচিয়ে নানা রঙের আলো সৃষ্টি করা যায়। অক্সিজেন সেই কালো অঙ্গারে যতখানি আকর্ষণের গভীরতা সঞ্চিত থাকে, আঘাতে তাকে ছিটকে দেয়; তা-ই আগুন। সূক্ষ্মতার জন্য তাকে রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে। স্থূল ক্ষেত্রে একটা ঢিল ছুঁড়ে ডিম ভেঙ্গে দিলে কুসুম ছিটকে যায়, তাকে রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে না। তবে তাদের সাধারণ নিয়ম একই। যে শক্তি অঙ্গারে বা ডিমে ভারী বস্তু হয়েছিল, সেই শক্তি আঘাতে হাল্কা হয়ে ছিটকে পড়ল। এই আঘাত প্রতিক্ষণে কণাদের স্থান দিয়ে ঠেলে বলেই আপেক্ষিক শূন্যতায় চলতে থাকে পথের বাধায় সংঘর্ষ ঘটাতে ঘটাতে। তাতে আলো সৃষ্টি হয়। এই আলো চলার জন্য নিজের ওজন না থাকলেও অন্যের ওজনকে গ্রাস করে। অর্থাৎ অন্যের ওজনকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। নইলে বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে না। এই শক্তি উৎপাদনের পেছনে অক্সিজেনরূপী ঢিল যে শক্তি যুগিয়েছে, তা স্থায়ী হতে পারে না। প্রতিক্ষেত্রে অন্যের সংঘর্ষে শক্তি বৃদ্ধি পায় সেই অন্যেরই শক্তির জালানিতে।

উপযুক্ত সংঘর্ষেই তাই শক্তি। শুধু তেল, কয়লা, গ্যাস নয়, যে কোন বস্তুই জ্বালানি। তার সঙ্গে উপযুক্ত সংঘাতেই শক্তি উৎপাদন হতে পারে।

কালো থেকে নানা রঙের ও নানা আলোর সৃষ্টি সংঘর্ষের কারণে। তা আমরা দেখতে পেলেও এক এক স্তরে যে নানা শক্তির সৃষ্টি হয় তা দেখতে পাই না। তাপ, অতিতাপকে আমরা অনুভব করলেও তাদের অনুভব করতে পারি না। সেখানে উপযুক্ত সংঘর্ষের জন্য জ্বালানি দিলেই আগুন দেখতে পাই, আলো দেখতে পাই। গ্যাস জ্বালাতে ৬০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি উষ্ণতা লাগে অথচ শুকনো কাঠ জ্বালাতে মাত্র ২৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা লাগে। সর্বক্ষেত্রে সংঘর্ষের রকমারিত্ব কাজ করছে। একটা ডিজেল গাড়ির সিলিণ্ডারে উচ্চ চাপ ও তার জন্য উদ্ভূত তাপ পেলেই ডিজেল জ্বলে ওঠে।

আগুন হলে ধোঁয়া হয়। পোড়ার সময় যে আধপোড়া কার্বন কণা, উদ্বায়ী পদার্থ, জলীয় পদার্থ বা ছাইকণা গরম বাতাসের সঙ্গে ভাসে, তা-ই ধোঁয়া। তাতে অক্সিজেন কম ধরা পড়ে, তাই উত্তাপ কম। আগুনের সঙ্গে সংযোগ না ঘটালেও কয়লার খনির মিথেন গ্যাস অক্সিজেন ও শ্রমিকদের খোলা লণ্ঠনের শিখার সংস্পর্শে এসে জ্বলে ওঠে। আগুনের শিখা খুব সরু তারের জাল ভেদ করতে পারে না। তাই সেই তারের জালে ঘেরা ডেভী সেফটি ল্যাম্প খনিতে ব্যবহার করা হয়। আগুনকে না জানলে এর মত ভয়ঙ্কর প্রভু আর নাই, আগুনকে জানলে এর মত ভাল ক্রীতদাসও আর নাই।

আগুনের ক্ষেত্রে রসায়ন কাজ করে। দুটি পদার্থের রসায়নিক মিশ্রণে তৃতীয় পদার্থ হয়। এখানে রসায়ন বিদের মাথার চিন্তা ও পদার্থ বিদের মাথার চিন্তা এক করলে যত না ফল পাওয়া যায়, তার চেয়ে বেশি ফল পাওয়া যায় একই মাথায় দুই চিন্তা থাকলে। এই ক্ষেত্রে দুই চিন্তার কেন্দ্রভিত্তিক কালচার হয় ভাল। কিন্তু কেন্দ্রকে ভিত্তি না করলে দুই বিভাগের চিন্তা এক মাথায় বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে বাধ্য, যার জন্য রসায়নবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার সংযোগ ঘটানো যাচ্ছে না। দুইকে মিলিয়ে এক করাই সৃষ্টির ধর্ম। দুইটি ফ্যানের একই উত্তাপের হাওয়া মুখোমুখি মিশালে সৃষ্টির মিশ্রণ হয় না, যদিও সংঘাত হয়। দুইটি ফ্যানের একটিতে গরম হাওয়া, অপরটিতে ঠাণ্ডা হাওয়া মুখোমুখি চালালে দুই হাওয়া মিশে তৃতীয় একটি হাওয়া সৃষ্টি করবে। ঠাণ্ডা হাওয়া গরমকে গ্রাস করবে, গরম হাওয়াও তাকে সামান্য গ্রাস করবে। দুই মিলে একই চরিত্র সৃষ্টি করবে।

যদি কোন ধাতব অণু ও অধাতু অণুর মধ্যে রসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, দেখা

যাবে ধাতব অণুটি ইলেকট্রন দান করেছে, আর সেই ইলেকট্রনটি নিয়েছে অধাতু অণুটি। ফলে সৃষ্টি হয়েছে একটি যৌগ অণু। একটি ধাতব সোডিয়াম পরমাণু একটি অধাতু ক্লোরিন পরমাণুকে ইলেকট্রন দান করলে বিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাদ্য লবণ। দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু বা একটি হাইড্রোজেন অণু সালফেট অ্যাসিড মূলককে দুটি ইলেকট্রন দান করে সালফিউরিক অ্যাসিড অণু গঠন করে। এক্ষেত্রেও হাইড্রোজেন হচ্ছে ইলেকট্রন দাতা এবং সালফেটমূলক হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহীতা। ধাতব বস্তু পূর্ণতার জন্য ইলেকট্রন দান করে অধাতু আপেক্ষিক শূন্যতার জন্য গ্রহণ করে। এই গ্রহণের বিনিময়ে অধাতু তার চরিত্রকে ত্যাগ করছে। সেই ত্যাগ ধাতু না নিলেও আবহাওয়ায় চলে যায়। কেন্দ্রভিত্তিক একের বিকর্ষণে অন্যের আকর্ষণে আবার এই আকর্ষকের গ্রহণজনিত বিকর্ষণে বিকর্ষকের ত্যাগজনিত আকর্ষণে অর্থাৎ আদান প্রদানে নতুন নতুন সৃষ্টি হয়। আবার এমনও হতে পারে, প্রথমটি দ্বিতীয়টি থেকে নিল। তার জন্য প্রথমটি যা ছাড়ল দ্বিতীয়টির প্রয়োজন হল না। প্রয়োজন হল তৃতীয়টির। তারটা আবার অন্যের। এমনি ভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটা শৃঙ্খল গড়ে উঠেছে। আর তাদের মধ্যে সংযোগের যে সব পথ আছে, তা এই আকাশ। আকাশ তাই শূন্য নয়। সেখানে যে কোন গতি কেন্দ্রকে ভিত্তি করে এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে অথবা কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘুরছে।

প্রত্যেকের মধ্যে আপেক্ষিক শূন্যতা পূর্ণতা কাজ করছে বলেই এইসব পথ বা আকাশ সৃষ্টি হয়েছে। ভারী বস্তুর চারদিক আপেক্ষিক শূন্য। অর্থাৎ আপেক্ষিক শূন্যতার মধ্যে ভারী বস্তু বাস করছে। আপেক্ষিক শূন্যতা যদি স্থিতি পায়, মধ্যে যদি কোন উত্তেজনা না থাকে তবে তার চরিত্র হবে শীতক। আকাশে আপেক্ষিক শূন্যতায় তাই জল জমে মেঘ হয়। সেখানে পথে চলা ধারার সম্প্রসারণের মধ্যে বরফ হয় বলেই বরফ জলের চেয়ে হাল্কা হয়। আকাশের চলাচলের পথের ছাঁচ বরফে ধরা পড়ে জমে যায় বলেই বরফ ফাঁপা। এমনি কারখানাতেও বরফ তৈরি করতে তেমনি শূন্যতার আকর্ষক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়।

ঠাণ্ডার জন্য যেমন আপেক্ষিক শূন্যতায়, উত্তাপের জন্য তেমনি আপেক্ষিক পূর্ণতায়। তাই উত্তাপে প্রতি মুহূর্তে বিকর্ষণ ঘটলেও চাপে নেমে যায়। যে কারণে আগুনে জল ফোটে, সেই কারণে আপেক্ষিক ভারী আবহাওয়ায় আগুন জলে। তার বিকর্ষণ ভারী আবহাওয়াকে ঠেলে ধরে বলেই বাইরের ঠাণ্ডা

হাওয়া সংঘর্ষ চালাতে আসে। বিকর্ষণজনিত শূন্যতার তাগিদে সবাইকে এগিয়ে আসতে হয়। আগুনের মূল কথাই তো সংঘর্ষ। শূন্যতায় সংঘর্ষ চলে না বলেই, আগুন আপেক্ষিক শূন্যতায় জলে না। প্রতি মুহূর্তে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় আগুন জলাকালে তা পুরণের জন্য ভারী আবহাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। সেই ভারী আবহাওয়ার সঙ্গে অক্সিজেন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই ভারীত্বের কাজ করে। বদ্ধ পাত্রে আগুন জ্বাললে যত সময় অক্সিজেনের ঝাঁপিয়ে পড়া শেষ না হচ্ছে, তত সময় জলে। অক্সিজেন নীচে পড়ে গেলে আর জলে না। এই কারণেই পৃথিবীর গর্ভে আগুন সৃষ্টি হয়, আকাশের শূন্যতায় বরফ সৃষ্টি হয়।

আগুনের মত দিনের আলোর জোর যত বেশি হবে তার চারদিকের আপেক্ষিক পূর্ণতা তত বেশি হবে। এই আলোর শূন্যতা ও সেই কারণে আগত পূর্ণতা যেখানে মিলিত হয়ে পৃথিবীর আকারের জন্য গোলাকার পাঁচিল সৃষ্টি হয়েছে। সেই পাঁচিলের জন্য দিনের আলোতে আকাশের তারকা দেখা যায় না। সূর্যের চেয়েও তীব্র আলোর নক্ষত্রদেরও দেখা যায় না। অথচ আমরা জানি আপেক্ষিক বেশি আলোতে মৃদু আলোককে দেখা না গেলেও, আপেক্ষিক কম আলো থাকলেও আপেক্ষিক বেশি আলো দেখায় বাঁধা হয় না।

সূর্য থেকেও আলো বেরিয়ে আসে না। তার থেকে যে শক্তি বেরিয়ে আসে তার সঙ্গে বহিরাগত ধারার সংঘর্ষে আলো ফোটে। পৃথিবীর দিকে আসতে বিরোধী ধারা একমুখী বলেই সংঘর্ষের অভাবে মহাকাশ পালিশ করা কালো জুতোর মত চকচকে। সেই ধারা পৃথিবীর বিকর্ষণের বিরুদ্ধে এলে দিনের আলো দেখা যায় সংঘর্ষের কারণে। আমাদের সেই দিনের আলোয় তাড়িত দৃষ্টি আকাশকে নীল দেখে। সূর্যের আলো যেখানে মহাকাশকে কালো দেখিয়েছে, সেখানে নিশ্চয় সেই সূর্যের আলো পৃথিবীর আকাশে নীল করে নি। নীল করেছে পৃথিবীর আলো।

পৃথিবী হোক, সূর্য হোক বা যে কোন বস্তু হোক, প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রভাব দ্বারা নিজের নিজের আবরণ সৃষ্টি করে বাইরের আবহাওয়াকে আপেক্ষিক শূন্যতায় টেনে রেখেছে। একেবারে গায়ে আনে না বা তারা গায়ে আসতে পারে না আপেক্ষিক পূর্ণতার জন্য। এই কারণে পৃথিবীর আকাশে আবরণ সৃষ্টি হয়, মেঘ সৃষ্টি হয়। জলীয়বাষ্প তার বাইরে না যেতে পেরে সেখানেই মেঘ সৃষ্টি করে। এই আবরণ কাটিয়ে দিলে পরমাণু যেমন শক্তি প্রকাশ করে পৃথিবী ও সূর্যও তেমনি শক্তি প্রকাশ করতে পারে। সে শক্তি হবে কত প্রচণ্ড তা কল্পনা

করা যায় না। তারপর বস্তুরা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়বে নানা সৃষ্টির জন্য। যৌগিক পদার্থের অণুরা বিদীর্ণ হয়ে নিজের নিজের মৌলে ফিরে যাবে।

বস্তু ও তার আবহাওয়াজনিত যে আবরণ সৃষ্টি হয়, তা আবার সেই কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণে ছিন্ন হয়ে যায়। একই কারণে জন্ম ও মৃত্যু দুই-ই হয়। যেমন পারদ বা মার্কারীকে উত্তপ্ত করলে বাইরের আসা বায়ুর অক্সিজেনের সংযোগে পারদের লাল সর তৈরি হয়। সেই সর বা স্তর আরও উত্তাপে যৌগত্ব নষ্ট হয়ে পুনরায় পারদ ও অক্সিজেনে ফিরে আসে। প্যালেডিয়াম জাতীয় ধাতু হাইড্রোজেন গ্যাস শোষণ করে। তাকেও উত্তপ্ত করলে হাইড্রোজেন গ্যাস আবার নির্গত হয়। হাইড্রোজেন পরমাণু খুব তেজী। সে বেগুনী রঙের পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট দ্রবণকে অতি তেজের প্রসারণে বর্ণহীন করে দেয়। সেই হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে যে হাইড্রোজেন অণু তৈরি হয় সে তেমন তেজী নয় বলে বেগুনী রঙের পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট দ্রবণকে বর্ণহীন করতে পারে না। বাদাম তেল হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় ডালডা ঘি তৈরি হয়।

হাইড্রোজেন পরমাণু বর্ণকে বর্ণহীন করতে পারলেও তাদের সম্মিলিত যে অণু হয় সে বর্ণকে বর্ণহীন করতে পারে না। এর কারণ হাইড্রোজেন অণুর চলনশক্তি কম হয়ে পড়ায় সব রঙ পার করে বর্ণহীনতায় পৌঁছে দিতে পারে না। তাই সমুদ্রের জলকে আমরা দূর থেকে নীল দেখি, মেরু প্রদেশের বরফকে নীল আভা ছাড়তে দেখি পৃথিবীর আলোতে। এটাও অন্ধকারের একটা হাল্কা রূপ। তাই রাতের অন্ধকারে সেই রঙ চাপা পড়ে যায় অন্ধকার সমস্ত রঙ গোপনের একক পূর্ণতা, সাদা আলো হল সমস্ত রঙ প্রকাশের একক পূর্ণতা। সমুদ্রের নীল রঙ মাঝ পথের রঙ।

প্রকাশ বৈদ্যুতিক নিয়ম মেনে চলে, গোপনতা বৈদ্যুতিক আধান হীনতার নিয়ম মেনে চলে। দুই-এর মোক্ষণে শক্তি উৎপাদিত হয়। বরফ ঠাণ্ডা বলে তার থাকে আকর্ষণী ক্ষমতা, এই আকর্ষণী ক্ষমতার জন্য আকাশের মেঘ বেশি পরিমাণে তড়িতাধান বহন করে। তার ফলে পৃথিবীর মাটিতে তড়িৎ আবেশের সৃষ্টি হয়। দুয়ের বিভব পার্থক্যের মোক্ষণ সৃষ্টি হলে বজ্রপাত ঘটে।

নীল মাড় দেওয়া সাদা কাপড় আমরা কালো চোখে দেখি। এখানে নীল রঙ চশমার লেন্সের কাজ করে। এমনি ইলেকট্রিকসহ সমস্ত শক্তির চলার জন্য প্রকৃতিতে সেই ধরণের জেনারেটর নাই, যেমনটি মানুষ সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতির জেনারেটর অনেক সূক্ষ্ম, সে যেমন বিদ্যুৎ প্রকাশ করছে, তেমনি রঙও

প্রকাশ করছে কেন্দ্রকে ভিত্তি করে। কেন্দ্রকে ভিত্তি করে নানা বস্তুর রসায়নে নিজের জ্বালানি শক্তি উৎপাদন করছে। কেন্দ্র সূক্ষ্ম বলেই কেন্দ্র ছাড়া সূক্ষ্ম কাজ হয় না। সূক্ষ্ম কাজ না হলে সততা সৃষ্টি হতে পারে না। রাজনৈতিক অন্যায় এমন ভাবে বেড়ে চলেছে যে, তাদের ছোট অন্যায় আর সহ্য করতে অসুবিধা হয় না। এমনি ভাবে মানুষকে তৈরি করে তারা শোষণ চালায় বৃহত্তর ক্ষেত্রে। কিন্তু খুব সূক্ষ্ম ক্ষেত্রে মাথার একটা সামান্য উকুনকে মানুষ নখে চেপে মারে। কেন্দ্র অসীম শেষ সংকীর্ণ স্থান। সেখান থেকে কোনকিছু ছুটে এলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না। এমনি লক্ষ্যকে স্থির করবার জন্য ধনুর্ধারী কিছু সময় ধরে তীরের মাথা ও লক্ষ্য বস্তুর মধ্যে মুখোমুখী সূক্ষ্মতা আনে। তবেই সে লক্ষ্যভেদ করতে পারে। বিজ্ঞান যেখানে অজান্তে হলেও কেন্দ্রকে ভিত্তি করেছে, সেখানে সে অনেক এগুতে পেরেছে, লক্ষ্যভেদ করেছে। কেন্দ্রবাদ জানা থাকলে বিজ্ঞান প্রয়োজনে কেন্দ্র থেকে সরে এলেও ধনুর্ধারীর মত লক্ষ্য স্থির রেখে লক্ষ্যভেদ করে একক ক্ষেত্র তত্ত্বে পৌঁছাতে পারত।

মাধ্যাকর্ষণ আছে পৃথিবীর ক্ষেত্রে। পৃথিবীর পরে সমুদ্রের জল থাকলেও তার আকর্ষণ অন্যরকম। যদিও সে সূর্য ও পৃথিবীর প্রভাবকে মানিয়ে চলে। সমস্ত ব্যক্তিত্বকে না মেনে যদি সৃষ্টি একটা মাত্র ব্যক্তিত্বকে নিয়ে পড়ে থাকত, কোন কিছুর সৃষ্টি হত না। জল, হাওয়া, আকাশ, বস্তু কিছুই থাকত না। নানা স্বকীয়তা না থাকলে নানা সৃষ্টি হত না। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন যদি নিজের নিজের স্বকীয়তা প্রকাশ না করত দ্বন্দ্বের অভাবে জল সৃষ্টি হত না। পৃথিবীর জলের পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণ, সবচেয়ে বেশি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে।

সূক্ষ্ম কেন্দ্রের স্বকীয়তা সূক্ষ্মতম পরমাণু হাইড্রোজেনের আছে। নিউট্রনও সেই স্বকীয়তাকে খর্ব করতে উপস্থিত থাকে না। তাই হাইড্রোজেন নিজে জলে। অক্সিজেন আলো জ্বালতে হাতুড়ির কাজ করে। সে নিজে জলে না। এই হাতুড়িকে এসে আঘাত করতে হলে তাকে আপেক্ষিক শূন্যতায় ভর করে চলতে হবে। সেই আপেক্ষিক শূন্যতা সৃষ্টি করে হাইড্রোজেন। অন্য আগুনে অক্সিজেন পতিত হয়ে শেষ হয়ে যায়। হাইড্রোজেনের আগুন অত তেজী নয় বলে সে শেষ হয় না। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর আকর্ষণের সে ক্ষমতা নাই যে একটা অক্সিজেন পরমাণুকে ধরে রাখতে পারে। তাই দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি অক্সিজেন পরমাণুকে ধরে রেখে জলের অণু সৃষ্টি করতে পারল। অক্সিজেন

পরমাণু ধরা পড়ে হাইড্রোজেনকে ঊর্ধ্বমুখী হতে দিল না, হাইড্রোজেন পরমাণুও অক্সিজেনকে নিম্নমুখী হতে দিল না। দুয়ে মিলে তাই তারা সৃষ্টি করল না-গ্যাসীয়, না-কঠিন বস্তু জল। সমস্ত যৌগিক পদার্থের এমনি ভারসাম্য থাকে। রসায়নের মূল কথা এখানে।

হাইড্রোজেনের যে দহন ক্রিয়া হয় বাতাসের মধ্যে সেই দহনের শূন্যতা গ্রহণ করেছে অক্সিজেন। তাই পরমাণু শক্তি হলেও সেই পরমাণুতে সৃষ্ট বস্তু শক্তি প্রকাশ করতে পারে না। জল তাই অন্য বস্তু হলে বা বরফ হলে আবার তা জলে ফিরে আসে। বস্তু কঠিন হবে কি তরল হবে কি গ্যাসীয় হবে জলকে মধ্যস্থ ধরে বলে দেওয়া যায়। সবই নির্ভর করছে কেন্দ্রভিত্তিক শূন্যতা পূর্ণতার তারতম্যের উপর।

অক্সিজেন নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ হাওয়ার সংস্পর্শে হাইড্রোজেন গ্যাস বিস্ফোরণ ঘটায়। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির হাইড্রোজেন জীব দেহে থেকে সেখানে আগন্তু নিশ্বাসে আসা অক্সিজেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জীবনের চলা সৃষ্টি করছে এবং রক্ষা করছে। নাইট্রোজেন সার হয়ে খাদ্য জোগাচ্ছে। হাইড্রোজেন আপেক্ষিক শূন্যতা বজায় রেখেছে, অক্সিজেন আপেক্ষিক পূর্ণতা বজায় রেখেছে জীবনের মোক্ষণ হওয়ার জন্য। এই মোক্ষণে ইলেকট্রিক শক্তির মত জীবনী শক্তি সৃষ্টি হয়। রক্ত চালিত হয়, রক্ত থেকে রস আরও সূক্ষ্ম স্থানে প্রবাহিত হয়।

কো-অর্ডিনেশন যৌগে দেখা যায় একটা ধাতব আয়নের (বিদ্যুৎ আধানযুক্ত পরমাণু) সঙ্গে অন্যান্য আয়ন বা অণুর সমন্বয়ে জটিল যৌগ সৃষ্টি হয়। লিগ্যাণ্ড পদ্ধতিতে কো-অর্ডিনেশন যৌগে ধাতুরা আয়নটিকে ঘিরে অপর অণু আয়ন বা পরমাণু যুক্ত হয়। এই লিগ্যাণ্ড ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা বিদ্যুৎবিহীন অণু হতে পারে। কেন্দ্র ভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণকে ডঃ টাউবে বলেছেন, অণুগুলির মধ্যে ইলেকট্রন বিনিময় হচ্ছে। এই পদ্ধতি প্রাণ-রসায়ন (বায়োকেমিস্ট্রি) এর ক্ষেত্রে ভূমিকা নিতে পারে। কারণ অজৈব জৈব সর্বক্ষেত্রে সেণ্টারিজম কার্যকর। শ্বসনে যে অক্সিজেন আসে তা ইলেকট্রন বিনিময়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষণ থেকে শুরু করে ব্যাটারি ও জ্বালানি কোষ পর্যন্ত সর্ব বিষয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া চলছে। এই কারণে ১৯৮৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী ডঃ টাউবেকে রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এখানে লক্ষণীয় যে সেণ্টারিজম আবিষ্কারের পর থেকে কেন্দ্রভিত্তিক গবেষণায় নোবেল পুরস্কার বেড়ে গিয়েছে।

কার্বনের গ্যাস শোষণের গুণ থাকায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে সে যৌগ গঠন করে সব চেয়ে বেশি। এই কারণেই সে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বলেই আবার সবার সঙ্গে যোগের সুযোগ পায়। কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ করার সুযোগ পায়। এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে কার্বন শৃঙ্খল।

কার্বন কেন্দ্রবাদী বলে কার্বনের পরমাণুগুলি অসীম সংখ্যায় শৃঙ্খলাকারে বা বৃত্তাকারে সজ্জিত থাকতে পারে। অন্য মৌলের এই ক্ষমতা এত বেশি থাকে না। সৃষ্টির সমস্ত বৃত্তাকার বস্তু সেণ্টারিজম মেনে নিতে বাধ্য। বৃত্তটি বলের মত গোল কি ডিমের মত লম্বাটে হবে তা নির্ভর করে কেন্দ্রের উপর। কেন্দ্রের শক্তি অনুযায়ী শরীরের উপর। জীব কোষের আকার গোল, ডিম্বাকার, লম্বাটে ও সর্পিল হয় কেন্দ্রভিত্তিক জীবের শরীরের আকার অনুযায়ী।

এই কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে হাইড্রোকার্বন, অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মনো-অক্সাইড ইত্যাদি পাঁচটি অক্সাইড। ফ্লোরিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে ফ্লোরোকার্বন। কার্বন ও নাইট্রোজেনের মিলিত গ্যাসই সায়ানোজেন নামক বিষাক্ত গ্যাস। কার্বন বিভিন্ন মৌল, প্রধানত ধাতুর সঙ্গে মিশে কার্বাইট যৌগ সৃষ্টি করেছে। কার্বন ও গন্ধকের মিলিত যৌগ কার্বন-ডাই-সালফাইড। রসায়নের এবং যে কোন বস্তুর সংযোজনের মূল কথা পরস্পরের মধ্যের শূন্যতা।

খাদ্যের কার্বন অংশের দহন ক্রিয়ায় জীবদেহে তাপ ও শক্তির সঞ্চার হয়। জীবদেহের অভ্যন্তরে শ্বাসবায়ুর অক্সিজেন খাদ্যের কার্বন পুড়িয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি করে। প্রশ্বাসে এই গ্যাস বায়ুতে মিশে গেলে উদ্ভিদ সেই কার্বন-ডাই-অক্সাইড টেনে নেয়। তার থেকে কার্বন রেখে অক্সিজেন বাতাসে ছেড়ে দেয়। কার্বনে গাছের পুষ্টি সাধিত হয়। এই উদ্ভিদ খেয়ে জীব বাঁচে। এইভাবে সৃষ্টি হয় জীবনের কার্বন চক্র

প্রতিটি প্রাণীর শরীরে কার্বন যুক্ত অবস্থায় থাকে, যেমন কার্বোহাইড্রেট হিসাবে শ্বেতসার, শর্করা ও সেলুলোজ এবং প্রোটিন হিসাবে অ্যালবুমিন ও জিলাটিনে। বাতাসে থাকে কার্বন ডাই-অক্সাইড কার্বন ও অক্সিজেনের মিলিত যৌগ। পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসে হাইড্রোকার্বন থাকে।

কার্বনের শোষণের ও হাইড্রোজেনের শক্তি প্রকাশের গুণ একটা কেন্দ্রের পূর্ণ গুণ হতে পারে। কেন্দ্র আকর্ষণের দ্বারা শক্তি প্রকাশের কাজে লাগায় অক্সিজেনকে। অক্সিজেন আকর্ষিত বা পতিত হয়ে শক্তি বিকর্ষণ করায়। সব

কিছুই সম্ভব হয় আপেক্ষিক শূন্যতা পূর্ণতায়। মৃত সূর্য শূন্যতা হারিয়ে ফেলে বলেই মৃত। তখন সূর্যের উপযোগী আকাশ থাকে না আকর্ষণ বিকর্ষণের অভাবে। তাই সে পতিত হতে থাকে অসীম শূন্যতায়। তার ঘনত্বের কাছে তখন সবই শূন্য। নিজের কৈন্দ্রিক শক্তি হারানোতে পতনের চাপ সরাসরি শরীরের পরে পড়ে। সমস্ত শরীরই কেন্দ্র হয়ে ভাঙতে থাকে, সেই ভগ্নাংশগুলো আবার শূন্যতা পেয়ে অণু-পরমাণু হওয়ার সুযোগ পায়। সর্ব গুণের অধিকারী যে সূর্য নিরেট হয়ে অণু-পরমাণুর গুণ হারিয়ে গুণহীন হয়েছিল, তার ভগ্নাংশরা তখন অন্তরে অন্তরে অণু-পরমাণুতে ভেঙ্গে গুণ ফিরে পেতে থাকে, যতক্ষণ না সূর্য আকর্ষণ বিকর্ষণের কেন্দ্র পাচ্ছে। কেন্দ্র না পাওয়া পর্যন্ত সরাসরি শরীরে আঘাত পেয়ে ভাঙতেই থাকবে। আপেক্ষিক শূন্যতায় এসে তারা নানা গুণ সম্পন্ন অণুপরমাণু হওয়ার সুযোগ পায়। সেই শূন্যতা পৃথিবীর মাটির ভেতরে আছে বলে সেখানেও নানা গুণ সম্পন্ন অণু-পরমাণুর জন্ম হয়। আকাশের অনুঘটকত্বে তা সম্ভব। মৃত নক্ষত্রের পরমাণু নাই, তাই তার বাইরে অনুঘটকের কাজ করে মহাকাশ।

কার্বন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি সেই ধরণের পরমাণু যাদের অন্যান্য পরমাণু আঘাত করে নানা বস্তু সৃষ্টি করে। তাই জগতের প্রায় সব কিছুতে কার্বন অথবা হাইড্রোজেনের ভূমিকা আছে। এরা একভাগ, অন্যান্যরা আর এক ভাগ। পরমাণু এই দুই ভাগে বিভক্ত।

বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণুর নয়—পরম কণা। পরমাণু ভাঙলে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন পাওয়া যায়। পরমাণুর কেন্দ্রে শূন্যস্থান ও কণা আছে। অথচ বিজ্ঞানে পরমাণুর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়, কণা ও শূন্যতার ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ঘটনাচক্রে তারা আলোচনায় এসে যায় মাত্র। এই কণা ও শূন্যতা গুরুত্ব না পাওয়ায় ভাবপারের বাস্তব ব্যাখ্যা হচ্ছে না। রসায়ন বিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞান একসঙ্গে মিশতে পারছে না। তবে বলা যায় সৃষ্টিশীল বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণু। সৃষ্টি বিমুখ বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ কণা। এই পরম কণা ভাঙলে আকাশ ও ভাব সৃষ্টি হয়। কেন্দ্র ভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণের টানা পোড়েনে সবাইকে অশেষ ভাবে ভাঙতে হয়।

একে আসতে হলে শুধু পরমাণুতে না গিয়ে, শুধু পরম কণাতে না গিয়ে কেন্দ্রে যেতে হবে। সমস্ত অণুপরমাণু ভাঙা নীরেট সূর্য আকর্ষণের দ্বারাই মৃত হয়। কিন্তু সৃষ্টির জন্য অন্তদিক থেকে তাকে বিকর্ষিত হতেই হবে। সৃষ্টিতে বৃহৎ ক্ষেত্রে কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে একে যাওয়া যাবে না। সেখানে অনন্তের বিভ্রান্তি দেখা দেবে।

সবার মধ্যে কেন্দ্র আছে বলেই কেন্দ্রই একক। তার দুই কাজ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। আর তাদের সৃষ্টি বহু। এক ঈশ্বরে আছে পুরুষ ও প্রকৃতি। সেই পুরুষ প্রকৃতিতে আছে বহু সৃষ্টি। সৃষ্টির বড় ছোটর সংখ্যাও অনন্ত। তাদের কেন্দ্রের সংখ্যাও অনন্ত। এক এক কেন্দ্রের এক এক গুণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সীমায়িত করে। তবু সব কেন্দ্রের চরিত্র এক।

একটা দেশের সরকারও সেই দেশের কেন্দ্র। সেই সরকার ছাড়া জীবন ধারণের প্রধান স্রোত টাকাকে কেউ আটকে রাখলেই জন—জীবনের প্রবাহ ব্যাহত হয়। কাগজ ছেপে জমা টাকার স্রোতের বিকল্প রাখলেও জমা টাকার স্রোত বন্ধ হয়ে দূষিত হয়। কাগজ ছেপে পুরোনের পর সেই দূষিত কালো টাকা স্রোতে ভীড় করে অর্থনীতিতে রোগ সৃষ্টি করে। সেই অত্যধিক স্রোতের এবং দূষিত গ্যাসের ঠেলায় জনজীবন-প্রবাহের শিরা উপশিরা কেটে যায়। তাই সরকার ছাড়া কারো হাতে টাকা জমতে দেওয়া উচিত নয়। জমলেও সরকারের নজরে থাকলে আর কাগজ ছাপার দরকার হয় না। রক্ত স্রোত একস্থানে জমলে যেমন জীবন নাশের কারণ হয়, তেমনি টাকার স্রোত জমলে দেশের মৃত্যুর কারণ হয়। এই টাকা কেন্দ্রের হাতে থাকলে আকর্ষণ বিকর্ষণে সবার উপকারে লাগে। সব সময় স্রোতের সামঞ্জস্য রাখতে হবে।

মনে করা যাক সরকারী ব্যাঙ্কে সবাই টাকা জমা দিল। সে টাকার এমন সুদ দিতে হবে যে, সে টাকা অন্য কোন ব্যবসায়ে পাওয়া সম্ভব নয়। তাতে কিন্তু সরকারের লোকসান হবে না, কারণ সব সময় মানুষ লাভের কারণে টাকা জমা দিতেই থাকবে। আর সরকার সেই টাকায় সুদ মেটাবে এবং কর্মচারীদের মাইনে দেবে। আরও টাকায় সরকারী ক্রেতা মালিকানা সমবায় চালাবে। সরকারের সেখানে লাভের প্রশ্ন নাই, কারণ সব সময় মানুষ তাদের হাতে টাকা জমা দিতে থাকবে বেশি লাভের আশায়। এইভাবে টাকার স্রোত জনগণের মধ্যে বইতে থাকলে কালো টাকা জমবে না, ফলে কাগজে টাকা বেশি ছাপতে হবে না। টাকার চলার মুখে ভবিষ্যতের জন্য জমানোর প্রয়োজন নাই। চললেই শরীর পুষ্ট থাকবে। ভবিষ্যতেও এই চলা ভবিষ্যৎ গড়বে। শরীরে রক্তের প্রয়োজন এই কারণেই। রক্ত জমলেই মৃত্যু। রক্ত চলে বলে শরীর পুষ্ট হয়। টাকা চালালেই তেমনি দেশ পুষ্ট হয়। টাকা জমালে ভবিষ্যৎ গড়ে না। তাতে ব্যক্তির ভবিষ্যৎ গড়তে পারলেও দেশের নয়। সেই ব্যক্তিকেও বোঝাতে হবে, সে টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখলে, সব টাকার সুদ সরকার দেবে। সবাই যদি

এই পথে আসে, তখন যে কেউ এই হিসাব বহির্ভূত টাকা খরচ করলেই পাড়ার লোকের হাতে ধরা পড়ে যাবে। এমনিভাবে দেশের কেন্দ্র সমস্ত মানুষের কেন্দ্রকে বাঁচাবে সেন্টারিজম অনুযায়ী। ব্যক্তি স্বার্থও সেইভাবে মহৎ করা যেতে পারে। জমানোর স্বার্থে কালো টাকা বাড়ালেও তার জন্য দায়ী বর্তমান অর্থনীতি। স্বার্থ দায়ী নয়। কারণ স্বার্থ সব সময় স্বার্থ। পূর্বোক্ত অনুযায়ী সেই স্বার্থকে জুড়ে দিতে হবে দেশের বড় স্বার্থের সঙ্গে। এমনি ভাবে জগতের কোন দিক নেই যেদিকে সেন্টারিজম ছাড়া কাজ হয়।

চৌদ্দ

জীব কোষকে জানতে হলে রসায়ন বিদ্যা ও পদার্থ বিদ্যাকে এক সঙ্গে জানতে হবে। জীবের চরিত্র তাই তাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। জ্বালানিপদার্থের সৃষ্টি যেমন আলো, জীবের শরীর পদার্থের সৃষ্টি তেমনি চরিত্র মেধা ইত্যাদি। কেউ পদার্থ বিজ্ঞানে ভাল, কেউ রসায়ন বিজ্ঞানে ভাল। এই ভালত্ব নির্ভর করে আগ্রহের উপর। এই আগ্রহকে যদি কেউ সেন্টার বিষয়ে আনতে চায়, তবে সে এক সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, সহ সমস্ত বিজ্ঞানে পারদর্শী হবে। এবং আপনা থেকেই সে একক ক্ষেত্র তত্ত্বে চলে যাবে। সেখানে কোন বাধা জ্ঞান ভাণ্ডারকে ভাগ করতে পারে না। অথচ সে একটি বিষয়েই মাত্র পড়াশুনা করছে, সে বিষয় হল সেণ্টার।

বাইরের প্রভাবে কালো রঙের প্রসারণে সব রঙের সৃষ্টি। তাই সব রঙের চেয়ে কালো রঙ ঘন। এই কালো রঙ তাই সব রঙকে ঢাকতে পারে। এই ঘটনার সেন্টারে না গিয়ে যদি কালো ছাড়া যে কোন একটা রঙ নিয়ে চিন্তা করা যায় মূলকে জানতে পারব না। যে কোন রঙের গোড়া কালো থেকে বিচার করলে সেই রঙকে জানতে পারব। অর্থাৎ সেই রঙকে বিচার করতে গোড়ায় আসতে হবে।

অঙ্কে গণনা পাওয়া যায়, হয়তো তার চরিত্র পাওয়া যায় ভাসা ভাসা। কিন্তু পূর্ণতা জানতে হলে গণনা এবং স্থানীয় চরিত্র জানতে হবে। দু কেজি আম গণনায় চারটে হল। এক কেজি আম তাহলে দুটি হওয়া উচিত। কিন্তু তা নাও হতে পারে। দুটি আম এক কেজির বেশিও হতে পারে, আবার কমও হতে

পারে। এই দুটি আমের ওজন যা হবে, দু কেজি থেকে বাদ দিলে অপর দুটির ওজন পাওয়া যাবে। দুটি আম এক কেজি হলে, অপর দুটি আম এক কেজি হবে। ওজনে অসমান হলে আম কেটে সমান করতে হবে। তখন আর সংখ্যা ঠিক থাকল না। এতগুলো ঘটনা সম্ভব হল আম চারটির ওজন জানা আছে বলে। তেমনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের হিসাব জানা থাকলে, ছোট খাট হিসাব করা যায়। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের ছোট্ট থেকে বড়র দিকে যেতে হবে। ছোট বড়র আপেক্ষিকতাবাদও চলে না। এই দু কেজি আমের দাম এখানে চার টাকা হলে, পাহাড়ের পরে দাম কমে যাবে। কারণ সেখানে মাধ্যাকর্ষণের তারতম্যে ওজন কমে যায়। একটা মানুষের যা ওজন তা কমে যেতে পারে খেতে না দিলে অথবা মানসিক দুশ্চিন্তায়। আবার অন্য কোন অসুখ হলে শরীরের ওজন কমে যেতে পারে। পশুকে খেতে না দিলে দুশ্চিন্তা থাকে না, মানুষকে খেতে দিলেও দুশ্চিন্তা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে মানুষ খেয়েও রোগা হবে। পশু কিন্তু হবে না সেই দুশ্চিন্তার অনুভূতি নাই বলে।

চোরকে ধরে মারলে সে সৎ হওয়ার কথা চিন্তা করে। একই মানুষ ধনীকে দেখে ধনী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। যদি সে শোনে মানুষকে শোষণ করে সে ধনী হয়েছে, তখন সে শোষণ করতে চাইবে। স্থান কাল পাত্র সবাই চরিত্র পাল্টিয়ে দিতে পারে। সেখানে প্রচলিত অঙ্ক চলে না। সে অঙ্ক করতে হবে কেন্দ্রভিত্তিক। প্রত্যেকের কেন্দ্রের স্থানে গিয়ে তার হিসাব করতে হবে। প্রত্যেকের কেন্দ্রই ব্যক্তিত্ব গঠন করে। মাধ্যাকর্ষণ জলের কাছে এক রকম, মাটির কাছে আর এক রকম। জলে ভেসে বেড়ানো এক রকম, মহাকাশে ভেসে বেড়ানো আর এক রকম। জলে হাল্কা বস্তু ডুবিয়ে ধরলে ভেসে উঠে স্থির থাকে। তখন হাওয়া বা ঠেলা তাকে চালায়। এখানে জলের শক্তির স্রোত ঊর্ধ্বমুখী। এই ধরণের নানা বিকর্ষণের স্রোত মহাকাশের অন্যান্য জ্যোতিষ্কের আনা স্রোতে মিশে স্তরীয় স্রোত সৃষ্টি করছে। তাই মহাকাশে মানুষ স্তরে স্তরে ভেসে বেড়ায়। জলের মত সোজাসুজি ভেসে ওঠে না সেখানে। জলও মানুষকে ভাসাতে পারে ঢালুর দিকে। এই ভাসা আর মহাকাশে ভাসা কেন্দ্রভিত্তিক বিচার করলে একই কারণে সম্ভব হয়। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে মহাকাশে ভাসার শক্তি ঊর্ধ্বমুখী গতিকে রুখেছে। নইলে সব কিছু পৃথিবীর আওতার বাইরে চলে যেত। নানা স্তরের নানা বস্তুশক্তি না থেকে এক বস্তুশক্তি থাকত। জলে এক বস্তুশক্তি বলে সোজাসুজি হালকা জিনিসকে ভাসিয়ে তোলে ও ভারী জিনিসকে ডুবিয়ে দেয়।

জলের মধ্যে স্তর থাকলেও ঠেলার শক্তি বেশি থাকায় ভেসে ওঠে। হাল্কা বস্তু জলের আপেক্ষিক শূন্যতায় ভেসে ওঠে। ভারী বস্তু জলের আপেক্ষিক শূন্যতায় ডুবে যায়। সেখানে ঊর্ধ্বমুখী জলের আপেক্ষিক শূন্যতা মার খেয়ে যায়। মহাকাশে দুয়ের আপেক্ষিক শূন্যতা পূর্ণতা কাজ করছে বলে সমতা রক্ষা হয়।

জলে একটা কালির বড়ি ফেলে দিলে তা ডুবে যাবে অথবা ভেসে থাকবে। সে জলে গুলে গেলে সংখ্যা থেকে যখন ক্রমে পরিমাণে আসবে তখন সে সমস্ত জলের স্তরে ভাগ হয়ে জলের পরিমাণে এক হয়ে থাকবে। পূর্বে বলেছি, মেলার প্রতিটি মানুষের স্বর প্রতিটি সংখ্যা। দূর থেকে তাদের স্বর আলাদা আলাদা সংখ্যায় শোনা যাবে না। শোনা যাবে পরিমাণে। আবার তার থেকেও দুই একটা উচ্চ স্বর আলাদা-আলাদা ভাবে শোনা যাবে শক্তিতে পরিমাণের বেলুন ছিন্ন হওয়ায়। সেগুলো সংখ্যা হলেও, পরিমাণ। জগতে এমন মিশ্রণ ঘটে গিয়েছে যে, সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করলে সবই পরিমাণ আবার সবই সংখ্যা। কাজ বুঝে আমরা নির্ণয় করি মাত্র। পরমাণুর কাজ বুঝে আমরা তাকে সংখ্যায় ফেলি। মৃত সূর্যের চাপে তা পরিমাণ হয়ে যাচ্ছে। তা ভাঙলে আবার কণা হবে, কণা আবার আবহাওয়া থেকে শূন্যতা গ্রহণ করে পরমাণু হবে। পরমাণুতে যেমন কণার সংখ্যা আছে, তেমনি শূন্যের পরিমাণ আছে, তাই তার মধ্যে কণায় কণায় রসায়ন চলছে। পাহাড়ের শৃঙ্গ একটা আয়তন নিয়ে পরিমাণে ওঠে। এমনি একটা পরিমাণের শৃঙ্গকে সংখ্যায় গোনা যায়। জগতের সব পরিমাণই পূর্ণ, সব সংখ্যাই পূর্ণ। তার থেকে একটা কণা বাদ গেলেও আর পূর্ণতা থাকে না। তাই সবার মধ্যে পূর্ণতা আছে। উপনিষদের ভাষায় বলা যায়।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

উহা পূর্ণ, ইহাও পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্গত হন, পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে পূর্ণই মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। এই পূর্ণতা কিন্তু শূন্যতাকে বাদ দিয়ে নয়। পূর্ণ একটা পরমাণুর মধ্যেও শূন্যতা থাকে বলেই গায়ে গায়ে লেগে থাকে। জন্ম একা পূর্ণ নয়। মৃত্যুকে নিয়ে সে পূর্ণ। মৃত্যু যে পূর্ণতা নয় আমরা জানি। এই মৃত্যুই আবার একটা পূর্ণতাকে ডেকে আনে। শূন্যতা পূর্ণতাকে আকর্ষণ করে, পূর্ণতাও শূন্যতাকে পূর্ণ করে কেন্দ্রভিত্তিক।

কেন্দ্র এক হলেও শূন্যতা পূর্ণতা তাকে দুই করেছে। দুই না হলে চেতনা

থাকে না। ঘুমন্ত মানুষের হাত ধরলে সে জেগে উঠবে অন্য চেতনায়। জাগার পরও যদি সেই একই ভাবে হাত ধরা থাকে, পূর্বের সেই চেতনা জাগা অবস্থাতেও হারিয়ে যায় আর এক চেতনায়। এই ঘুম থেকে জেগে আর এক ঘুম। সেই ধরা হাত আবার ছেড়ে দিলে সেই জেগে থাকা চেতনার ঘুমও ভেঙ্গে যায়। তখন মনে হবে হাত হাল্কা হয়ে গেল। অভ্যাসে যে বন্ধনকে বন্ধন মনে হয় না, হাত ছেড়ে দেওয়াতে মনে হবে সেই বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। এমনি ভাবে আমরা বন্ধন চেতনার অভাবে বুঝতে পারি না। এই চেতনা সৃষ্টি করতে দুই এর দরকার। জগতে প্রাণীজগৎ সহ প্রকৃতির যা কিছু নড়াচড়া করে সবই কেন্দ্রভিত্তিক একাধিকের আকর্ষণ বিকর্ষণে। এখানে বিজ্ঞান আধ্যাত্ম একাকার।

যে যতই প্রতিভাশালী হোক, একাধিকের সঙ্গে সংযোগ না হলে তার আবিষ্কার সম্ভব নয়। এই নিয়ম মেনে সাধারণ লোক আবিষ্কার করতে না পারলেও বুঝতে পারে। প্রতিভাশালী লোক তাকে একটু বাড়িয়ে আবিষ্কার করতে পারে।

দুঃখ সহজে অনুভূতিতে হারায় না। দুঃখ কর্ম শেখায়। সুখ অলসতা শেখায়। সুখের অলসতা কোন মূর্তি গড়তে পারে না, মূর্তি গড়ে কর্ম। সুখ চলে গেলে বোঝা যায়। তখন দুঃখের পায়ে মাথা কুটতে হয়। যদিও সে অপমান বোধ করে। দুঃখ চলে গেলেও বোঝা যায়। তখন সুখের পায়ে মাথা কুটতে হয়। তাতে সে সম্মান বোধ করে। সেই সম্মানই তো তাকে অলস করে। এই সুখী অলস মানুষ সুখের সময়কে অল্প ভাবে। দুঃখী মানুষ দুঃখের সময়কে দীর্ঘ অনন্ত ভাবে। এই অনন্ত অনন্তকে জানায়। সুখের সংকীর্ণতা স্বল্পজিবী হয়। এই সংকীর্ণতা বোঝা যায় সুখ থেকে দুঃখে পদার্পণ করলে। সুখী লোক মনে করে এই সুখ চিরদিন থাকবে, এই চিন্তা সময়ের মূল্য দিতে পারে না। এখানে তার সময় বসে থাকলেও প্রকৃতির সময় তো বসে নাই, সেই সময় তাকে আবার দুঃখের মধ্যে এনে সময়ের মূল্য বোঝায়। তার মনে হবে দুঃখের সময় নীরেট ও দীর্ঘ। সে আছে বলে তার সময় আছে। সময় প্রত্যেকে অনন্ত সময় থেকে নেয়।

দুটি লোক পাশাপাশি বসে আছে। তাদের একজনের কলঙ্কের কথা বললে একই প্রাকৃতিক সময়ে তার মনে হবে অনন্ত সময়। অনন্তের চিন্তা তাকে তখন তড়িৎ বেগে পালিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেবে। তার পাশের লোকটি কিন্তু তার কলঙ্কের কথা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতে থাকবে। সে চাইবে কলঙ্কের কথা

আরও বলা হতে থাকুক সারা দিন ধরে। এই সময়ের প্রসারণ তাকে অলস ও ধীর করে। এমনিভাবে বস্তু ও বস্তুর ক্রিয়ার মধ্যে সময় কাজ করে।

এমনিভাবে বস্তুকে প্রসারিত করলে আবহাওয়ার চাপে তার গতি কমতে থাকে। তাকে ঠাণ্ডায় সংকুচিত করলে গতি বাড়তে থাকে। এর গতি হবে নিম্ন গতি। প্রথম প্রসারিত অবস্থায় এই নিম্ন গতির চাপ কমতে থাকে আপেক্ষিক শূন্যতার আকর্ষণ পেতে থাকে বলে। তাই পৃথিবী বলতে যদি আবহাওয়ার প্রসারণ ছাড়া শুধু মাটি বোঝাত, তবে সে ভারীত্বে পড়তে থাকত। আবহাওয়ার সম্প্রসারণ নিয়ে পৃথিবী সৃষ্ট বলে তার পতন ঘটে না। পৃথিবীর কেন্দ্র ভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ এর জন্য দায়ী। এই আকর্ষণ বিকর্ষণ সূর্য গ্রহ উপগ্রহ সবাইকে ধরে রেখেছে।

একই সময় কলঙ্কিত লোকটির কাছে অনন্ত, শ্রোতা লোকটির কাছে ক্ষণকাল। সে আরও সময় চাইবে তার কলঙ্ক আরও বেশি সময় ধরে শুনবার জন্য। কলঙ্কিত লোকটির অনন্ত সময় তার কাছে অতি ক্ষুদ্র সময়। প্রকৃতির হিসাবে তাদের সময় একই।

যার মাথার পরে শীঘ্র মরণ আছে, সে হয় ভাল কাজ করে, না হয় খারাপ কাজ করে। পরীক্ষিতের মত লোক ভাগবতামৃত পান করে সময়ের মূল্য দেন। দুষ্কৃতকারী তখন অন্যায় ভাবে ভোগ করে সময়ের মূল্য দেয়। সে চাইবে, মরণ যখন হবেই ভালভাবে ভোগ করে মরি। আবার যে চিন্তা করে আমি আমার ধারা সন্তানের মধ্য দিয়ে অনন্তের পথে বাঁচিয়ে রাখব, সে কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত সময়েও অনন্তের কাজ করে যেতে পারে। যে যেমন নিজের জীবনের স্বার্থ বোঝে, তেমনি অমরত্বের স্বার্থ বোঝে। একটা পরমাণু ক্ষুদ্র হলেও তার শক্তি অসীম। সে পরমাণু জগতের সঙ্গে মিশে অনন্ত বস্তু জগৎ সৃষ্টি করে। বস্তু মরলেও তাদের ধারা আছে বলেই বার বার বস্তু গড়ে অমর হয়ে যায়। তাই যে নিজের স্বার্থ বোঝে সে অমরত্বের স্বার্থ বোঝে। তাই সে অমরত্বের জন্য জীবন দিতেও পারে। এই অমরত্ব সংকীর্ণ স্বার্থ নয়, কারণ তার ধারা যে জনগণ পৃথিবীকে রক্ষা করতে চায় এবং তাদের উপযুক্ত করতে সাহায্য করে।

স্বার্থান্বেষীর মাথার পরে মৃত্যু এলে সে জীবনের চেয়ে জনগণকে বেশি ভালবাসে না। এই ক্ষুদ্র জীবনে সে জনগণকে মেরে কেড়ে সব কিছুকে ভোগ করতে চায়। তারা ভাবে, মরতেই যখন হবে, তখন মায়া বাড়িয়ে লাভ কি? জীবনকে চরম ভোগ করে যাই। তাতে কলঙ্ক হলেও ভয় নাই, কারণ জীবন তো

আর বেশি সময় নাই। অর্থাৎ তারা নিজের জীবনকে ভালবাসে না বলেই পরের জীবনকে ভালবেসে অমরত্বের কথা চিন্তা করে না। সে ভোগের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। তার সন্তানও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে না পেরে সমাজের ঘৃণ্য জীব হয়ে ওঠে।

প্রতিভাশালীও ভোগ চায়। সেখানে লোভের চেয়ে আবেগ কাজ করে বেশি। সে একটা অন্যায় করতে চায় আবেগের বশবর্তী হয়ে। কিন্তু তার বাঁধা মন তাকে তা করতে দেয় না। পরে সে অন্যায় প্রকাশ পেলে সে অনুশোচনা করে বলে, ভবিষ্যতে আর আমি অন্যায় করব না। স্বার্থান্বেষী ভোগী মানুষের সে ধরণের আবেগ থাকে না। তার আবেগ লোভের আবেগে রূপ নেয় বলেই তার আবেগে সমাজের উন্নতি হয় না। যদি সে ভাল হতে শেখে অনেক ঠেকে শেখে। তার আগে সমাজের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। প্রতিভাশালী মনের বাঁধনে ক্ষতির আগে শিখতে পারে।

সমস্ত পরীক্ষা তো প্রকৃতির গবেষণাগারে হচ্ছে। তার দু চারটির গবেষণা করবার জন্য আমরা গবেষণাগার তৈরি করি। এমন বহু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে যে সব প্রকৃতির গবেষণাগারে সম্ভব হয়েছে। আইনস্টাইনের সব প্রমাণ প্রকৃতির গবেষণাগারে সম্ভব হয়েছিল। পরে তা মানুষের গবেষণাগারে ঝালিয়ে নেওয়া হয়। আগে প্রকৃতির গবেষণাগারকে আশ্রয় না করলে, একক ক্ষেত্রতত্ত্বে যাওয়া কোনদিন সম্ভব হবে না।

বড় একজন ধার্মিক যেমন প্রকৃতির রহস্যে মুগ্ধ হয়ে উত্তর খোঁজে, বড় একজন বিজ্ঞানীও তেমনি প্রকৃতির রহস্যে মুগ্ধ হয়ে উত্তর খোঁজে। চাওয়া অনুযায়ী পাওয়ার ব্যাখ্যা হয়। অসতী নারী চিন্তা করে তার উপপতি কখন আসবে? প্রৌঢ়া স্ত্রী চিন্তা করে তার স্বামী কখন আসবে? বালিকাবধূ চিন্তা করে তার স্বামী কখন আসবে? প্রথম দুজন আগন্তুকের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়, কারণ তারা প্রেমে মজে গিয়েছে। বালিকাবধূ সে ধকল তেমন সইতে পারে না। মনে তার স্বামীর চাহিদা থাকলেও রোমান্স প্রধান। তাই সে ভাবে, সে আসুক কিন্তু…

একটা রুগ্ন ছেলে ক্লাসের পড়ায় উৎসাহ পায় না, কিন্তু খেলায় উৎসাহ পায়। ছেলেটির উৎসাহ না থাকায় খেলা তাকে উৎসাহ দিল। নিজের উৎসাহ যদি থাকত ক্লাসের পড়ায় উৎসাহ না থাকলেও পড়াকে উৎসাহিত করত। সেই ছেলেটিকে অন্য কোন কারণ যদি টেনে রাখত, তবে সে পড়া ও লেখার কোনটি করতে সময় পেত না। তেমনি ভাবে আইনস্টাইনের কাছে যা নিরস সেই

সংসারের অস্থিরতা তাঁকে একক ক্ষেত্রতত্ত্ব আবিষ্কারের উৎসাহ থেকে টেনে রেখেছিল। তিনি যদি সেই সংসারকেই আবিষ্কারের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিতেন তবুও তিনি একক ক্ষেত্রতত্ত্বের একটা দিক আবিষ্কার করতে পারতেন। বিজ্ঞানের নানা বেড়াজালকে ভেঙ্গে দিতে পারতেন। তিনি বলার সুযোগ পেতেন যে, ভগবান যেমন সর্বত্র আছেন, বিজ্ঞানের কৈন্দ্রিক কার্যকারিতাও তেমনি সর্বত্র আছে। মানুষের অবস্থা যখন যেখানে নিয়ে যায়, সেখানেই একক ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রভাব আছে। কোন কিছুকে বাদ দিয়ে একক ক্ষেত্রতত্ত্ব হয় না। তাঁর প্রতিভা তাঁকে একক ক্ষেত্র তত্ত্বের চিন্তা দিলেও পদার্থ বিজ্ঞানকে মূল ভাবায় আসল মূলে যেতে পারেন নি। কোন অংশ সম্পূর্ণ হতে পারে না তাতে। কিন্তু সেই অংশ সম্পূর্ণকে জানার ঠিকানা বলে দিতে পারে। অংশে অংশে অনেক উত্তর পাওয়া গেলেও সম্পূর্ণের জন্য অনেক প্রশ্ন রেখে যায় তারা।

একক ক্ষেত্র তত্ত্ব জানতে হলে কোন কিছুকে হেলা করলে চলবে না। এখানে আইনস্টাইনের আবিষ্কারকে ভুল প্রমাণ করতে চাইছি না। তাঁর আবিষ্কারের মধ্যে এমন সব প্রশ্ন জেগে ওঠে যেগুলো ছুঁতে পারলে একক ক্ষেত্রতত্ত্ব সহজ হতে পারত। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষে সেদিকে নজর দেওয়া সম্ভব নয়। এই পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া তাকে মূল সূত্রকে জানতে দেয় নি বলে বিজ্ঞানের আরও প্রসার ঘটাতে পারেননি। নিজের প্রয়োজন ছাড়া কোন কিছু জানতে ইচ্ছা করে না। যদি একবার জানার সুযোগ আসে প্রয়োজনের তাগিদে, তবে সেই জানা ভাল লাগাকে আহ্বান করে। এই ভাল লাগাই মাধ্যাকর্ষণের কাজ করে। হাতের পরে এক গেলাস তেল রাখলে নড়াচড়ায় পড়ে যায়। কিন্তু সেই ভরা গেলাসটাকে কানায় ধরে ঝুলিয়ে নিলে তলার দিক মাধ্যাকর্ষণে চেপে রাখে বলে জোরে হাঁটলেও আর পড়ে না। প্রাকৃতিক আকর্ষণ যেখানে, সেখানেই উন্নতি।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বয়স যখন ১২ বছর, তখন তাঁর কাছে অঙ্ক ছাড়া বিশেষ কিছু ভাল লাগত না। তাঁদের পরিবারে গান বাজনার রেওয়াজ থাকলেও তিনি তা শিখতে উৎসাহ পেতেন না। তিনি বাধ্য বাধকতা ভালবাসতেন না বলে পিতা মাতার বেহালা বাজানো শিক্ষার ইচ্ছা নাকচ করে দেন। তবু পিতা মাতার প্রবল চেষ্টায় যখন তিনি বেহালা থেকে একটা সুর-মূর্ছনা বের করতে পারলেন; তখন থেকে বেহালা বাজনায় তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হ'ল। সেই বেহালা তাঁর সারা জীবনের সঙ্গী হয়েছিল।

তিনি স্কুলের গণ্ডীকেও পছন্দ করতেন না। সেখানে যেমন নিজের ইচ্ছা মত শিক্ষা পাওয়া যায় না, তেমনি ইচ্ছা মত বেরিয়ে আসাও যায় না। তাদের নিয়মানুবর্তিতা যেন জার্মান সৈনিকের নিয়মানুবর্তিতার মত নীরস। স্কুলের শিক্ষকদের চরিত্র যেন উচ্চপদস্থ সৈনিকের মত। তারা শুধু মুখস্থ করতে শেখায়, যা আইনস্টাইনের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাঁর মুখে তেমন ভাষা ফুটত না বলে মনের কথাও ঠিকমত প্রকাশ করতে পারতেন না। এই অনগ্রসরতার জন্য তাকে বেত খেতে হত।

তখন জার্মানির প্রাথমিক স্কুলে ছিল ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। তাঁর পারিবারিক ধর্ম ছিল ইহুদী। প্রথম স্কুলে তিনি সেই ধর্ম শেখার সুযোগ পান। যখন তাঁরা রোমান ক্যাথলিকদের শহর মিউনিকে এলেন, সেখানকার স্কুলে পড়তে হল ক্যাথলিক ধর্ম। অবশ্য অ্যালবার্টের ধর্মের কোন গোঁড়ামি ছিল না। সেটা তাঁর পক্ষে ভাল হলেও, ধর্মকে গুরুত্ব না দেওয়ায় মন্দও হয়েছিল। সেই মিউনিকের স্কুলের তিনি ছিলেন একমাত্র ইহুদী ছাত্র। তাছাড়া তিনি খেলাধুলা পছন্দ করতেন না। এই সব কারণে তাঁর প্রায় একঘোরে হয়ে একা একা ঘুরতে হত। তিনি শান্তিতে চলাফেরা করতে চাইতেন, কিন্তু তাঁর সহপাঠীরা তারও সুযোগ দিত না। তবে এত বাধা বিপত্তি সহ্য করেও তিনি লেখাপড়ায় শিক্ষকদের মন জয় করে নিয়েছিলেন।

তার কর্মজীবনেও ইহুদী বলে তিনি কোথাও চাকরির সুযোগ পান নি। তাই তাঁকে অনেক সময় উপবাসে থাকতে হয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন একটু স্থিতি। তাঁর ইচ্ছা ছিল, চাকরি পেলেই বিয়ে থা করে ঘর সংসার করবেন। এইভাবে অসহায় অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে উইন্টারথার শহরে একটি কারিগরী বিদ্যালয়ে বিকল্প শিক্ষকতার কাজ পেলেন। সেখানে পড়াতে গিয়েও ছাত্রদের ঘৃণার পাত্র হলেন। তারা তাঁকে বিদ্রূপ করতে লাগল। পরে তাঁর প্রতিভা বুঝতে পেরে অবশ্য শ্রদ্ধা করতে লাগল।

তাঁর আত্মীয়রাও তাঁকে ঘৃণা করতে লাগল। যে স্কুলের সঙ্গে তাল রেখে পড়াশোনা করতে পারেনি, সেই অনভিজ্ঞ বিয়ে থা করে কেমন করে স্ত্রীর পেটের ভাত জোগাবে? সে আবার কিনা বিজ্ঞানী হতে চায়! এটা তার স্বপ্নবিলাস মাত্র।

ছাত্রাবস্থায় অনাহারের ফলে তাঁর শরীর ভাল যেত না। হজম শক্তিও কম ছিল। সংসারের প্রতি তাঁর কোন নজর ছিল না। স্ত্রী এলসা সব সময় তাঁকে

চোখে চোখে রাখতেন। কেউ দেখা করতে এলে চিন্তা করে দেখতেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে তাকে দেখা করতে দেওয়া যাবে কিনা। তিনি যখন বাইরে বেরুতেন তখন এলসা পয়সা হিসাব করে পকেটে ঢুকিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে তাঁকে সাহস যোগাতেন যাতে কোন ব্যাপারে ঘাবড়ে না যান। এই মানসিক দুর্বল মানুষটির বাইরে যদি কোথাও পয়সার দরকার হত, ভুলে যেতেন যে তাঁর পকেটে পয়সা আছে। বাড়ীতে ফিরলে স্ত্রীই স্মরণ করিয়ে দিতেন, তোমার পকেটে পয়সা রয়েছে অথচ প্রয়োজন মত খরচ করনি। স্নানের সময় কোন সাবান ব্যবহার করতে হবে, দাড়ি কামানোর সময় কোন সাবান ব্যবহার করতে হবে তাও বলে দিতে হত।

এই ভাবভোলা নরম প্রকৃতির মানুষ আইনস্টাইন জার্মানিতে বাস করেও হিটলারের জার্মানিকে অপরাধী বলতে কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর আদর্শের পথে তিনি অটল ছিলেন। তবু সেই বিরোধিতার পাশে ছোট বড় কত ঘটনা ঘটে যেত তা তিনি লক্ষ্য করতেন না। ইউরোপে যুদ্ধ যখন শেষ হল, তখন আবার সবাই দেশে ফিরে আসতে লাগল। তখন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র এডওয়ার্ড দেশে ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি তাকে কোন স্নেহ প্রদর্শন করলেন না। এমনি নানা ক্ষেত্রে তিনি নির্লিপ্ত ও নিরুত্তাপ ছিলেন। এই নিরুত্তাপ মানুষটি আবার কখনও কখনও হাসতেন এবং হাসাতেও জানতেন।

কোন কাজ করতে গেলেই আকর্ষণের পরেই বিকর্ষণ এসে হাজির হবেই। একক ক্ষেত্রতত্ত্বের লক্ষ্যে পৌছাতে গেলে সেই চিন্তায় পথকেও জানতে হবে। নইলে লক্ষ্যে পৌছানোর পথে ঘাটে পায়ে কাঁটা ফোটার সম্ভাবনা থাকে। আমরা যে খাদ্য খাই, তার প্রয়োজনীয়টুকু আকর্ষণ করে অসার বস্তু মল ও বায়ু রূপে বিকর্ষণ করি। এই আবর্জনা যদি মলদ্বার ত্যাগ না করত তবে শরীরের মধ্যে গ্যাস হয়ে রোগ সৃষ্টি করত। তাই কোন কিছু আকর্ষিত হলেই বিকর্ষণের ব্যবস্থা করতেই হবে। তেমনি মৃত্যুপথযাত্রী নক্ষত্রের মৃত্যুতে আকর্ষণ অনুযায়ী বিকর্ষণ সম্ভব হয় না বলেই শরীরের মধ্যে আবর্জনা রুদ্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটায়। তবু তার মৃত্যু হলেও সৃষ্টিকে যা দেওয়ার তা দিতেই হবে।

জার্মানিতে বিসমার্কের সময় থেকে ইহুদী বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠলেও হিটলারের সময় তা ভীষণ আকার ধারণ করে। রাজনীতিজ্ঞরা বলতে লাগলেন, জগতে যত প্রকার অন্যায় সংঘটিত হয়েছে বা হচ্ছে সব কিছুর জন্য ইহুদীরা দায়ী। আইনস্টাইন কিন্তু কোনদিন নিজেকে জার্মান ছাড়া ইহুদী ভাবতেন না।

রাজনৈতিক দুটি চক্র তা ভাবাতে বাধ্য করল। জাতিধর্মের বিজ্ঞান না জানলে এসব অন্যায় মাথা পেতে নিতে হয়। তিনি ধর্ম হিসাবে বিজ্ঞানকে মেনে নিলেও, জনসমাজে তার ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি।

একটা দেশের সবাইকে আগে দেশের মাটির ধর্মকে মানতে হবে, তারপর মানতে হবে পেশার ধর্মকে। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে রিলিজিয়নে। একটা গাছকে যদি ধর্ম বলা যায়, তবে শাখারা তার নানা পথ, যে পথে রিলিজিয়নের সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠা যায়। সেই রিলিজিয়নে সবাই উঠতে পারে না। সেখানে উঠতে পারলে জ্ঞানের একক ক্ষেত্রতত্ত্ব সাফল্যমণ্ডিত হয়। কারণ, সেখানে উঠতে তাকে শাখাপ্রশাখা সহ সমগ্র গাছকে জানতে হয়। সেখানে সব জ্ঞান এক জ্ঞান হয়ে যায়, সেই জ্ঞানের সব মানুষ এক ধর্মের মানুষ হয়ে যায়।

যত খেয়োখেয়ি চলে সেই [illegible]পালায়। সেখানে ডালের চেয়ে ভূত বেশি। সেই ভূত বর্তমানকে করে চঞ্চল, ফলে ভবিষ্যৎ হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট। তিনি সেই বর্তমানের চাঞ্চল্যে পড়েছিলেন। তিনি ইহুদীর সন্তান হলেও ইহুদী জীবনের লক্ষ্য সেই রিলিজিয়নে পৌঁছাতে পারেন নি। সমগ্র ধর্মে একমাত্র মানুষই রিলিজিয়নে পৌঁছাতে পারে। অন্যান্য জীব বা পদার্থের ধর্ম থাকলেও রিলিজিয়নে পৌঁছাতে পারে না। মানুষের জ্ঞানে কর্মে ভক্তিতে একমাত্র রিলিজিয়ন সহ সমগ্র ধর্ম আছে।

ভারতীয় হিন্দু আরবে গেলে আগে আরবীয় মাটির ধর্ম মানতে হবে। সেই মাটির পরে দাঁড়িয়ে হিন্দু ধর্ম মানতে হবে। মোহম্মদ তো আরবীয় মাটির ধর্মকে সেখানকার মানুষের উপযোগী করে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করেন। তাই ভারতীয় ইসলাম ধর্মকে তারা ইসলাম ধর্ম বললেও আরবীয় ধর্ম বলে না। এই বিজ্ঞানকে হেলা করে কিন্তু ভারতীয় মুসলমান নিজেদের আরবীয় ধার্মিক বলে জাহির করতে চায়। ফলে আরবের কাছে তাদের ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়াতে হয় কারণ তারা ভারতীয় মুসলমানদের আরবীয় বলে না। ভারতীয় ধর্মের পরে দাঁড়িয়ে তাদের আরবীয় রিলিজিয়নকে মানতে হবে। আরবীয় ধর্মের পরে দাঁড়িয়ে ভারতের অর্থাৎ হিন্দুস্থানের হিন্দুদের ভারতীয় রিলিজিয়নকে মানতে হবে। আসলে হিন্দুস্থানের যত প্রকার রিলিজিয়ন আছে তাদের সবাই আরবীয় ধর্মের মধ্যে। গাছের গোড়া না থাকলে যেমন গাছের চূড়া থাকে না, তেমনি মাটির ভিত্তি না থাকলে তার চূড়ারূপ রিলিজিয়ন থাকে না। এই বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান না থাকলে চিরদিন রাজনীতির কাছে মানব সমাজকে শোষিত হতে হবে।

এই রাজনীতি বিজ্ঞানী-আইনস্টাইনকে জার্মান না ভেবে ইহুদী হিসাবে ঘৃণিত করে রেখেছিল। তাঁর যোগ্যতা থাকতেও চাকরি না দিয়ে তাঁকে উপোসী করে রেখেছিল। সমগ্র জার্মানদের বোঝানো হয়েছিল, রুজি রোজগারের ক্ষেত্রে ইহুদীরা চাপ সৃষ্টি করলে তোমরা কাজ পাবে কি করে? অথচ এই সঙ্কটের আসল কারণ ছিল মহাযুদ্ধ। সেই মহাযুদ্ধের কারণ রাজনীতি। এই রাজনীতিকে বাঁচানোর জন্য তাই অহরহ চলেছিল মিথ্যা প্রচার। তারা বলত, মিথ্যা বারবার বললে সত্য হয়ে যায়। সেই সত্যের মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম সমগ্র মানব দরদী আইনস্টাইন জার্মান না হয়ে সেই মানব সমাজের ক্ষুদ্র অংশ ইহুদীদের নেতা হয়ে উঠেছিলেন। এই রাজনীতি ভারত ও পাকিস্তান বিভাগের সময় দেখা গিয়েছিল। প্রচারের জোরে তারা নিরপেক্ষ মানুষকে সাম্প্রদায়িক করে তুলেছিল। ভারতীয় রাজনীতি পাঞ্জাবীদের ভাগ করে সংখ্যা লঘু করে দিল।

এই সংকীর্ণতা থেকে বাঁচবার জন্য লড়তে গিয়ে আইনস্টাইন আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিলেন। এই অবস্থায় একক ক্ষেত্রতত্ত্ব বহু ক্ষেত্রতত্ত্বে পরিণত হতে বাধ্য। জায়োনিজমে বলা হল, প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের মাতৃভূমি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক। অন্যান্য জাতির মত তাদেরও একটা নিজস্ব ভাষা হোক। আর একদল ইহুদী ছিল, তারা বলল, যে যেখানে বাস করছে, তাদের কাছে সেই দেশই প্যালেস্টাইন। জার্মানিবাসী আইনস্টাইন সহ অনেক ইহুদী তা মানতে পারলেন না। তাই হিটলারের অত্যাচারে তাঁদের নিজস্ব একটা দেশের প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। সেই দেশকে তারা নিজের দেশ ভাবতে দিল না।

প্রত্যেকের নিজস্ব দেশ থাকবে, দেশ অনুযায়ী ধর্ম থাকবে। সমস্ত ধর্মের মহান ব্যক্তিরা যখন রিলিজিয়নে উঠে যাবেন, তখন সমস্ত দেশ বন্ধুত্বে এক হয়ে যাবে। এই তো স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু সেই নানা দেশের ইহুদীরা নিজেদের দেশ হিসাবে ইজরাইল গড়ল। তবু সেই ইজরাইলকে প্যালেস্টাইন ভাবতে পারল না তারা, কারণ আগেই তারা নানা দেশের ধর্মে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। পূর্বদেশ প্যালেস্টাইনের মাটিতে বাস করলে এমন বিভেদ ঘটত না। নানা দেশের মাটিতে বাস করার ফলে এই বিভেদ। বাসভূমিকে ধর্মের স্থান ভেবে নিজের নিজের পথে রিলিজিয়ন ভাবতে হবে। ধর্ম এক হলেও তাই পাকিস্তানের মুসলমান আরবের মুসলমানের সঙ্গে মিশতে পারে না, চীনের বৌদ্ধ ভারতের বৌদ্ধদের সঙ্গে মিশতে পারে না। এমনি নানা পার্থক্যে ইহুদীদের ধর্ম মত জুডাইজম একাধিক হয়ে গিয়েছে। এই অব্যবস্থা পৃথিবীর সমস্ত ধর্মে চলছে।

আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন ইহুদীয় কৃষ্টি কেন্দ্র গড়লে পৃথিবীর সমস্ত ইহুদীদের নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় হবে। রাজনৈতিক চরিত্র আইনস্টাইন তেমন বুঝতেন না বলে এসব দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভাবতেন কেন তাকে বিজ্ঞানের জন্য সম্মান দেওয়া হয় আবার ইহুদী বলে ঘৃণা করা হয়? প্রুশিয়ান একাডেমিতে কাজ করার সময়ও দেখেছেন, তিনি যখন একাডেমিতে বক্তৃতা দিতে উঠতেন, তখন ছাত্ররা শ্লোগান দিত, ইহুদী জাতি নিপাত যাক, ইহুদীদের মেরে হঠাও।

মানুষের অনেক প্রতিভা সামাজিক কারণে নষ্ট হয়ে যায়। সমাজের সঙ্গে আকর্ষণ বিকর্ষণে মানুষ গড়ে ওঠে। সেই সমাজ যদি দূষিত হয়, তার প্রভাব মানুষের পরে পড়তে বাধ্য। পরিবেশকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। জন্মানোর আগে তো জীবকে মাতৃগর্ভের পরিবেশে বাড়তে হয়। আলেকজাণ্ডার ডুমার 'দি কর্সিকান ব্রাদার্স' উপন্যাসে বলা হয়েছে, আনাড়ি পিস্তলবাজ লুই দ্বন্দ্বযুদ্ধে ঝানু পিস্তলবাজ শ্যাটো রেনোর গুলিতে নিহত হল। তখন ফ্রান্সের আটাশ কিলোমিটার দূরে সেই লুই-এর যমজ ভ্রাতা লুসিয়েন বুকের পাঁজরের যন্ত্রণায় চলন্ত ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। লক্ষণীয় লুই এর যেখানে গুলি বিদ্ধ হয়েছিল, লুসিয়েনের সেখানেই যন্ত্রণা অনুভূত হতে লাগল। এটা গল্প কথা হলেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের খাতিরে। খোঁজ নিতে হবে সেই যমজদের জননীর জঠরের দিকে যেখানে ডিম্বাণুর সঙ্গে শুক্রাণুর মিলন ঘটেছিল। এই নিষিক্ত ডিম্বাণুর মধ্যে দ্বিতীয় কোন শুক্রাণু ঢুকতে পারে না পরিবেশের বিরুদ্ধতার জন্য। সেই দুই এর আকর্ষণ বিকর্ষণে রচিত ভ্রূণাণুটিই কোষ বিভাজনে ও নানা ধরণের রূপান্তরে ২৮০ দিন পরে মানব শিশু জন্ম দেয়। যদি কোন মাসে একটি ডিম্বাণুর স্থানে একাধিক ডিম্বাণু পরিপক্ক হয়ে আলাদা আলাদা শুক্রাণুর সঙ্গে নিষিক্ত হয়, তবে একবারে একাধিক সন্তান হতে পারে।

একটি শুক্রাণু দ্বারা একটি ডিম্বকোষ নিষিক্ত হয়েও কিছুদিন পরে ভ্রূণাণুটি যদি একাধিক অংশে বিভক্ত হয়ে যায় তবে একাধিক শিশুর জন্ম হতে পারে। প্রথম ধরনের যমজদের ক্ষেত্রে কিছুকিছু পার্থক্য ঘটে জিনগত পার্থক্যের জন্য। এক্ষেত্রে জিনগত পার্থক্য থাকে না স্বাভাবিকভাবে একটি ডিম্বাণু ও একটি শুক্রাণু নিষিক্ত হওয়ায়। এখানে যমজরা একই লিঙ্গের, একই চরিত্রের এবং একই শারীরিক বৈশিষ্ট্যের হবে। আবার কখনও কখনও এমন সন্তানের জন্ম হয়, তারা পরস্পর থেকে সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত হতে পারে না।

এমনি এক সংযুক্ত যমজ সন্তান শ্যামদেশের থেরেসা ও যোসেফা। তাদের জননতন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্র এক হলেও রক্ত সরবরাহ তন্ত্র একই সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাই তাদের মধ্যে একজনের সন্তান প্রসব হলে দুজনের স্তনে দুগ্ধ দেখা দিত। তাতে প্রমাণিত হয় দুগ্ধ উৎপাদনের সহায়ক যৌগটি (হর্মোন ল্যাকটিন) রক্তের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।

জননী জঠরের কেন্দ্রভিত্তিক পরিবেশ থেকে জন্ম নিয়ে মানুষ সমাজের কেন্দ্রভিত্তিক পরিবেশে আসে। তখন তার সমাজের সঙ্গে তাল রেখে চলবার জন্য প্রয়োজন হয় শারীরবৃত্তের বিজ্ঞান। তার সঙ্গে আমাদের খাওয়া দাওয়া, খেলাধুলা, চলাফেরা, বিশ্রাম ইত্যাদি জড়িত থাকে। বিজ্ঞানী জন ইকলস দেখিয়েছেন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের আগে স্নায়ুকোষ বা নিউরণের মাধ্যমে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণবার্তা কিভাবে শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌছায়। এই শারীর বৃত্ত সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে আণবিক জীববিদ্যা, জীবরসায়ন, জিনপ্রযুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়। শারীর বৃত্ত জানা না থাকলে মনোবিজ্ঞানীরা মানসিক রোগীর মনের কথা, তার মানসিক অবস্থার কথা ভালভাবে জানতে পারেন না। কেউ কেউ বলছেন, শারীর বৃত্ত জানা থাকলে দেহের ভঙ্গির উপর নির্ভর করে স্নেহ মমতা সুখ শান্তি বুঝতে পারা যাবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা মাতৃজঠর থেকে শুরু করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পরিবেশের সঙ্গে আকর্ষণে বিকর্ষণে কাজ করে চলেছি। বিজ্ঞানকে নানা ভাগে ভাগ করলেও তারা মূলত একক ক্ষেত্রতত্ত্ব যুক্ত। এই প্রকৃতির মধ্যে আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক জগতের ব্যর্থতা এবং সাফল্য গড়ে উঠেছিল। সমাজ উপযুক্ত না হলে পুরুষকার মার খেয়ে যায়। ভাগ্যকে বিশ্বাস না করলেও ক্ষেত্রবিশেষে বিজ্ঞানীকেও ভাগ্যকে মানতে হয়। কোন মানুষ ভবিষ্যতে কি হবে জ্যোতিষী বিজ্ঞানী হাত দেখে, কপাল দেখে চালচলন দেখে এবং শারীর বৃত্ত বুঝে বলে দিতে পারেন। তাই কেউ কাউকে এক্ষেত্রে অবজ্ঞা করতে পারেন না।

শরীরের সবকিছু গুণ মিলিত হলে মন হয়। আসলে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মত মন বলে কোন বস্তু নাই। তাই মন কান নয়, যদিও আমরা কানে শোনা শব্দ মনে শুনতে পাই। মন নাক নয়, যদিও আমরা কোন গন্ধ নাকে পেলেও মনের নাকে ঘ্রাণ নিতে পারি। মন শরীর নয়, যদিও আমরা শরীরের ব্যথা সেরে গেলেও বহুদিন পরে অনুভব করতে পারি। মন হচ্ছে সবকিছুর সূক্ষ্মস্তরের অনুভূতি। সে অনুভূতি অলীক নয়। সে বস্তুর ভাবপারের ভাঙ্গনের ধারা। আলোর

কণিকা আছে। সেই আলোতে আমরা দেখি। সেই দেখা আমরা স্বপ্নেও দেখি আলোক কণিকার অশেষ ভাঙনের ভাবময় আলোতে। আমরা পৃথিবীর আকাশকে যদি পৃথিবীর কারণে সৃষ্ট বলে স্বীকার করি, তবে সেই স্বপ্নের আলোকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে। মস্তিস্ক যেখানে এদের মূলে কাজ করছে, সেখানে মস্তিস্ক তা স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

আকর্ষণ বিকর্ষণের সংঘাত সর্বক্ষেত্রে কাজ করে। বিরোধিতাই বিপ্লব আনে। আইনস্টাইনকে আগে তেমন কেউ চিনত না। যখন থেকে তিনি হিটলারের বিরোধিতা আরম্ভ করলেন, তখন সবাই তাকে জানতে চাইল। তখন থেকেই হিটলার-বিরোধী দেশগুলো তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে লাগল। এখন অবশ্য বিজ্ঞান জগতে তিনি একেশ্বর হয়ে আছেন।

ডিম্বকোষকে কেন্দ্র করে শুক্রাণুর আকর্ষণ বিকর্ষণ চলে। সেখানে একটি শুক্রাণুর প্রয়োজন। তাই শুক্রাণুরা প্রতিযোগিতা করে চলে কে সেই একটি শুক্রাণু হতে পারবে। সেই এক শুক্রাণু ডিম্বকোষের সঙ্গে নিষিক্ত হয়ে ভ্রূণাণু সৃষ্টি করে। সেই ভ্রূণাণু আবার আকর্ষণ বিকর্ষণে কোষ বিভাজনে ও নানা ধরণের রূপান্তরে সন্তান সৃষ্টি করে। এই ভ্রূণাণু বিভক্ত হয়ে যে একাধিক সন্তান হয় তারা একই লিঙ্গের হয়। কারণ, একই ভ্রূণের কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ একই রকমের। মেয়ে জাতিকার ভ্রূণাণুর আকর্ষণ বিকর্ষণের পরিবেশ মেয়ের উপযোগী, পুরুষ জাতকের ভ্রূণাণুর আকর্ষণ বিকর্ষণের পরিবেশ পুরুষের উপযোগী। তাই পুরুষ থেকে প্রকৃতির সৃষ্টি হয়নি, প্রকৃতি থেকেও পুরুষের সৃষ্টি হয় নি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তবু দেবতার প্রাধান্য দেয়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ তবু দেবীর প্রাধান্য দেয়। সৃষ্টির ক্ষেত্রে একা পুরুষ প্রাধান্য বিস্তার করতে পারলেও সৃষ্টি করতে পারে না। একা নারীও প্রাধান্য বিস্তার করতে পারলেও সৃষ্টি করতে পারে না। একা কেন্দ্রই সৃষ্টি করতে পারে নারী বা প্রকৃতি এবং পুরুষ রূপ ধারার আকর্ষণ বিকর্ষণে। কেন্দ্রের এই দুটি চরিত্রই নারী পুরুষের চরিত্র। কখনও পুরুষ বা কখনও নারীকে সবকিছুর স্রষ্টা বলা হয় মাত্র প্রাধান্যকে লক্ষ্য করে।

আইনস্টাইনের প্রাধান্য বিজ্ঞান জগতে তেমনিভাবে এসেছে। তাঁর আবিষ্কার সত্য হলেও কেন্দ্রভিত্তিক না হতে পারায় বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ে পড়েছে। তাই একক ক্ষেত্রতত্ত্বে যত এগুনো যাবে, তাঁর প্রাধান্য তত কমতে থাকবে। তবে তাঁর আবিষ্কারকেও কেন্দ্রনির্ভর হতে হয়েছে অজান্তেও। যদি তিনি সেই

কেন্দ্রকে জানতেন তবে তিনি স্থায়ী প্রাধান্য রেখে যেতে পারতেন। পুরুষ যেখানে নারী হতে পারে, নারী যেখানে পুরুষ হতে পারে সেখানে কেন্দ্রভিত্তিক চিন্তাই চিরন্তন সত্যের মূল চিন্তা।

তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে এক বাঁধতে পারেন নি বলে মানব-কল্যাণে খুব কমই লেগেছে। পরবর্তীকালে অবশ্য কোন কোন বিজ্ঞানী তাঁর বিজ্ঞানকে মানব সমাজের কল্যাণে আনার চেষ্টা করেছেন।

১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে যখন তাঁর জাহাজ নিউইয়র্ক বন্দরে নোঙর করল, তখন তাঁকে দেখার জন্য অগণিত লোকের ভীড় হয়েছিল। ভীড়ের ঠেলায় তিনি জাহাজ থেকে নামতে না পেরে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। সাংবাদিকরা যখন প্রশ্ন করলেন, কি উদ্দেশ্যে আপনি আমেরিকায় এসেছেন? এখানে কতদিন থাকবেন? যুদ্ধোত্তর জার্মানীর অবস্থা এখন কেমন ইত্যাদি।

আইনস্টাইন তখন উত্তর দিলেন, এখানে আমার উদ্দেশ্য হল প্যালেস্টাইনের পুনর্গঠন এবং সেখানে একটা ইহুদী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন জনগণের সমর্থনের চেষ্টা করা।

কোন কোন সাংবাদিক রাজনীতির খাতিরে বিজ্ঞানীর কাছ থেকে এই উত্তরই বের করতে চেয়েছিলেন। যাঁরা তা মনে করেননি, তারা প্রশ্ন করেছিলেন, ডঃ আইনস্টাইন, আপনি তো বিজ্ঞানী। আপনি কি মনে করেন না, সর্ব প্রথমে আপনার কাছে বিজ্ঞানের প্রশ্ন আসা উচিত?

আইনস্টাইন বললেন, না। সর্বাগ্রে মানবতার প্রশ্নই আসা উচিত। যুদ্ধ বিজ্ঞানকে আঘাত করছে ঠিকই, কিন্তু সে আঘাত মানুষের অশেষ দুঃখ দুর্দশা সৃষ্টি করেছে। আগে তাই মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করা উচিত।

এখানে দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন আর ইহুদী আইনস্টাইন একই মানুষকে রাজনীতি কিভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। বিজ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে তিনি বিজ্ঞানী সাজছেন। সাম্প্রদায়িকতার কথা বলতে গিয়ে তিনি ইহুদী সাজছেন। যে লোকটা সদ্‌ভাবে ধর্ম পালন করতে চায়, আবার সেই লোকটাই অবস্থার চাপে অসদ্‌ভাবে অন্যায় করতে বাধ্য হয়। এমন লোকই জগতে সবচেয়ে বেশি। বিজ্ঞানী হিসাবে আইনস্টাইনের উচিত সমস্যাকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মোকাবেলা করা। তাহলে আইনস্টাইন দুই-এর কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার যোগ্য হতেন। এইভাবে কত আইনস্টাইনের মত মহাপুরুষরা রাজনীতির বলি

হয়েছেন। রাজনীতি সমাজকে এমনভাবে গড়ে রেখেছে যে, সমস্যার মোকাবেলা করতে গেলেই রাজনীতির বলি হতে হয়।

সৃষ্টিতে সবই একক কেন্দ্রতত্ত্বের প্রতিফলন। বিজ্ঞানীরা এখানে বলতে পারেন, সবই কেন্দ্রের ইচ্ছায় চলছে। যেমন ধার্মিকরা বলে থাকেন সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় চলছে। এখানে ঈশ্বরই সেই কেন্দ্র। চিন্তায় যদি ফাঁক না থাকে রাজনীতিও সেখানে হুল ফোটাতে পারে না।

আইনস্টাইনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে যে ফাঁক দেখা গেল, তা পৃথিবী ও তার আকাশের ফাঁকের মত। আকাশকে বাদ দিয়ে পৃথিবীকে ভাবা যায় না, আবার পৃথিবীকে বাদ দিয়ে আকাশকেও ভাবা যায় না। আকাশ যদি একেবারে শূন্য হত, পাখা নাড়লে বাতাস পেতাম না। বাতাস যখন থাকে না, তখনও আকাশ ভরা শক্তি থাকে। আকাশে যদি শক্তি না থাকত আকাশে উপগ্রহ থাকত না। পরমাণুর মধ্যে কেন্দ্রভিত্তিক ইলেকট্রন ঘুরত না তার আকাশের শক্তিতে আকাশের সঙ্গে বস্তুর যোগাযোগ শক্তির দ্বারা। তেমনি শক্তির যোগাযোগ চলেছে ফ্রিজের মধ্যে বস্তুর, নারকেলের মধ্যে জলের। আকাশের অস্থিরতায় শক্তির প্রকাশ, যেমন সমুদ্রের অস্থিরতায় ঢেউয়ের প্রকাশ। গরমের সময় দেখা যায় কোথাও হাওয়া বইছে না, তখন কিন্তু দেখা যায় বহুতল বিশিষ্ট দুই বাড়ির মধ্য-পথে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। দুই প্রসারিত আবহাওয়া শক্তি প্রকাশ করে পরস্পরের মধ্যের সংকীর্ণ পথে। এই গলি দুয়ের প্রভেদ সৃষ্টি করেছে বলেই বাতাস পাওয়া গেল। যেদিক দিয়ে বাতাস আসছে সেদিকে আবহাওয়ার ঘনত্ব বেশি। তাই অপরদিকের আবহাওয়ার অঘুষ ঘোচাতেই গলিতে হাওয়ার এত প্রাবল্য। সে চায় দুই দিককে সমান করতে। এই কারণেই শক্তির মূল সূত্র পরস্পরের আপেক্ষিক শূন্যতা পূর্ণতায়।

জগতের সবকিছুই কেন্দ্রবাদ মেনে চলে। অবস্থাভেদে কেন্দ্র ছোট বড়, মৃদু ও দৃঢ় হতে পারে পরিবেশের সঙ্গে তাল রেখে আকর্ষণে বিকর্ষণে। কিন্তু তাদের চরিত্র পাল্টায় না। পরিবেশের কাছে হাইড্রোজেনের আগুন এক রকম, সাধারণ আগুন আর এক রকম। হাইড্রোজেন আগুনের কাছে, ভোজ্যতেলের স্ফুটনাঙ্ক এক রকম, সাধারণ আগুনের কাছে আর এক রকম। সেই তেলের তুলনায় জলের স্ফুটনাঙ্ক আরও কম। এই জলেরও স্ফুটনাঙ্ক বেশি করা যায়, যদি উপযোগী আগুন সৃষ্টি করা যায়।

আগুনের তাপে তেলের দাড়ায় উপর নির্ভর করছে তার স্ফুটনাঙ্ক। আগুনের

তেজ কমতে থাকলে স্ফুটনাঙ্ক কমতে থাকে। আগুন ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর স্ফুটনাঙ্ক থাকে না। আগুনের চরিত্র প্রকাশ কারক, ঠাণ্ডার চরিত্র গোপন কারক। তাই সে স্ফুটনাঙ্ক প্রমাণের জন্য প্রকাশিত হতে পারে না। ঠাণ্ডায় জল বরফ হয়। বরফের ভূমির খাদে যদি জল থাকে তা বরফ হতে চায় না। কারণ সেই জলের তলের বরফ শীতলতা আকর্ষক। ঐ জলকে বরফ করতে হলে শীতলতা উপর থেকে চাপাতে হবে। এই শীতলতার চৌম্বকত্বের শূন্যতা জলকে বরফ করে। শূন্যতার চৌম্বকত্ব আছে বলেই শীতলতা পাই। বিকর্ষণে উষ্ণতা পাই। আগুনের বিকর্ষণজনিত শূন্যতায় হাওয়া আকর্ষিত হয়। এইভাবে হাওয়া থেকে আমরা শক্তি পেতে পারি। কোন জলে ভাসমান পাত্রে একপাশে অবরোধ রেখে আগুন জ্বালালে হাওয়ার ঠেলায় পাত্রটি জলে ভেসে যেতে পারে।

শীতকালের শীতলতা নিজে চলে না হাওয়ায় চলে। আসলে শীতলতা আত্মগোপনকারী। গ্রীষ্মকালের উষ্ণতা নিজে চলে, আসলে উষ্ণতা আত্ম-প্রকাশকারী। দুয়ের আত্মা বা কেন্দ্র এক। একই মানুষের শীতকালে একটু উষ্ণতা ভাল লাগে, গরমকালে একটু শীতলতা ভাল লাগে। একটা লোকের কাছে তাই বেশি উষ্ণতা উপযোগী নয়, বেশি শীতলতা উপযোগী নয়। এই দুয়ের বিচারে সহ্যের একটা কেন্দ্র সৃষ্টি হয়েছে। সেই কেন্দ্রটি হচ্ছে মানুষের সহ্যের কেন্দ্র। উষ্ণতার সীমা নির্ধারিত হয় শীতলতার দূরত্বের পার্থক্যে, শীতলতার সীমা নির্ধারিত হয় উষ্ণতার দূরত্বের পার্থক্যে।

আধুনিক জগতের নিউটন আইনস্টাইন মহাযুদ্ধের কবলে পড়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্তে সে ইচ্ছা বানচাল হয়ে যায়। নিজের ইচ্ছা ও পারিপার্শ্বিক ইচ্ছার দ্বন্দ্ব সব সময় চলছে ও চলবে। এই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্রভিত্তিক ভাবে ঠিক ঘটনায় ঠিক সময়ে প্রয়োগ করতে হবে। কোনকিছু সেদ্ধ করতে গেলে জলের স্ফুটনাঙ্ক দরকার হবে, কোনকিছু ভাজতে গেলে তেলের স্ফুটনাঙ্ক দরকার হবে। দুই ক্ষেত্রেই উত্তাপ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। স্ফুটনাঙ্ক সম্বন্ধে আইনস্টাইনের একটা রসাত্মক গল্প আছে। ১৯২১ সালে একবার তিনি প্রাগের ফ্রাঙ্ক দম্পতির আতিথ্যে ছিলেন। অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক একদিন আইনস্টাইনকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে, আইনস্টাইন তাঁকে বলেন, আজ রান্না করার জন্য কিছু জিনিস কেনা যাক। তিনি সেই মত বাজার করলেন। বাড়িতে ফিরে পথশ্রমে আইনস্টাইন যখন ঘুমিয়ে পড়লেন, তখন মিসেস ফ্রাঙ্ক বাজার থেকে আনা বাছুরের যকৃৎ নিশ্চিন্তে বসে রান্না করছিলেন।

কিছু সময় পরে আইনস্টাইন ঘুম থেকে উঠে অধ্যাপক ফ্রাঙ্কের সঙ্গে বিজ্ঞান-বিষয়ে আলোচনা করতে বসলেন। গল্প করতে করতে হঠাৎ তিনি মিসেস ফ্রাঙ্কের কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, এসব কি করছেন আপনি? জলে যকৃৎ সেদ্ধ করছেন কেন? জলের স্ফুটনাঙ্ক এত কম যে তাতে যকৃৎ ভাজা যায় না। ভাজতে হলে মাখন বা চবির মত উচ্চ স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট কোন বস্তু ব্যবহার করতে হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মিসেস ফ্রাঙ্ক কলেজের ছাত্রী ছিলেন, তাই রান্না তেমন বুঝতেন না। সেইদিন তিনি আইনস্টাইনের কাছে রান্না শেখেন।

আইনস্টাইনের এই রান্নায় বৈজ্ঞানিক চরিত্র কাজ করেছিল। এই বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সমাজের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও। সামাজিক অবিচারে ভেঙে পড়লে চলবে না। বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে অসময়ে বিজ্ঞানকে ভুলে যাওয়া, ধার্মিকের ক্ষেত্রে অসময়ে ঈশ্বরকে ভুলে যাওয়ার সমান অপরাধ। জার্মানির অত্যাচারে আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীরাও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন ডঃ র‍্যাথেনিউ ছিলেন জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রী। তিনি ইহুদী হওয়ার দরুণ জার্মানরা তাঁর পদ ত্যাগের দাবী জানাতে লাগল। যখন তিনি পদ ত্যাগ করলেন না, তখন তাঁকে হাতবোমার আঘাতে হত্যা করা হয়।

রাজনীতি যেখানে এই ধরণের কাজ করে, সে রাজনীতিকে ভাল করা যায় না। রাজনীতিকে ভাল করতে গিয়ে সেই জালে ভাল মানুষরাও জড়িয়ে পড়ে নির্যাতন ভোগ করে। তখন আর গণনীতি নেতৃত্ব খুঁজে পায় না। তাই রাজনীতির মোকাবেলা করতে হবে গণনীতি দিয়ে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন জাতিসঙ্ঘও একটা রাজনৈতিক জাল বিস্তার করেছিল। ১৯২২ সালে যখন জাতি সঙ্ঘের কাজ পুরো দমে চলছে তখন বিশ্বশান্তির স্বার্থে বিশেষ বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছিল। সেগুলি হল সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত। বিজ্ঞানের দায়িত্ব পড়ে চোদ্দটি দেশের মণীষীদের উপর। তাদের মধ্যে ছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন, পোল্যাণ্ডের মাদাম কুরী, ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজির ডক্টর রবার্ট এ. মিলিক্যান এবং লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর লোরেনৎস্। শেষের তিনজন ছিলেন আইনস্টাইনের বিশেষ বন্ধু।

এই সময়ে এক সাক্ষাৎকারে আইনস্টাইন বলেন, বর্তমান শক্তিবর্গ যেসব নৃশংসতম কাজ করে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা জাতি সঙ্ঘের আছে বলে মনে হয় না। এইভাবে জাতি সঙ্ঘের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে তিনি পদত্যাগ করেন। পদত্যাগ পত্রে তিনি লেখেন, একজন বিশ্বস্ত শান্তিকামী

মানুষ হিসাবে আমার মনে হয় না যে, এই জাতিসঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সম্ভব।

এই ধরনের ভালমানুষেরা রাজনীতি ছাড়তে বাধ্য হন। যেহেতু গণনৈতিক কোন সংগঠন নাই সেই হেতু তাঁরা প্রতিবাদ করার প্লাটফর্ম পান না। এই সুযোগে একচেটিয়া রাজনীতি সবাইকে পদানত করে রেখেছে।

তিনি প্যালেস্টাইনের দাবীতে প্রচারে বার হলেন। বহু দেশ ঘুরে সিংহলের কলম্বো, সেখান থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে সিঙ্গাপুর, তারপর দক্ষিণ চীন সাগরের মধ্যদিয়ে হংকঙে গেলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ভারতে আসতে পারেন নি।

তিনি ইহুদীর ইতিহাস মণ্ডিত দেশ প্যালেস্টাইনকে নূতন করে চিন্তা করতে লাগলেন। এই প্যালেস্টাইনেই যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ১১০০ বছর আগে থেকে ইহুদীরা বাস করে আসছিল। খ্রীঃ পূঃ ৭০ শতাব্দীতে সেখানে রোমানরা অধিকার বিস্তার করে। ১৫১৭ সালে অটোম্যান তুর্কীরা প্যালেস্টাইনকে পুনরায় দখল করে। এবং তা স্থায়ী ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত।

বহু চেষ্টাতেও ইহুদীরা সেখানে ফিরতে পারেন নি। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড বেলফোর প্রস্তাব করেন যে, ইহুদীদের একটা জাতীয় ভূমি থাকা উচিত। সে প্রস্তাব সমর্থন করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ সালের ১৫ই মে তারিখে স্বাধীন স্বতন্ত্র ইস্রায়েল প্রজাতন্ত্র গঠিত হল। তার প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন ডঃ চেইম ওয়াইজম্যান। অবশ্য প্রথমে আইনস্টাইনকে রাষ্ট্রপতি করার প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি।

এক কেন্দ্র চাঁদ। পুকুরের জল স্থির থাকলে তাকে এক চাঁদই দেখায়। অস্থির জলে সেই চাঁদ অনেক চাঁদ হয়ে যায় অস্থির মানুষের নানা চিন্তার মত। আসলে একটা চাঁদকে এক আধারে একটাই দেখায়। হাওয়ায় জল অস্থির হলে বহু ঢেউয়ের আধারে বহু দেখায়। ঢেউয়ের প্রতিটি উচ্চতায় প্রতিটি চাঁদ দেখা যায়। তেমনি হাজার হাজার লোকের চোখের মণির উচ্চতায় চাঁদ হাজার হাজার হয়ে যায়। আর হাজার হাজার লোকের প্রত্যেকে একটি করে চাঁদ দেখছে। তবে প্রত্যেকের দুটি করে চোখের বল আছে, তবে চাঁদকে কেন দুই দেখছে না? দুই চোখে দুটি চাঁদ ফুটে উঠলেও মন তাদের একটি দৃষ্টি কোণে এনে ফেলে। সেখানে মনের কথা আসে। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অন্তর স্তরের দেখা। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির মূল সেখানে।

প্রাকৃতিক শক্তি অনুযায়ী সব কিছু চলছে। প্রকৃতির সঙ্গে তাল রেখে চলছে

তাই শক্তি কম খরচ হয়। তাই পরিশ্রম কম হয়। একটা ঢিলকে ছুড়ে মারলে ঢিলটি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তাকে হাতে করে নিয়ে গেলে শক্তিতে রূপান্তরিত হয় না। তেমনি হাওয়ায় একটা জিনিষ ভেসে গেলে শক্তিতে রূপান্তরিত হয় না। হাওয়ার গতি অনুযায়ী সে চলে। হাওয়া থেমে গেলে সে পড়ে যায়। ছুড়ে দেওয়া ঢিল শক্তিতে রূপান্তরিত হয় বলেই ছোঁড়া শেষ হয়ে গেলেও বাতাস কেটে চলতে থাকে। শক্তি শেষ হয়ে গেলেই ঢিলটি পড়ে যায়। বায়ুশক্তি আর ধরে রাখতে পারে না। আগুন জ্বাললে আলো হয়, সেই আলো ভেদ করে ধোঁয়া হয়। সেই আগুনকে জল ঢেলে নিভিয়ে দিলে আলো থাকে না। কিন্তু তার ধোঁয়া থাকে কিছু সময়। এখানে ধোঁয়া দেখে আগুনের অস্তিত্ব বর্তমান, একথা বলা যায় না। আগুন না থাকলেও ধোঁয়া শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে বলেই ধোঁয়ার চলন দেখা যায়। সে তখন আগুনের আবহাওয়া ছেড়ে স্বাভাবিক আবহাওয়ায় চলতে থাকে। পরে সেই আবহাওয়াতে হারিয়ে যাবে। মহাকাশ যাত্রীরা মহাকাশে যে ভেসে চলে, তা সেই আবহাওয়ার শক্তির জন্য। নিজের শক্তি সেখানে কাজ করে না।

শক্তি উৎপাদন করতে পারে একমাত্র কেন্দ্র। আগুনের কেন্দ্র ধোঁয়া সৃষ্টি করল। সেই ধোঁয়া আবহাওয়ায় শক্তি সৃষ্টি করতে পারে না। ধোঁয়ার অসংখ্য কণা আছে, তারা নিজেদের কেন্দ্র অনুযায়ী আবহাওয়ার শক্তি নিয়ে ভাসতে থাকে। কিন্তু ধোঁয়া হিসাবে নয়। ছোঁড়ার শক্তি শেষ হয়ে গেলে ঢিলটি পড়ে যায় শক্তি-শেষের নির্দিষ্ট স্থানে। কারণ ধোঁয়ার কণার মত পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ঢিলকে ভাসিয়ে রাখতে পারে না। ভাসাও নির্ভর করে আবহাওয়া ও বস্তুর কেন্দ্রেরউপর। এই নিয়ম মেনে মহাকাশে ভেসে আছে সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র ইত্যাদি। আবহাওয়ার আকর্ষণে বিকর্ষণে তাদের কেন্দ্রশক্তি সৃষ্টি হচ্ছে বলেই, তারা ভেসে আছে।

পনেরো

খোলা জায়গা বারুদে আগুন ধরালে সে অল্প শক্তি বিস্তার করবে বারুদের পরিমাণের তুলনায়। তাতে সময়ও লাগবে বেশি। এই সময়কে সংক্ষিপ্ত করতে পারলে অল্প বারুদে প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যেতে পারে। ঐ বারুদকে শক্ত করে বেঁধে হাত বোমা তৈরি করে আছাড় দিলে এক মুহূর্তে একই সঙ্গে সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে সে প্রচণ্ড শব্দে শক্তি প্রকাশ করবে। এটাকেই বলে সময়ের শক্তি। বস্তুর চেয়ে যেমন পরমাণুর শক্তি বেশি, তেমনি সময়ের চেয়ে পরম সময়ের শক্তি বেশি। যে আইনস্টাইন আলোর সামনে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন মিশ্রণজনিত

বিস্ফোরণের যে ব্যাখ্যা দিলেন; সেই আইনস্টাইন আবার বস্তুর গতি বাড়িয়ে সময়ের হিসাব করতে বলেছেন। হাত বোমার গতির মত গতির সঙ্গে বদ্ধতার সম্পর্ক না থাকলে সময়ের হিসাব পাওয়া যায় না। এই সময়ের শক্তি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করে দিতে পারে। কিন্তু সময় আলোর গতির সঙ্গে, বাতাসের গতির সঙ্গে, শব্দের গতির সঙ্গে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রসরতার সঙ্গে অনন্ত হয়ে আছে বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিস্ফোরিত হচ্ছে না।

আইনস্টাইন পূর্বগামী বিজ্ঞানীদের মত বিশ্বাস করতেন যে বহির্জগতের অস্তিত্ব নিরপেক্ষ ও হেতু প্রভব বিজ্ঞানে সব কিছু সম্ভব। বর্তমান বিজ্ঞান তা বিশ্বাস করছে না। পদার্থ বিজ্ঞানীরা এই হেতুবাদকে নাকচ করে দিয়েছেন। তাঁরা সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে মত প্রকাশ করেন। তবে এই হেতুবাদ সম্ভব হতে পারে সেণ্টারিজম মানলে। তার হেতু সব কিছুর মধ্যে কাজ করে চলেছে। আইনস্টাইন বলেছেন, মহাশূন্যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সময়ের গতিকে অদল বদল করতে পারে। যদি আলোর গতির কাছাকাছি গতি নিয়ে গিয়ে এই সৌরজগৎ ছাড়িয়ে অন্যান্য সৌরজগৎ ঘুরে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসা যায়, তবে দেখা যাবে যে এক জীবনে এত ঘুরলেও পৃথিবীতে অনেক বয়সের পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। হয়তো ইতিমধ্যে কয়েক শতাব্দী পার হয়ে গিয়েছে।

বস্তুর মধ্যে সময় কাজ করছে পূর্বে বলেছি। মহাকাশ থেকে ঘুরে আসার পর তার শরীরেও সময় কাজ করতে থাকবে। সে যখন যে নক্ষত্রের সংস্পর্শে থাকবে, তখন সে সেই নক্ষত্রের সময়ের বশবর্তী হবে। আপেক্ষিক শূন্যতায় সময় দীর্ঘ হয়। তাই সমতল ক্ষেত্র থেকে পাহাড়ের আপেক্ষিক শূন্যতায় গেলে শরীর অনেক সুস্থ থাকে। শূন্যতা শরীরকে বাধা থেকে কিছুটা মুক্ত করে আপেক্ষিক শীতলতা দেয়। সেখানে উত্তাপের সূচ ফোটানো জীর্ণতা তেমন থাকে না, যার ফলে জীবনের সময় ছড়ানো বারুদের বিস্ফোরণের মত দীর্ঘস্থায়ী হয়।

মহাকাশে জীবনের আয়ু বাড়লেও প্রসরতার অবসরে মনে হবে সামান্য সময় ধরে মহাকাশে ঘুরছি। পৃথিবীতে ফিরলে সবাইকে আবহাওয়ার চাপে সময়ের সংকীর্ণতায় বেশি বয়স্ক মনে হবে। যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে আকর্ষণীয় খেলায় মেতে আছে, তার কাছে বড় সময়কেও বড় মনে হবে না। অসীম মনে হবে না। সেই লোকটা যদি আগুনে হাত দেয়, তবে তার কাছে পাঁচ সেকেণ্ড সময়কেও অসীম মনে হবে। শরীরের মুহূর্তের জীর্ণতা সময়কে অসীম করে। প্রকৃতির জীর্ণতার সঙ্গে তাল রেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এলেও সময় আয়ত্ত থাকে।

চলা মানেই দূরত্বে চলা। এক স্থান থেকে অন্য স্থানের দূরত্বে অসীম বেগে চললেও অতীতে ফিরে যাওয়া যাবে না। এই দূরত্বই তার পথের কাঁটা। তার গতি ভবিষ্যতে। কারণ বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে তার পৌঁছাতে হচ্ছে বর্তমান কালে। গতি অসীম হলে বর্তমান ভবিষ্যৎ ও অতীতকে এক মনে হবে। কিন্তু তাদের ভেতরের সময় পরমাণুর স্তর পার হয়ে ভাবের স্তরে চলে যাবে। তিনকাল মিলে সেখানে এক হবে। সেখানে আলাদাভাবে অতীতে যাওয়া যাবে না। ভবিষ্যতেও যাওয়া যাবে না। কেন্দ্রের যেখানে প্রসার নাই সেখানে চলা অবান্তর।

যে কোন কেন্দ্রের স্পন্দন থাকে। একবার আকর্ষণ আর একবার বিকর্ষণ এই ভাবে সে নিজের বর্তমান অতীতে পার করে দিয়ে ভবিষ্যতে চলে। এই তিন কাল সৃষ্টির জন্য রাতের আকাশে দেখি নক্ষত্ররা মিটমিট করছে। তা আর কিছু নয়, তা কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। বস্তু থাকলে তাদের মধ্যে দূরত্ব থাকবে। দূরত্ব থাকলে তাদের ভেতর চলা থাকবে। সে চলা হল বর্তমানে দাঁড়িয়ে অতীত সৃষ্টি করতে করতে ভবিষ্যতে চলা। অতীতে ফিরতে হলে সৃষ্টিতে বস্তু থাকলে চলবে না। আবার বস্তু না থাকলে অতীত কালকে কোথায় পাব? বস্তুকে মেরেই তো সব কাল বিশিষ্ট হয়ে আছে। অতীতে ফিরে আসার জন্য পৃথিবীকে যদি উল্টো ঘুরতে হয় পথে যা ফেলে এসেছিল তা কুড়ানোর জন্য, তবে তো সূর্যকে উল্টো ভাবে চলতে হবে। সে চলাও অতীতে চলা নয়, ভবিষ্যতে চলা। উল্টো চলার আরম্ভটা অতীত হচ্ছে, চলাটা বর্তমান হচ্ছে ভবিষ্যতে যাওয়ার জন্য। তখন অতীতে যেতে গিয়ে ভবিষ্যতে পৌঁছাতে হবে। পৃথিবী উল্টো ঘুরে বা সোজা ঘুরে যদি মুঘল যুগেও ফিরে আসে, তবুও ধরে নিতে হবে সে ভবিষ্যতে পৌঁছেছে।

ধরা যাক একটা মাঠে, বাঁশ কাঠ দিয়ে একটা ঘর বানানো হল। তখন যদি বলা যায়, আবার অতীতে ফিরিয়ে দাও সব কিছুকে। তখন ঘরটাকে ভেঙ্গে সরিয়ে দেওয়া হল। এইভাবে অতীতে ফিরে যাওয়া যায় এক রকম। প্রকৃতপক্ষে অতীতে ফিরতে হলে ঐ বাঁশ কাঠগুলোকে আবার গাছ হিসাবে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। তারপর তাদের বয়স কমিয়ে গাছের চারায় পরিণত করতে হবে ইত্যাদি। এইভাবে আমাদের সৃষ্টির মূলে যেতে হবে। অসীম গতিতে চললেও অতীতে ফেরা যায় না।

যে রাস্তা একবার ফেলে যাওয়া যায়, সেই রাস্তায় যদি আবার ফিরে আসতে হয়, তবে বর্তমানের রাস্তাকে পেছনে ফেলে আবার ফিরে আসতে হবে। তখন প্রশ্ন উঠবে, সে রাস্তায় কোথা থেকে ফিরলাম? তখন কিন্তু আবার ফেরার অতীত কথা বলতে হবে। কাজেই অতীত স্থানে ফেরা গেলেও অতীত কালে ফেরা যায়

না। কাল তখন মরে যায়। অতীতের জন্ম হয়েছিল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালকে মেরে। সেই অতীতে ফিরতে হলে তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। একটা অক্ষয় বস্তু না মরতে পারে কিন্তু একটা নতুন বস্তুর যদি জন্ম দিতে হয় তবে সে কখনও অমর হবে না। অমর হবে না বলেই তার জন্মদাতাকে মৃত্যুসহ স্বীকার করতে হবে। তা ছাড়া যে অতীতে ছিল না, সে অতীতে যাবে কেমন করে? বর্তমান বিজ্ঞান মোগল যুগের বাদশাদের শরীরের কোষ পেলে বাদশাদের চরিত্র সহ ফিরিয়ে আনতে পারে কিন্তু সময়কে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় কারণ সময় চলে বস্তুর সঙ্গে।

পরমাণুর ক্ষেত্রে চারদিক থেকে বেষ্টনির চাপ ভরশক্তি সৃষ্টি করে। গ্যাসের ভর শক্তির সৃষ্টি হয় বদ্ধ পাত্রের আবদ্ধতায়। হাত বোমা ভরশক্তি পায় তার বাঁধন থেকে। এই বাঁধনই শক্তিকে ধরে রেখে প্রচণ্ড করে। হাত বোমায় আঘাত করলে সমস্ত শক্তি ক্রমে না বেরিয়ে একসঙ্গে সংক্ষিপ্ত সময়ে বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে মানুষ মারে। বাঁধন না থাকলে বেশি সময় ধরে বিস্ফোরিত হতে থাকলে শক্তি কম হয়। এই বাঁধনই শক্তি প্রকাশের সহায়ক হয়। এমনি ভাবে পরমাণুর শক্তিও ভরের সময় অল্পতায় নির্ভর করে। ভরশক্তির যে বিস্ফোরণ সময় স্বল্পতা ছাড়াও নির্ভর করে তার আবহাওয়ার উপর। যে ভরশক্তি যে আধারে ধরা আছে, সেই আধারের চেয়ে আবহাওয়া যদি বেশি চাপের হয়, বিস্ফোরণ ঘটবে না। তবু কিছুটা চাপ দরকার বোমার শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দীর্ঘ সময়ের শক্তি একসঙ্গে বিস্ফোরিত হওয়ার জন্য। চাপ কম থাকলে তো পরমাণুগুলো আলাদা আলাদা ফেটে যাওয়ার ফলে শক্তির সঙ্ঘবদ্ধতা থাকে না। শক্তি প্রকাশের ফলে যে হাওয়া সরে যায়, সেই শূন্যতার কেন্দ্রে আর এক ভরে সেই হাওয়া এসে আঘাত করে। বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, শক্তি শূন্যতায় রূপান্তরিত হয়, সেই শূন্যতা আবার আকর্ষণের গুণে শক্তির কারণ। সেই শক্তি আবার বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। শূন্যতা না থাকলে বস্তু একত্র জমত না। আগুন জ্বাললে তার শূন্যতায় হাওয়া এসে অক্সিজেন ঝরিয়ে দিয়ে হাল্কা তপ্ত হয়ে উপরে উঠে যায়। অক্সিজেন যদি না ঝরাত, আগুনের ক্ষয়ে শূন্যতা হত না, সে শূন্যতায় আবার হাওয়া অক্সিজেন ঝরাতে আসত না।

শূন্য উত্তাপের জন্য সৃষ্টি হয়। উত্তাপ সেখানে থাকতে পারে না আশ্রয়ের অভাবে। কারণ বস্তু ছাড়া উত্তাপ হয় না। তাই শূন্যতার আসল রূপ ঠাণ্ডা। সেখানে শূন্যতা পূর্ণতা অর্থাৎ শীতলতা উত্তাপের সংগ্রাম চলে। শক্তির

উপস্থিতিতে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এই শূন্যতার আকর্ষণে ঢুকতে পারে হাওয়া। তাই অক্সিজেন ছাড়া হাওয়ার শূন্যতা আকর্ষণ না করে নিজেই বিকর্ষিত হয়। আসলে শূন্যতার থাকে আকর্ষণী শক্তি জনিত সংগঠন ক্ষমতা। বস্তুর গতিতে রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগের অভাবে শীতলতা। এই শূন্যতার শীতলতা অনুভব করেছিলেন বেলুন যাত্রী পিকার্ড ও তাঁর সহযাত্রী।

১৯৩১ সালের বসন্তকালে ভিয়েনায় আইনস্টাইন একটা সঙ্গীতানুষ্ঠানে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গান শুনছিলেন। এবং নিজেও তাতে বেহালা বাজাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন লোক এসে তাঁর হাতে চিরকুট দিল। তা পড়ে আইনস্টাইন জানতে পারলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান অধ্যাপক পিকার্ড। তিনি বেলুন অভিযানের বিষয়ে বক্তৃতা দিতে ভিয়েনাতে এসেছেন। তিনি আইনস্টাইনকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে চান। আইনস্টানও তাতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কারণ ষ্ট্রাটোসফিয়ার অভিযানের বাস্তব অভিজ্ঞতা জানা তাঁরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাঁর অনুমতি পেয়েই পিকার্ড সেই গানের আসরেই বেলুনে আকাশ অভিযানের কথা বর্ণনা করতে বসলেন। বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ষ্ট্রাটোসফিয়ারের শূন্যতায় যে শীত আছে, তার ভাল ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তিনি। সেই শৈত্য বিজ্ঞানীর থার্মোমিটারে ১০০° ডিগ্রী নিচে। অথবা গৃহব্যবহার্য থার্মোমিটারে হিমাঙ্কর ১৪৮° ডিগ্রী নিচে। তিনি আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বিমান অতি উচ্চতায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আটলান্টিক ওসান পাড়ি দিতে পারবে। ষ্ট্রাটোসফিয়ারে বিমান ঘণ্টায় ৪০০ মাইল বেগে চলবে। কিন্তু বিমান চালকদের নাকে অক্সিজেন ব্যবহার করতে হবে। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে সত্য প্রমাণিত হয়।

১৯৮৪ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখের খবরে প্রকাশ, মহাশূন্যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যে সময়ের গতিকে পাল্টিয়ে দিতে পারে, আইনস্টাইনের এই চিন্তাধারাকে মার্কিন প্রশাসন পরীক্ষা করে দেখতে চায়। এই পরীক্ষার জন্য ১৩০ মিলিয়ন ডলার আলাদা করে রাখা হয়েছে। স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা মহাকাশ ফেরীর সাহায্যে এই পরীক্ষা চালাবেন। তাতে আশাপ্রদ ফল পেলে এমন মহাকাশ যান তৈরি করা হবে, যা আলোক গতির কাছাকাছি গতিতে পরিক্রমা করতে পারবে। এই গতিতে নভশ্চরয়া নিজেদের জীবদ্দশাতেই নক্ষত্রপুঞ্জ পরিক্রমা করে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবেন। ইতিমধ্যে দেখা যাবে পৃথিবীর শত শত বৎসর পার হয়ে গিয়েছে।

নাসার প্রধান বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্রান্স বলেছেন, আজ পর্যন্ত যত পরীক্ষা হয়েছে তার মধ্যে এটি হবে সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষা। নাসা এই প্রথম প্রাকৃতিক মৌলিক শক্তিগুলিকে যাচাই করে নিচ্ছে। তাতে ২০ বছর ধরে বহু টাকা খরচ করা হয়েছে। এই মাধ্যাকর্ষণ সমস্যা প্রকল্প ১৯৯০ সালে কাজ শুরু করবে। এই পরীক্ষার লক্ষ্য থাকবে আইনস্টাইনের সাধারণ তত্ত্ব 'গ্রাভিটো ম্যাগনেটিজমের' একটি অংশের প্রতি। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে ঘূর্ণায়মান গ্রহ নক্ষত্র মাধ্যাকর্ষণের এমন একটি ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে, যা পরিক্রমারত মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রকে বাঁকিয়ে অথবা মুচড়িয়ে অদলবদল করা যাবে। এই পরীক্ষায় সফল হলে, মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে মহাশূন্যে সময়কে বিভিন্ন গতিতে চালানো সম্ভব হবে। তার ফলে মানুষ ইচ্ছামত অন্যান্য নক্ষত্রপুঞ্জে পৌঁছাতে পারবে।

শূন্যতা ও পূর্ণতা যে কোন বস্তুর চলায় সাহায্য করে। শূন্যতা বস্তুকে আকর্ষণ করলেই পেছনের আবহাওয়া পূর্ণতার ঠেলার শক্তিতে পরিণত হয়। সেই বস্তুকে যদি শূন্যতার আকর্ষণে না রেখে পেছনের পূর্ণতার ঠেলায় রাখা যায়, তবে সম্মুখের আবহাওয়া শূন্যতার আকর্ষণে পরিণত হয়। এখানে আকর্ষণ ও সময় অনুযায়ী শক্তিশালী হয়, বিকর্ষণ বা ঠেলাও সময় অনুযায়ী শক্তিশালী হয় বস্তুকে কেন্দ্র করে। সেখান থেকে বস্তুকে সরিয়ে নিলে কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণের পার্থক্য থাকে না। সেখানে থাকে একটা শূন্য ভাব। এই শূন্যতা অনন্ত। বস্তুর জন্ম সীমায়িত হয়েছিল, পরে সেই পর্যায়ে চলে যায়।

শক্তিকে সময়ের গতিতে মাপা যায়। সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের গতিতে না উঠলে, জল আকাশে বরফ হওয়ার আবহাওয়া পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। সেখানে জল বরফ হয়ে সময়ের গতিতে আবার পড়ে। বরফের ঘনত্বের ওজন পতনের সময় নির্ধারিত করছে মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে যোগসাজসে। বরফের পূর্ণতার চাপ ও তার সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণের শূন্যতার আকর্ষণে বরফ বা শিলা মাটিতে পড়ে। তাতে সৃষ্টি হয় জলের একটা চক্র। সময়কে যত ছোট করে ভাবপারে আনা যাবে, তত শক্তিশালী হবে। গাছের দুটি পাতা গায়ে গায়ে রেখে আলোর গতিতে যদি ভেদ করা যায়, তার সময়ের হিসাব নিশ্চয় পাওয়া যাবে। যে হেতু পাতার সংখ্যা দুটি তাই ভেদ করতে হয়েছে দুবার। এই দুই ভেদের পার্থক্যকে এক ধরতে হবে। এই দুটি পাতার দূরত্ব যত বাড়ানো যাবে, তত সময় শক্তি কমতে থাকবে। গায়ে গায়ে থাকা পাতা দুটির মধ্য ভাগ কেন্দ্র। তার থেকে গভীরে যাওয়া যায় না বলে সেই স্থানই চরম সময় শক্তির স্থান। এই সময় শক্তিকে

বাড়ালে কেন্দ্রশক্তি প্রকাশ পায়। তা কি ভাবে সম্ভব ?

আলোর গতি যে সময়ে জোড়া পাতাকে ভেদ করল সেই সময়ে যদি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা যায়, তার শক্তিও কেন্দ্র উত্তীর্ণ হতে পারবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রদক্ষিণ করলেও পারবে না। তাহলে অসীম পরম সময়ের মূলেও কেন্দ্র কাজ করছে। এই সময়ের হিসাব হবে একের বাঁ দিকে শূন্য বসিয়ে। দুটি পাতার দূরত্ব বাড়ালে সময়ের হিসাব হবে একের ডানদিকে শূন্য বসিয়ে। কোন গতি কেন্দ্রের উর্ধ্বে উঠতে পারে না বলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু গোলাকারে ঘুরতে বাধ্য হয়। কোন শক্তি সোজা ছুটে গেলেও অনন্ত সংখ্যক বস্তুর কেউ না কেউ বস্তুর গতির চাপে তাকে ধরে গোলাকারে ঘোরাবে। তাই প্রত্যেকের সৃষ্টির মূলে কেন্দ্র আছে। নাসার মহাকাশযান যেখানেই যাক না কেন এই হিসাবের বাইরে যেতে পারবে না।

দুই পাতার দূরত্ব আলোর গতি অতিক্রম করতে পারলেও, তার গতির সময়ে পৃথিবী বা সূর্য প্রদক্ষিণ করার ক্ষমতা আলোর নাই। আলোর চেয়ে দ্রুততম শক্তিরও নাই। তবু সেই সময়কে যখন হিসাবে ভাবা যায়, তখন তাকে ভাবপারের সময় বলতে হবে। তার এই সময়ের গতি কেন্দ্রের আকর্ষণে বিকর্ষণে নাই। তার গতি কেন্দ্রের গভীরে। তাকে এই সময় শক্তি দিয়ে অতিক্রম করতে পারলে গ্রহরা সূর্যের মধ্যে ডুবে যাবে। তারকাপুঞ্জরা পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক কেন্দ্রে আসবে। ফলে চাপে নিরেট হতে হতে শক্তি প্রকাশ করতে থাকবে অশেষ। এক সময়ে তা চাপে তাপে বিস্ফোরিত হয়ে বিগ ব্যাংগ সৃষ্টি করবে। তারা বিভিন্ন দিকে চলতে থাকবে আর বড়রা নিজের নিজের নির্বাচন অনুযায়ী সৌরজগৎ সৃষ্টি করবে। তার এক সৌরজগৎ যদি পৃথিবীর পর্যায়ে আসে, তবে সে পুষ্ট হলে অতীত কালের মোগল যুগকে উপহার দিতে পারবে।

এইভাবে বর্তমান সময় থেকে অতীত সময়ে ফেরা যায়। ভবিষ্যৎ সময়ে যাওয়া যায়। অতীত সময়ের মধ্যে ঢুকতে হলে কেন্দ্রের মধ্যে চলতে হবে, ভবিষ্যৎ সময়ে ঢুকতে হলে কেন্দ্রের বাইরে চলতে হবে। পৃথিবীর থেকে সূর্যের যেমন দূরত্ব, পৃথিবীর স্থানে ইলেকট্রন থাকলে, তার থেকে প্রোটনের তেমনি দূরত্ব। এই দূরত্ব আরও সূক্ষ্ম হয়ে আছে প্রোটনের কেন্দ্রে। বাইরের দূরত্বের যেমন অন্ত নাই, ভেতরের দূরত্বের তেমনি অন্ত নাই।

সময়ের বাঁধনে মহাবিশ্বের ধারা শক্তি প্রকাশ করে। সময় না থাকলে

ধারা থাকত না। তার শক্তিও থাকত না। সময় না থাকলে যে শক্তি প্রকাশের সময় প্রয়োজন হয়। সে সময় দেবে কে? বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হতে যে ধারা ছাড়ে, সেই ধারার প্রতিটি কণা সময়ে অণুপ্রাণিত। নইলে শক্তি, বস্তু, আকাশ, আলো, অন্ধকার কিছুই সৃষ্টি হত না। কত সময়ে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম হচ্ছে, তার পরে নির্ভর করে শক্তি। এই শক্তি বুঝে পথের মাপও' পাওয়া যায়। সময়ও পাওয়া যায়। এই মাপকে বলে সময়ের মাপ, এই শক্তিকে বলে সময়ের শক্তি। যখন পরস্পরের দূরত্ব থাকে না তখনও সময় থাকে। উভয়ের পারস্পারিক স্বাতন্ত্র্যেও সময়কাজ করে, কারণ দুই বিরোধী বস্তুতে শক্তি সৃষ্টি হয়। দুটি শালপাতা গায়ে গায়ে লাগালে দূরত্ব থাকে না, কিন্তু তাকে এক ফোঁড়ে ভেদ করলেও দুটি ফোঁড় আলাদা ভাবে হয়। যে পদার্থ যত ভারী ও কঠিন হবে, তার পরমাণুদের সময়ের ব্যবধান খুব কম, কারণ তার পরমাণবিক সময় আছে ও শক্তি আছে। পরমাণু শক্তিরও মূল উৎস সময়। সময় না থাকলে ক্ষয়জনিত শক্তিও প্রকাশ পায় না। সময় ছাড়া গতি হয় না। কিন্তু গতি ছাড়া সময় হয়। সময় ছাড়া বস্তু হয় না, কিন্তু বস্তু ছাড়া সময় হয়। বস্তু না থাকলে শূন্য আকর্ষণ ছাড়তে থাকে। তাই বস্তুর মধ্যে যেমন সময় চাই, তার বিপরীত শূন্যের মধ্যে সময় চাই। শূন্যের ভাবপারের কণারা তাই সময়ে গতি পেয়ে একত্রে বস্তু সৃষ্টি করে। সময় ছাড়া গতি নাই। মোগল যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যে ক্ষতি বৃদ্ধি হয়েছে তা যদি পৃথিবীকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তবে মোগল যুগ ফিরে পাওয়া যায়।

কেন্দ্র থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, সেই অতীতে যেতে হলে সেই কেন্দ্রের পথে তো ফিরতে হবে। বাইরের গতি বাড়িয়ে অতীতে পৌঁছানো যায় না। কেন্দ্রের আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে। বর্তমানকে যদি কেন্দ্র ধরা যায়, ভবিষ্যৎ তার অকর্ষণ, অতীত তার বিকর্ষণ। অতীতে বিকর্ষণের ঠেলায় বর্তমান কেন্দ্রকে এগিয়ে নিয়ে যাই ভবিষ্যৎ সময়ে বর্তমানকে গড়তে। সেখানে বর্তমান কেন্দ্র হলেই আকর্ষণ চালাবে আবার ভবিষ্যতে। সময় হল একটা। বর্তমান সময় হল আত্মকেন্দ্রের স্থান, অতীত ও ভবিষ্যৎ তার দুই অঙ্গ। বর্তমান তাই অতীতেও যেতে পারে না। একই শরীরের মাথা কি পায়ে অথবা হাতে যেতে পারে? সেই শরীর চলতে থাকলে ফেলে যাওয়া পথ অতীত ও লক্ষের পথ ভবিষ্যৎ হয়। ভবিষ্যতে চলার সময় ভবিষ্যতে পৌঁছানোর আগে ভবিষ্যতের হাওয়া আগে গায়ে লাগে। বাবা শুনলেন তাঁর ছেলে বহুদিন পর বাড়ি আসছে। ভবিষ্যতের এই খবর পেয়ে

বর্তমানেই বাবা আনন্দে উৎলা হয়ে ওঠেন। দিন যত অতীত হতে থাকে ভবিষ্যতের ছেলে আসার দিন তত নিকট হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে উদ্গ্রীবতাও তত বাড়তে থাকে। ছেলের আসা যখন বর্তমান হয়, অর্থাৎ ছেলে এসে উপস্থিত হয় তখন আর উদ্গ্রীবতা থাকে না। বাবা যখন শোনেন ছেলে মাত্র দশদিন থাকবে, তখন বাবা বিরহের কথা ভেবে বর্তমান দিনকে অতীত করতে থাকেন। দশদিন পর ছেলে চলে গেলে বাবা বিরহে কাতর হয়ে পড়েন। মিলন ও বিরহ বর্তমানেই সম্ভব হল। মিলন ও বিরহের জন্যই তো প্রেম এত মধুর। সেখানেও কাজ করছে সময়।

প্রেমের কারুকার্য একজনের সঙ্গে চলে, কামের কারুকার্য অনেকের সঙ্গে চলে। প্রেমের ধর্ম একজনকে ভালবাসা। তাই বলে কি সে জনগণকে ভাল বাসবে না? নিশ্চয় বাসবে। জনগণকে ভালবাসা মানে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে ভালবাসা নয়। যে মঙ্গলকে কেন্দ্র করে সমস্ত মানুষ জড়িত, সেই মঙ্গলকে ভালবাসতে হবে। জনগণের এই আত্মকেন্দ্র আর একজনের আত্মকেন্দ্র এক নয়। তাই প্রতিটি পরমাণুর আলাদা আলাদা কেন্দ্র, আবার তাদের মিলিত বৃহৎ রূপ পৃথিবীরও একটা আলাদা কেন্দ্র আছে।

যত বিরাটের কেন্দ্র হবে, তত তার সময় প্রশস্ত ধীর ও স্থির। যত তাকে ভেঙ্গে পরমাণুতে রূপান্তরিত করা যাবে, তত তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রের জন্য চঞ্চল। তাদের সময় সংকীর্ণ। পরমাণুর সময় দ্রুত বলে তার শক্তি তীব্র। এমনি তীব্র সময়ের আবহাওয়া পৃথিবীর মানুষকে যত শীঘ্র জরা এনে দিতে পারে, মহাকাশের প্রশস্ত সময়ের আবহাওয়া তা পারে না।

গতি বাড়িয়ে সময়কে পরম সময়ে পরিণত করা যায়। তার জন্য সময়ের শক্তি বাড়ে। এই শক্তিকে যত কমানো যায় সময়ের স্ফীতি বেড়ে স্থূল সময় সৃষ্টি হয়। কোন কিছুর জন্মের সময় তার নিজের সময়ও জন্ম নেয়। সে সময় জন্মের নিজস্ব। এই জন্মের সময় আসে স্রষ্টার থেকে। সময়ের স্থূলতায় সবকিছুর জন্ম হয়। সময় চূর্ণ হয়ে ভাবের আকারে এলে জন্ম দেওয়ার সময় থাকে না, অর্থাৎ জন্মের সময় থাকে না। সৃষ্টি হয় পরম শক্তির, যা পরমাণু থেকেও শক্তিশালী। এই শক্তি বস্তুর মধ্যে ঠেলা দিয়ে নতুনকে সৃষ্টি করে। এই শক্তির ঠেলায় বম্ব ফাটে। হাত বোমায় তাই বাঁধনের দ্বারা সময়কে সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে সব শক্তির এক সঙ্গে প্রকাশে প্রচণ্ডতা বাড়ে। বাঁধন ঢিলা হলে সময় বেড়ে যাওয়ায় বিস্ফোরণ সময়ে ভাগ হয়ে যাওয়ায় শক্তি কমে।

এই বাঁধনের রূপান্তর মাধ্যাকর্ষণ। এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় বলে পৃথিবী বিস্ফোরিত হয় না। শক্তি উৎপাদনে একটা আঘাত চাই। সেই আঘাত আছে বলেই, গ্রহ উপগ্রহ ঘোরে, জীব চলাচল করে। সেই আঘাতের দুই পক্ষ নেগেটিভ ও পজেটিভের মত। সাপ ও নেউলের মত। মহাশূন্যে যত প্রচণ্ড শক্তিধারা থাকনা কেন, তাতে গা ভাসালে নূতন শক্তি উৎপাদিত হতে পারে না, যদি না দুই শক্তির পার্থক্য থাকে। মহাকাশ যানের গায়ে যে শক্তির প্রকাশ দেখা যায় তা শুধু আবহাওয়ার চাপের জন্য। গতির কারণে নয়। সে চাপেও অবশ্য আকর্ষণ বিকর্ষণ চলে। গতির তুলনায় তা নগণ্য। সময় থাকে বস্তুর শক্তির রূপান্তরের মধ্যখানে। আর শক্তির বস্তু রূপান্তরের মধ্যখানে ধারার গতি নির্ধারকরূপে।

জলের সঙ্গে জল মেশালে যেমন বিক্রিয়া হয়ে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত হয় না, সময়ের সঙ্গে সময় মেশালেও তেমনি অন্য সময়ে রূপান্তরিত হয় না। পরিমানে বেড়ে যেতে পারে মাত্র। তেমনি এক গুণের চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর সঙ্গে আর এক চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর মিলন হয় না। সময় প্রতিটি বস্তু প্রতিটি ব্যক্তির কেন্দ্র অনুযায়ী সৃষ্টি হয় বলেই পার্থক্যের জন্য মিলতে পারে। যেমন চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর সঙ্গে উত্তর মেরু মিলতে পারে, দুয়ের কেন্দ্রভিত্তিক পার্থক্য সৃষ্টি হয় বলে। সৃষ্টির এই বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুযায়ী সময়ের পেছনে ছুটে মিলতে পারে না। একই পুকুরের এক রকম জল বলেই কেউ কারো পেছনে ছোটে না। তাদের সময়ের দূরত্বের পার্থক্য থাকলেই তবে ছুটবে। দুই জলের পার্থক্য সময় সৃষ্টি করে। বস্তুর সঙ্গে সময় মিলে আছে। বর্তমানে বস্তু থাকে বলেই তার অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করি। জগতে বস্তু না থাকলে সময়ের হিসাব পাওয়া যেত না। বস্তু ও শূন্যতা একসঙ্গে না থাকলে শুধু বস্তু বা শুধু শূন্যের অর্থাৎ একের কোনরকম হিসাব থাকতে পারে না।

সূর্যের আলোর সাতটা বর্ণের সাতটি স্তর আছে সূর্যকে কেন্দ্র করে। সেই সাতটিতে সময় সাতভাবে কাজ করছে। যদি সাতটি বর্ণের কাচের বেষ্টনিতে এমন একটি গোলক তৈরি করা যায় সূর্যের সাত বর্ণের স্তরের মত সাজিয়ে, সেও তেমনি আলোক বর্ষণ করতে পারে বাইরে থেকে আলো ফেললে। তাকে বাইরে থেকে সোজাসুজি দেখলে সূর্যের মত এক বর্ণের মনে হবে, পাশ থেকে প্রতিটি স্তর দেখলে আলাদা আলাদা বর্ণের দেখা যাবে। এক একটি বর্ণের আলোর গতি এক একটি সময়ের। আলো প্রকাশের জন্য নানা আকারের কণার যে ক্ষয় হচ্ছে সূর্যের

সেই ক্ষয় পুরণের জন্য এবং উস্কিয়ে দিতে বাইরের ধারা এসে আঘাত করছে। সেই ধারা নানা আকারের কণায় নানা দূরত্বে আঘাত পেয়ে নানা স্তর সৃষ্টি করেছে। সেই নানা স্তরের রূপ নানা রঙের হতে বাধ্য। কারণ শক্তি সেখানে নানা সময়ের বস্তুর গতিতে চলছে। নানা স্তরের নানা পূর্ণতা ছাড়ার ফলে শূন্যতায় বাইরের নানা আকারের কণার ধারা প্রবেশ করতে পারে। এক এক আকারের কণার এক এক সঙ্ঘবদ্ধতার স্তর বাইরের সঙ্গে সংঘর্ষে এগিয়ে যেতে থাকে। যত দূরত্বে এগিয়ে যেতে থাকবে, তার শক্তি কমে বাইরের ধারায় হারিয়ে যেতে থাকবে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিজস্ব সময় আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি সূর্যের আলাদা আলাদা সময় আছে। সূর্যের গ্রহদের আলাদা আলাদা সময় আছে। সূর্য ও পৃথিবীর সংস্পর্শে রাত দিনের সময় আছে। সেই রাত দিনের সময় ঘড়িতে ধরা হয়েছে। সেই ঘড়ির কাঁটার সময় কর্মক্ষেত্রে প্রচলিত হয়। সেই সময় কর্মক্ষেত্রের মালিকের কাছে একরকম, কর্মীদের কাছে আর একরকম। সেই কর্মীদের একরকম সময় আবার প্রত্যেক কর্মীর কাছে প্রত্যেক রকম ভাবে বিভক্ত। কেউ হয়তো মালিককে দেখে ভয় পায়, কেউ হয়তো মালিককে দেখে আনন্দ পায়। যে আনন্দ পায় সে মালিকের কাছে পাঁচ ঘণ্টা বসলেও মনে ভাবে সে পাঁচ মিনিট বসেছে, যে ভয় পায়, সে মালিকের কাছে পাঁচ মিনিট বসলেও মনে ভাবে পাঁচ ঘণ্টা বসেছে। অথচ সবার সময়ের ঘড়ির কাঁটা পাঁচ ঘণ্টায় যতবার ঘোরে পাঁচ মিনিটে ততবার ঘুরেছে। অর্থাৎ তার শরীরের যন্ত্রগুলো অতি দ্রুত চালিত হয়েছে। বনে একটা বাঘ দেখলে শরীর যন্ত্রের ঘড়ি আরও দ্রুত চলে। হয়তো সময়কে সংক্ষেপ করে হার্টফেলও করতে পারে। চিড়িয়াখানার বাঘ দেখলে হার্টফেল করার প্রশ্নই ওঠে না, বরং সে বাঘ দেখার আনন্দও আয়ু বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। এখানে সাহস ও ভয় সময় বাড়ায় কমায়।

এই আয়ুরূপী সময়, আয়ুপ্রাপ্ত জীবনকে উন্নতির শিখরে তুলে দিতে পারে। যে সময়ে একটি লোক একটি মাল তৈরি করতে পারে, সেই সময়ে অন্য একটি লোক পাঁচটি মাল তৈরি করতে পারে। সময়কে কাজে যত নিরেট করা যাবে, তত জীবনের সময়কে স্বচ্ছল করা যাবে, দীর্ঘ করা যাবে। কাজের ক্ষেত্রে সময়ের প্রয়োগের কথা বলা হল। মনের ক্ষেত্রেও নানাভাবে বলা হয়েছে। আইনস্টাইনও বলেছেন, জ্বলন্ত স্টোভের পরে এক সেকেণ্ড বসলে অনন্তকাল মনে হবে, একটা ছলনাময়ী সুন্দরী নারীর সঙ্গে এক ঘণ্টা সময় কাটালেও মনে হবে মুহূর্ত মাত্র। সময় স্থান কাল পাত্রভেদে পাল্টায়।

পৃথিবীতে যা কিছু বাস্তবে আছে, সবারই নিজের নিজের সময় আছে। এইসব সময় পৃথিবীর কেন্দ্রে বাঁধা। সেখানে পৃথিবীর একটাই সময়। পৃথিবী সহ গ্রহদের আলাদা আলাদা সময় আছে, সবই সূর্যের কেন্দ্রে আছে। পরমাণু রূপী সৌরজগতে ইলেকট্রনরূপ পৃথিবীতে আমরা বাস করে কত রকম রঙ দেখি। রামধনুর সাত রঙ দেখি। এই সৌরজগতের বাইরে গিয়ে দেখলে সূর্যকে একটা ছোট মিটমিটে তারা মনে হবে। সূর্য থেকে পরপর সাত রঙের আলো সাজানো থাকলেও সাদা আলোর রঙই দেখতে পাব। সৌরজগতের মধ্যে থেকে যখন আমরা রামধনুর সাত রঙ দেখছি, সৌরজগতের বাইরে থেকে সেই এক রঙই দেখা যায়। আমরা পরমাণুর মত সৌরজগতের মধ্যে আছি বলেই সাত রঙ সাত রঙের স্তরের পাশ থেকে দেখতে পাই। সৌরজগতের বাইরে থাকলে চারদিকের আলোয় ঢাকা বলে পাশ দিয়ে সাত রঙ দেখা সম্ভব নয়। সাত সময় পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের আচরণেরও সময় কত রকম। কোন কিছুতে ঠকে গেলে আমরা বলি, এখন থেকে সাবধানে চলব। পরে দেখা গেল নিজে আবার ঠকে গেলাম। সেই সাবধানতার সময় নিজের অসাবধানতা হরণ করে নেয়। সময় এমনি ভাবে মানুষকে রাজা করে আবার ফকির করে।

মুদ্রিত চোখ খুললে নানা রঙের বস্তুগুলোকে দেখা যায়। অন্ধকার গিয়ে দাঁড়ায় তাদের পেছনে সামনে সর্বত্র। তাই আলোর আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালে অন্ধকারকে দেখা যায় না। দেখা যায় তার আশপাশের অন্ধকারকে। প্রখর আলোর আড়ালে দাঁড়ালেও ছোট আলোকে দেখা যায় না। আলোর গতিশক্তি চেখের দৃষ্টিকে চেপে রাখে। অথচ আলোর অনুসরণে বস্তু দেখা যায়। বস্তুতে আলো প্রতিফলিত হলেও বড় আলোতে ছোট আলো প্রতিফলিত হয় না। অকর্ষিত হয়। এখানে মাৎস্যান্যায়ের মত বড় ছোটকে খেয়ে ফেলে। এই নিয়মেই তো সূর্য পৃথিবীকে নিজের জগতে ধরে রেখেছে। কোন কিছু আকর্ষণের জন্য পার্থক্য থাকতেই হবে। আলোর সঙ্গে আলোর পার্থক্য না থাকলেও ছোট বড়র পার্থক্য আছে। আবার লোহার সঙ্গে চুম্বকের পার্থক্য থাকলেও ছোট বড়র নাই। কিন্তু পার্থক্য ঠিকই আছে।

অন্ধকার বস্তুকে আড়াল করে রাখে তার প্রতিফলন নাই বলে। কোন পর্দা টাঙিয়েও বস্তুকে আড়াল করা যায়। সেক্ষেত্রে পর্দা চোখের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দেয়। দুই ক্ষেত্রেই বস্তু আড়াল হচ্ছে। দেখার মূল নিয়ম একই। দুটি ক্ষেত্রেই বস্তুর সঙ্গে চোখের যোগাযোগ হচ্ছে না। প্রতিফলন চোখের দৃষ্টিকে

ফিরিয়ে দেয়, অন্ধকার চোখের দৃষ্টিকে বেঁধে রাখে। বড় আলো চোখের দৃষ্টিকে আড়াল করে বলে ছোট আলোকে দেখা যায় না। বস্তুতে আলো প্রতিফলিত হয়ে বড় আলোর সঙ্গে সংযুক্ত দৃষ্টিতে আঘাত করে বলে আলোকিত বস্তু দেখতে পাই। আলোর অল্প প্রতিফলনে জল দেখতে পাই, বেশি প্রতিফলনে জল দেখতে পাই না, চোখ ধেঁধে যায়। আবার অন্ধকারেও জল দেখতে পাই না। দুয়ের মাঝামাঝি আলোতে আমরা দেখতে পাই।

আলোর সঙ্গে অন্ধকারের পার্থক্যের জন্য আমরা দেখার যোগাযোগ পাই। দেখাতে শুধু আলো নয় অন্ধকারের ভূমিকা আছে। চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর সঙ্গে উত্তর মেরুর পার্থক্যের জন্য আকর্ষণের যোগাযোগ পাই। এমনি পার্থক্যের জন্য নরনারীর প্রেমের যোগাযোগ পাই। এককে সম্ভব হতে দুয়ের প্রয়োজন আছে। তাই বলে কি পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বন্ধুত্ব পাব না? পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বন্ধুত্ব হয়, সম পর্যায়ের ফলে সম চাহিদার জন্য। দুজন মস্তপ্রেমী লোকের দুজনের মধ্যে ছাড়া প্রেমিক লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব দানা বাঁধবে না। নারীর সঙ্গে নারীর প্রেমও চাহিদার সমতার জন্য। বৃষ্টির জল ঢালুর দিকে সমুদ্রে গিয়ে মেশে। তার মানে এই নয় যে বৃষ্টির জল সমুদ্রের জলকে নারী পুরুষের ভালবাসার মত ভালবাসে। সব জল ঢালুর দিকে যায় বলেই তারা ঢালুতে গিয়ে মেশে। তা ছাড়াও তাদের জন্ম একই ভাবে বলেই চরিত্র একই ভাবের। কোথাও হয়তো দেখা গেল দুই জোড়া প্রেমিক প্রেমিকা চিড়িয়াখানায় বাঘ দেখছে। বাঘ তাদের একত্রিত করার কারণ। সেখানে যদি এক প্রেমিক অপর জোড়ার প্রেমিকার সঙ্গে ভাব জমায়, সেই অপর জোড়ার পুরুষ তাকে শাসাবে। নরনারীর প্রেমের মধ্যে বাঘের মত কোন দর্শনীয় বস্তুর দরকার হয় না। কারণ পরস্পরের জৈবিক অভাব পরস্পরে মেটাতে পারে। একটা বাঘকে দেখার আনন্দ নারী পুরুষ সবাইকে এক করতে পারে, কিন্তু একটা মেয়েকে ভালবাসার আনন্দ দুই পুরুষকে এক করতে পারে না। কারণ দুই পুরুষের চাহিদা সে সম্পূর্ণ মেটাতে পারে না। অতএব পুরুষের চাহিদায় টান পড়ে।

এইভাবে নিশ্বাস পূর্ণ হলেই প্রশ্বাস পূর্ণ হতে হবে। দুয়ের একটা অর্ধেক হলে অপরটার অর্ধেক হতেই হবে। নইলে সৃষ্টি ভেঙ্গে পড়বে। কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ এই ভাবেই চলে। কেন্দ্রবাদকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। চাঁদ পৃথিবীর কেন্দ্রের আকর্ষণে বাঁধা আছে, পৃথিবী সূর্যের কেন্দ্রের আকর্ষণে বাঁধা আছে। সূর্য তবে আরও বড় কোন সূর্যের কেন্দ্রের আকর্ষণে বাঁধা আছে।

সেই বৃহৎ কেন্দ্র না থাকলেও সজ্ঘবদ্ধ সূর্যদের কেন্দ্রের সমন্বয়ে যে কেন্দ্র হয়েছে সেই বড় সূর্যের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে একটা মহাসূর্য থাকলেও চলে, না থাকলেও চলে। একটা শক্তিশালী লোক যে কাজটা পারে, সে কাজটা একটা দুর্বল লোক পারে না। কিন্তু সজ্ঘবদ্ধ দুর্বল লোক সেই শক্তিশালী লোকের কাজটা করতে পারে। এমনি ভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত পরমাণু আছে তারা সজ্ঘবদ্ধভাবে সূর্যের কাজ চালাতে পারে। পরমাণুর চেয়ে ছোট ভাবপারের বস্তুও পরমাণুর পথে সূর্যের কাজ চালাতে পারে। তাই এই ভাব পারের আকাশ আলো প্রত্যেকের বস্তুময় সূর্য হতে পারে। তারা না থাকলে সূর্য সৃষ্টি হত না, সূর্য না থাকলে আবার তাদেরও সৃষ্টি হত না। তবে তাদের মধ্যে বড় কে? উত্তরে বলা যায় কেন্দ্র। কারণ সব কিছুর মধ্যে কেন্দ্র প্রভুত্ব চালিয়ে যাচ্ছে।

কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণের মূলে শূন্যতা ও পূর্ণতা কাজ করছে। মৃত সূর্যের কেন্দ্রে বস্তু জমা হয়ে পূর্ণ নিরেট হতে হয়েছে। যে বস্তুর এখানে আসতে হয়েছে, তাদের আসার ফলে সে স্থান শূন্য হতে হয়েছে। সেই শূন্যতার আকর্ষণে আবার সে স্থান পূর্ণ হতে হচ্ছে। সেই পূর্ণতা গড়তে মৃত নিরেট সূর্যকেও ভেঙ্গে আসতে হবে একদিন। কেন্দ্রভিত্তিক শূন্যতা পূর্ণতা কাউকে স্থির থাকতে দেয় না।

যোগ

তাড়িত কথার অর্থ তাড়িত করা অথবা বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয়। মানসিক তাড়নার দ্বারা (Mental Electricity) মানুষ মানুষকে বশীভূত করতে পারে। এই মানসিক তাড়নায় প্রেম সৃষ্টি হয়। এই প্রেম শুধু মানুষের নয় জীব জগতের সবার মধ্যে আছে। এই প্রেমকে চালিত করে দৃষ্টি শক্তি এবং ইচ্ছা শক্তি। তখনই একজন অপর জনের উপর Will Force প্রয়োগ করতে পারে। যাদুকররা এই দৃষ্টি শক্তি বাড়ায় কোন কিছুর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে। সেদিকে মন তাড়িত হওয়ার ফলে ইচ্ছাশক্তিও তাড়িত হয়। এইভাবে অভ্যাস করলে যে কোন একটা মেয়েকে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বশীভূত ও অজ্ঞান করে দিয়ে শূন্যে ভাসিয়ে দেওয়া যায়। তবে এর সঙ্গে পাশ দেওয়াও শিখতে হবে। এই পাশ দেওয়া হল শরীরের তড়িৎ শক্তিকে কল্পনা দ্বারা আঙুলের মধ্যদিয়ে চালনা করা। কোন মেয়েকে পাশ দিতে হলে, তাকে একটা নির্জন ঘরে শুইয়ে দিয়ে তার চোখে চোখ রাখতে হবে একই ভাবে। ক্রমে দেখা যাবে তার চোখদুটি জলে ভিজে গিয়েছে এবং ঠোঁটদুটি কাঁপছে। তারপর তার কাছে গিয়ে সুগন্ধি রুমাল দ্বারা

চোখ মুছে দিয়ে স্বস্নেহে বলতে হবে, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও, আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি। তারপর এই মোহাচ্ছন্না নারীকে পাশ দিতে হবে। অর্থাৎ কল্পনা তাড়িত শক্তিকে আঙুলের পথে তার শরীরের এক ইঞ্চি উপর দিয়ে সঞ্চারিত করতে হবে। এমনি ভাবে মনে কোনকিছু চিন্তা করতে থাকলে সমস্ত ইন্দ্রিয় মনমুখী হয়ে ওঠে। তারপর মন তাদের যেদিকে তাড়িত করবে, সেই দিকে যায়। মনমুখিতাই আকর্ষণ আর কোন দিকে তাড়িত করাই বিকর্ষণ। এই মনকে বলা যায় এক ধরণের অনুঘটক। ইন্দ্রিয়গুলোকে আকর্ষণ করে লক্ষ্যের সঙ্গে সংযোগ ঘটায়। আবার ঘটনাও অনুঘটক হিসাবে মন আর ইন্দ্রিয়দের এক করে দেয়।

হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন মিলে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় মন্থর গতিতে। এই বিক্রিয়া লৌহ কণিকার উপস্থিতিতে হলে লোহায় আকৃষ্ট হয়ে দ্রুত অ্যামোনিয়া তৈরি হয়। পরে লোহা বাহক হলেও লোহাই থাকে। পটাশিয়াম ক্লোরেটের সংস্পর্শে অণুঘটন হিসাবে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড এসে অক্সিজেন সৃষ্টি করে। আগুন জ্বালাতে আবার এই অক্সিজেনই একটা অনুঘটক। যে কোন বস্তু নিজের নিজের কেন্দ্রভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। এই স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে দুই বস্তুর মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে অন্য বস্তু সৃষ্টি করে। রক্তের ভেতরে কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে কার্বনিক অ্যাসিডে পরিণত হওয়ার বিক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ নামক উৎসেচক বা enzyme। অবশ্য সোডা ওয়াটারে কার্বন--ডাইঅক্সাইড গ্যাস জলের সঙ্গে মিশে শ্লথ গতিতে কার্বনিক-অ্যাসিড তৈরি করতে পারে। সমস্ত আবিষ্কৃত উৎসেচকই প্রোটিন জাতীয়। উৎসেচকের কার্যকারিতা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে রাসায়নিক পরিবেশের তাপাঙ্ক এবং অম্লতা বা অ্যাসিডিটির সামান্য পরিবর্তনের উপর। আবার সহউৎসেচক বা Co-enzyme আছে, যা দুটি উৎসেচকের মধ্যে সেতু রচনা করে। অনেক ভিটামিন সহউৎসেচক প্রস্তুতির কাজে সাহায্য করে। আকাশে গ্রহ-উপগ্রহরা ঘোরার সুযোগ পায় বলে সহউৎসেচকের তেমন দরকার হয় না। শরীরের মধ্যে দরকার হয় স্থিতির জন্য।

রাসায়নিক যৌগ অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ অম্ল। এর জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাসের রঙকে লাল করে। অ্যাসিডের অণুতে ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। তাই তার সংস্পর্শে বহু বস্তু ক্ষয়প্রাপ্ত (করোডেড) হয়। এই অ্যাসিডের সঙ্গে ক্ষারের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় লবণ আর জল উৎপন্ন হয়।

রাসায়নিক যৌগ ক্ষারের জলীয় দ্রবণ কষা। এই জলীয় দ্রবণ লাল লিটমাসের রঙকে নীল করে। ক্ষার সাধারণত ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড, অ্যামোনিয়া,

নানা প্রকার জৈব অ্যামিন ইত্যাদি। খনিজ অ্যাসিডের সঙ্গে কিছুকিছু ধাতুর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এর কারণ অ্যাসিড প্রোটন ত্যাগ করায় ধাতুর চাপ হাল্কা হয়ে যায়। ক্ষার প্রোটন ত্যাগ করে না। সে প্রোটনের সঙ্গে যুক্ত হয়। অ্যাসিডের প্রোটন বেরিয়ে গেলে ক্ষার ধর্মী হয়। লুইস এই ধারণার পবির্তন করে বলেন, বহু অ্যাসিড ধর্মী পদার্থের অণুর প্রোটন নাই। তাঁর মতে ইলেকট্রন গ্রহণকারী অণু বা মূলক অ্যাসিড এবং ইলেকট্রন বর্জনকারী অণু বা মূলক ক্ষার। প্রোটনহীন বোরন ট্রাইফ্লোরাইড অ্যাসিড, যে হেতু তার অ্যামোনিয়া কর্তৃক ত্যক্ত ইলেকট্রন গ্রহণ করে। এবং অ্যামোনিয়া ক্ষারও। তবে একথা মানতে হবে বোরণ ট্রাইফ্লোরাইডের প্রোটন না থাকলেও কেন্দ্র আছে। অ্যাসিডের তেজস্ক্রিয়তার জন্য অথবা চাপে প্রোটন ফেটে কেন্দ্র হয়েছে। তবে কম তেজস্ক্রিয়তার জন্য ক্ষারের প্রোটন বজায় থাকে। এবং সে ইলেকট্রন বিকর্ষণ করতে পারে।

অ্যাসিড ও ক্ষারের মধ্যে যেমন যোগাযোগ ঘটে, তেমনি ভাবে অ্যামাইনো অ্যাসিডের অণুর মধ্যের এক দিকের অ্যাসিড ও অন্য দিকের অ্যামিন মূলকের মধ্যে যোগাযোগ ঘটে। একটা অ্যামিন ও একটা অ্যাসিড মূলক বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিক্রিয়া করে পেপটাইড বন্ধনের জন্ম দেয়। এইভাবে মিলন হতে হতে একটা বড় শৃঙ্খল সৃষ্টি হয়, যার ভেতরে থাকে অনেক পেপটাইড বন্ধন এবং এক প্রান্তে অ্যাসিড ও অন্য প্রান্তে অ্যামিন মূলক। এই অণুকে বলে পলিপেপটাইড। এমনি পলিপেপটাইড তৈরি করে এক জতীয় কোষ, জীব জগতের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। কিন্তু একাজ গবেষণাগারে শৃঙ্খলার সঙ্গে করা খুব কঠিন। সেই কাজটি করেছেন মেরিফিল্ড। তাতে নানারকম জৈব ও অজৈব বা বায়োকেমিক্যাল ক্ষেত্রেও অনেকা কাজ হবে। এই জন্য ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মেরিফিল্ড নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

এমনি ভাবে সবকিছুর মধ্যে যোগাযোগ চলেছে। অ্যামিনো অ্যাসিড প্রয়োজনে কার্বক্সিল মূল প্রোটন ত্যাগ করে এবং অ্যামিনোমূলক প্রোটন গ্রহণ করে। একই অণুর অ্যাসিডমূলক এবং ক্ষারমূলক নিজেদের মধ্যে প্রোটন বিনিময় করে লবণ গঠন করে। এমনি ভাবে জগতের সব কিছুর মধ্যে মিশ্রণ চলেছে। ফলে প্রাথমিক পদার্থ বলে কিছু থাকছে না, মৌলিক পদার্থও থাকছে না। একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্যই এর জন্য দায়ী। আমাদের দেহে যদি বিশেষ কোন অ্যান্টিজেন (যার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়) প্রবেশ করানো যায় তবে ঐ অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে একই রকমের প্রচুর অ্যান্টিবডি হয়।

বর্তমান তাত্ত্বিকরা বলেছেন, মৌলকণাগুলি ছয় রকমের লেপটন, ছয় রকমের কোয়ার্ক আর ফোটন, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক W কণা, আধানশূন্য Z কণা ও আট রকমের গ্লুয়ন দ্বারা সৃষ্ট। দুর্বল মিথস্ক্রিয়ার (বাবল) ক্ষেত্র কণা W এবং Z কণা আবিষ্কারের জন্য ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইটালির কার্লো রুব্বিয়া ও হল্যাণ্ডের ভারমিরকে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তাদের পরীক্ষায় জানা যায় ইলেকট্রন ভোল্ট হল শক্তি মাপার এক একক। একটা ইলেকট্রন বা প্রোটন এক ভোল্ট বিভব প্রভেদের মধ্য দিয়ে গেলে যে শক্তি পাওয়া যায় সেটাই হল এক ইলেকট্রন ভোল্ট। আর প্রতি প্রোটন হল প্রোটনের মত এক কণা, যার আধান ঋণাত্মক। সাধারণত কোন কণার সঙ্গে তার প্রতিকণা মিশলে কণা দুটি নিশ্চিহ্ন হয়ে সৃষ্টি করে বিকিরণ। কিন্তু এই শক্তিশালী প্রোটন ও প্রতিপ্রোটন গুচ্ছে সংঘাত ঘটলে মধ্যস্থিত কোয়ার্ক, প্রতি কোয়ার্ক ইত্যাদি ধাকাধাক্কির সম্মুখীন হয়। তার ফলে সৃষ্টি হয় অজস্র ভারী কণা, প্রতিকণা ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিকরা এর দুটি ক্ষেত্রে টপ কোয়ার্কটির অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। এই আবিষ্কারে জানা গিয়েছে মৌল কণারা যুগ্মভাবে বিরাজ করে। বলা বাহুল্য এই টপ কোয়ার্কের দোসর হল বটম কোয়ার্ক। পৃথিবীর দুই মেরুও পরস্পরের প্রতিমেরু, তারা কেন্দ্রভিত্তিক সব সৃষ্টি করছে। কেন্দ্র সব সৃষ্টির অনুঘটক। আকাশ শরীর নয় বলে আগুন জ্বালতে অনুঘটক হিসাবে অক্সিজেন ছুটে আসে।

কণার সঙ্গে প্রতিকণা থাকায় বৈজ্ঞানিকরা আশা করছেন শীঘ্র একক ক্ষেত্র তত্ত্বে পৌছানো যাবে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কোনদিন কণাগুলো মিলে এক হবে না। এক হলেও আবার ভাঙবে। যে শক্তিতে ভাঙা গড়া হয় তার মূল কেন্দ্রের কথা বলা হচ্ছে না। এই কেন্দ্রের আকর্ষণ বিকর্ষণেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে।

জলের পার্থক্যে জল জলের দিকে যায় না, জল জলের দিকে যায় ঢালু পথের পার্থক্যে। এখানে রসায়ন কাজ করছে না। রাসায়নিক কারণেও অবশ্য এক বস্তু অপর বস্তুর দিকে যায়। তাতে বস্তুর পরিবর্তন হয়। জলকে উনুনে ফোটালে উপর নিচের পার্থক্যের জন্য ওঠা নামা করে। এই ফুটন্ত জলে চাল দিলেও উপর নিচে পাশে মধ্যে সর্বত্র চাল ছড়িয়ে পড়বে সর্বস্থানের কম বেশি তাপের পার্থক্য অনুযায়ী। এই তাপ না থাকলে সমস্ত চাল তলায় পড়বে। কিন্তু তখনও উপর নিচে প্রাকৃতিক পার্থক্য কাজ করে চলে।

বস্তু ভাঙলে অণু পাওয়া যায়, অণু ভাঙলে পরমাণু পাওয়া যায়, আবার পরমাণু ভাঙলে কণা পাওয়া যায়, কণা ভাঙলে ভাব পাওয়া যায়। বস্তু আর ভাব

যখন কেন্দ্রের সৃষ্টি তখন আবার বলতে পারি, ভাবে গড়া যায় কণা, কণাতে গড়া যায় পরমাণু, পরমাণুতে গড়া যায় অণু, অণুতে গড়া যায় বস্তু। বস্তু ভাবাকারে এলে সে বস্তুতে না থেকে আকাশ হতে চায় বিকর্ষণ নীতিতে। জল যেমন নিচের দিকে গিয়ে সাগর সৃষ্টি করে, ভাব তেমনি উপরের দিকে গিয়ে আকাশ সৃষ্টি করে। সিমেন্ট আর জল মিশলে যেমন পাথর হয়ে যায় ভাব আর বস্তু মিশলে তেমনি বিরাট বস্তু হয়ে যায়। সিমেন্টকে মটরদানার আকারে জমালে তাদের আর জল দিয়ে জমানো যায় না। ভাবকে তেমনি ছোট ছোট আকারে জমালে তাদের আর এক খণ্ডে জমানো যায় না। প্রকৃতিতে বস্তুরা ভাবাকারে এসে আবার বস্তু সৃষ্টি করে। ভাবও বস্তু আকারে এসে আবার ভাব সৃষ্টি করে। তাই গাছের ফুল পাপড়ি জুড়ে জুড়ে সৃষ্টি হয় না, ভাবাকার শক্তিতে চালিত হয়ে এসে ফুল সৃষ্টি করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে সৃষ্টির স্রোত এইভাবে সর্বত্র চলছে।

নিচের থেকে উত্তাপ দিলে জল গরম হয়। তখন সে যা ত্যাগ করে তা গরম। সে যা স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করবে তা ঠাণ্ডা। প্রকৃতিতে আমরা বুঝতে না পারলেও কোন বস্তু যা ত্যাগ করবে তা তার চেয়ে গরম, যা সে গ্রহণ করবে তা ঠাণ্ডা। বেশি গরম বস্তু আপেক্ষিক কম গরম হলেও গ্রহণ করবে। বেশি ঠাণ্ডা বস্তু আপেক্ষিক কম ঠাণ্ডা হলেও গ্রহণ করবে। কোন কিছু গরম হতে থাকলে ঠাণ্ডা তার প্রতি গুণ আবার কোন কিছু ঠাণ্ডা হতে থাকলে গরম তার প্রতিগুণ। পৃথিবীর সব বস্তু এমনি কোন না কোন আপেক্ষিকতায় সৃষ্টি হচ্ছে এবং সৃষ্টি করছে। জলের মধ্যেও এমনি সব সময় গ্রহণ বর্জনের আকর্ষণ বিকর্ষণ চলছে। অণুরা তাই চলা ফেরা করছে। জলে সেই শক্তি প্রতিমুহূর্তে প্রসারিত হচ্ছে আর সংকুচিত হচ্ছে। তা আমরা বুঝতে না পারলেও, সেই জলকে বরফ করলে বোঝা যায়। জলের মধ্যে যে ফাঁক ছিল তা বরফ হওয়ার পর ধরা পড়ে। জল তরল বলে প্রতি মুহূর্তের আকর্ষণ বিকর্ষণে তা ঢাকা পড়তে থাকে।

জলে একটা হাল্কা বস্তু ডুবালে ভেসে ওঠে। তার কারণ বাইরের আসা ধারা তাকে নামাতে পারছে না, কিন্তু ভেতর থেকে ওঠা ধারা তাকে ঠেলতে পারছে। বস্তুটা ভারী হলে সে বাধা অতিক্রম করে ডুবে যেত। তবু যা ডুবতে থাকে, ডোবার সময় ঐ বাধা অতিক্রম করবার সময় তার কিছু ওজন হারাতে হয়। জলের মধ্যে যে এই আন্দোলন চলছে তা অণুর চাঞ্চল্যে টের পাই। রৌদ্রের সময় এই আকর্ষণ বিকর্ষণ সমান থাকে না। উত্তাপে বিকর্ষণ বেশি হওয়ায় বাষ্প হয়ে জল উপরে উঠে যায়। তবে শীতের শুষ্কতার আকর্ষণ জল শোষণ

করে। শীতের আবহাওয়া তাই বরফের মত ফাঁপা। শক্তি চালনার পক্ষে এই আবহাওয়া অনুপযোগী বলে সূর্য তখন কাছে থাকা সত্ত্বেও গরম বেশি হয় না। মাটিও তখন ঠাণ্ডা ধরে রাখতে পারে। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ব্রাউন লক্ষ্য করেছিলেন জলে ফুলের পরাগ বা রেণু স্থির না থেকে বিশৃঙ্খল ও সূক্ষ্ম গতিতে নড়াচড়া করছে। এই নড়াচড়ার কারণ জলের অণুর অস্থিরতা। এই অণুর অস্থিরতার কারণ কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ।

এই রেণুগুলি যত ছোট হবে, তত নড়াচড়া বাড়বে। এই রেণুগুলি যদি বাষ্পের কণার আকারের হত তবে নিশ্চয় রেণুগুলি বাষ্পের সঙ্গে উড়ে যেত। এখানে শুধু জলের অণু কাজ করছে না। বাইরের আসা ধারা কাজ করছে বলে রেণুগুলো অনিয়মিত নড়াচড়া করছে বলে মনে হবে। আসলে তারা নিয়মিত নড়াচড়া করছে।

আলোক শক্তি নিয়মেই চলে। সেই শক্তি যখন সংঘর্ষে আলো ফোটায় তখন তাকে তো অনিয়মিত বলা যায় না। জলের উপরের রেণুগুলো তেমনি নিয়মের ফলে নড়াচড়া করে। বড় শহরে অজস্র গাড়ি চলবার ফলে আকাশে বাতাসে কত পেট্রোল মিশে থাকে; তবু সেই পেট্রোলের মধ্যে ডুবে থেকেও আলাদাভাবে পেট্রোলের গন্ধ পাই না। কিন্তু গ্রামের বিশুদ্ধ আবহাওয়ায় একটা পেট্রোল চালিত গাড়ি চললেই তার গন্ধ পাই। শহরে পেট্রোলের গন্ধের সঙ্গে অন্য গন্ধের পার্থক্য পাই না বলে, পেট্রোলের গন্ধ পাই না। গ্রামে বিশুদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে পেট্রোলের গন্ধ পাই আবহাওয়ার পার্থক্যের জন্য। কোন কিছুর প্রকাশ ঘটে তার সীমানা ও বাইরের পার্থক্যের জন্য। পার্থক্য তার সীমা রচনা করে। জগতের এই গুণের জন্য জল সৃষ্টি হতে পারে। এবং তাই জলকে চিনতে পারি অন্য বস্তুর সঙ্গে তুলনা করে। এই গুণ যদি না থাকত জল মাটি আকাশ আলাদা আলাদা বলে কিছু থাকত না।

একের কৈন্দ্রিক বন্ধনের সঙ্গে অন্যের কৈন্দ্রিক বন্ধনের পার্থক্যে শক্তির প্রকাশ। দুটি কুকুর দুদিক থেকে পরস্পরের দিকে ছুটে এলেই শক্তির প্রকাশ ঘটে না। তারা গোঁ গোঁ করে কাছাকাছি এলেও পরস্পর পরস্পরকে পরীক্ষা করে নেয়। আড় চোখে তারা পরস্পরকে যাচাই করে নেয়। এদের মধ্যে যে নিজেকে শক্তিশালী মনে করে সেই আগে ঝাপিয়ে পড়ে। তখন তার শক্তির হাত থেকে বাঁচবার জন্য দুর্বলটিও তখন শক্তি প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। এই সবল কুকুরের কাছে যদি তার চেয়ে আরও সবল কুকুর এসে হাজির হয় তখন প্রথম সবল কুকুর তার

হাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রথম দুর্বল কুকুরের মত বল প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়। এখানে শক্তির প্রকাশ না ঘটলে শক্তি বলা যায় না। তাই প্রবাহিত বাতাসও একটা শক্তি। আবার যখন সেই প্রবাহিত শক্তি থাকে না, তখন থাকে শুধু পৃথিবীর কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ। এখানে কোন কারণে পরিবর্তন দেখা দিলে ঝড় বাতাস ইত্যাদি শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। এই ঝড় বাতাসও নির্ভর করে অন্যের শক্তির পার্থক্যের উপরে। পার্থক্য না ঘটলে শক্তিরূপী ঝড় বাতাস প্রকাশ পায় না।

পৃথিবীর আকাশের সঙ্গে চাঁদের আকাশের পার্থক্য আছে। তবু উভয়ে উভয়ের পার্থক্য ভাঙছে না। চাঁদের আকাশ পৃথিবীর আকাশে ঢুকতে পারে না বলেই তার শক্তি চাঁদকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করছে। নৌকায় জল উঠতে পারে না বলে যেমন নৌকা ভাসে চাঁদের আকাশেও তেমনি পৃথিবীর আকাশ ঢুকতে পারে না বলে চাঁদ ভাসে। তবু উভয়ের মধ্যে উভয় এমন ভাবাকারের শক্তি প্রবেশ করাচ্ছে যে উভয় উভয়কে আক্রমণ করলেও ভাবাণুর চেয়ে বড় আকারের শক্তি প্রবেশ করাতে পারছে না। এমনি কারণেই পুত্রের চেয়ে পিতা বলশালী হয়েও স্নেহ করে। তাই তাকে মারতে চায় না। সেখানে উভয়ের কৈন্দ্রিক আত্মীয়তা আছে। পৃথিবীর পরে চন্দ্রের নির্ভর করার কারণ সেই কৈন্দ্রিক সমতা। যদি পৃথিবীতে বিস্ফোরণ ঘটে যায় তবে চাঁদের আকাশ ভেদ করে কর্কশ শক্তি প্রবেশ করে চাঁদকে মারবে। কোন বিস্ফোরণে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হলেও টুকরোগুলো গ্রহ উপগ্রহ হয়েছে শূন্যতার ছাঁচের জন্য। এই ছাঁচে গোলাকার ব্রহ্মাণ্ডের গোলাকার চাপ পরমাণুদেরও সৃষ্টি করে।

পার্থক্যের শক্তি মাপা যেতে পারে রকেটের বেগ মেপে। পৃথিবী থেকে চাঁদে পৌঁছাতে হলে রকেটের বেগ হওয়া দরকার ১১·২ কিঃ মিঃ / সেকেণ্ড এবং সৌরজগৎ থেকে বেরিয়ে যেতে হলে বেগ দরকার ১৬·৪ কিঃ মিঃ / সেকেণ্ড। পৃথিবীর স্বাভাবিক আবর্তনের গতি হল ৩০ কিঃ মিঃ / সেকেণ্ড। এই গতি যদি হঠাৎ বেড়ে ৪২ কিঃ মিঃ / সেকেণ্ড হয়ে যায় তবে সেই রকেট অধিবৃত্তাকার পথে (Parabola) সৌরজগৎ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। তেমনি কঠিন বস্তুকে উত্তপ্ত করলে কণিকারা তাপ অনুযায়ী ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইবে। যখন সব কণিকারা উত্তপ্ত হয়ে উঠবে পরস্পরের চাপ শিথিল হয়ে যাবে। বস্তুটিও প্রসারিত হয়ে ফেঁপে উঠবে। এমনি ভাবে বস্তু বেশ কিছু সময় ধরে তাপ নিতে থাকলেও কাঠিন্য বজায় থাকে। তারপর আরও উত্তপ্ত হলে বস্তুটি তরল

অবস্থায় আসতে থাকবে। উত্তপ্ত করতে থাকলে সেই তরল অবস্থা কিছু সময় বজায় থাকে। এই সীমার পার্থক্যই একটা বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর পার্থক্য। একই ভাবে জগতেও আমাদের বাঁচা বাড়ার একটা সময় আছে। এই সময় বাড়তে বাড়তে আমাদের মৃত্যুর সীমায় পাঠিয়ে দেয়। অর্থাৎ রূপান্তর ঘটে।

এমনিভাবে পৃথিবীর সমগ্রভাবে পরিবর্তন হলেও তার নানা বস্তু নানা উপাদানে গঠিত থাকে। একটা বস্তু থেকে আর একটা বস্তুতে যেতে হলে তাই বস্তুর পার্থক্যের বাধা আছে। যেমন পৃথিবী থেকে চাঁদে যেতে কি শক্তি দরকার বলা হল। একটা বস্তুর শক্তির সঙ্গে আর একটা বস্তুর শক্তির পার্থক্য আমাদের হিসাবে আসে না বলে জানতে পারি না। পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদের পার্থক্যজনিত যতকিছু সৃষ্টি হয়েছে সব দুয়ের আকাশে বিরাজ করছে। একটা বাঘিনী শাবক নিয়ে যখন শুয়ে থাকে সে নিবিড় সুখে শুয়ে থাকে। সেই শাবকটি যখন খেলতে খেলতে যত দূরত্বে যেতে থাকে বাঘিনীর উৎকণ্ঠা তখন তত দূরত্বের আকাশে বাস করতে থাকে। যদি শাবকটি চোখের আড়াল হয়ে যায়, তখন আর উৎকণ্ঠার শেষ থাকে না। তখন সে শাবক থেকে তার দূরত্ব কমাতে এগিয়ে যায়। সে সময় সে বাধার বিরুদ্ধে হিংস্র হয়ে ওঠে। পরমাণু থেকে ইলেকট্রন সরে গেলে তেমনি পরমাণুর সেই অবস্থা হয়। পৃথিবীর সম্পর্ক ছেড়ে চাঁদ সরে গেলেও পৃথিবী তেমনি ভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠবে।

এমনি নানা কারণে বস্তু হোক আর জীব হোক চাঞ্চল্যের মধ্যে বাস করে। এই চাঞ্চল্যের জন্য যেমন জীবনের প্রকাশ তেমনি ভবিষ্যতে মৃত্যুর পথেরও প্রকাশ। এই মৃত্যুর দিকে এগুতে আরও কত অবস্থা পার হয়ে যেতে হয়। পৃথিবীও জীবনের পথে যেতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর পথে জরাজীর্ণ হয়ে ফেঁপে উঠছে। আজকের পৃথিবীর জল বাষ্প হয়ে বৃষ্টি ঝরাচ্ছে। যখন এই পৃথিবী বুধ অথবা শুক্রের স্থানে ছিল তখন অ্যাসিড আর আগুন ঝরাত। পৃথিবীর স্তরে যখন শুক্র আসবে পৃথিবী সরে যাবে তখন মঙ্গলের স্তরে। শুক্রে তখন জল দেখা যাবে।

উত্তাপ বস্তুর কণাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছড়িয়ে দেয়। বাঘিনী থেকে তার বাচ্চাকে সরিয়ে আনলেও একটা উত্তাপের সৃষ্টি হয়। পরমাণুকে উত্তপ্ত না করে কোন রকমে ইলেকট্রনকে সরিয়ে আনলেও উত্তাপের শক্তি প্রকাশ পায়। আকাশও একটা ছড়ানো রূপ। সেখানেও উত্তাপ থাকতে বাধ্য। ভাবপারের উত্তাপ বলে আমরা বুঝতে পারি না। ভাব গঠিত পরমাণু হলে বুঝতে পারি। পরমাণু আর সৌরজগতের চরিত্র বুঝলে আকাশের ভাবের

চলাচল ব্যাখ্যা করতে পারব। নক্ষত্রের মৃত্যুতে পরমাণুর যখন মৃত্যু ঘটে তখন পরমাণু সনাতন নয়। তার কেন্দ্রভিত্তিক জন্ম মৃত্যু সনাতন। পরিবেশে চলার গুণে সে পরমাণুত্ব পায়। আকাশের শক্তি শূন্যতায় চললেও বস্তুতে ধরা দিবেই কারণ বস্তুও ছড়িয়ে আছে। মৃত নিরেট সূর্যও সেই শক্তির মধ্যে একদিন চূর্ণ হয়ে যাবে। সেই গুণে আছে স্পন্দনের ছন্দ। পথের বাধা এবং সেই বাধা অতিক্রম করে চলা ছন্দ সৃষ্টি করে। গতিতত্ত্বে বলা হয়েছে, অণুসমূহের এলোমেলো বিচলন ও পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকিতে তাপের উৎপত্তি। সেখানেও ছন্দ কাজ করছে। তাপ বিস্তার (Thermo dynamics) তত্ত্বগুলো সমষ্টিগত আচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোন এক বা বিশেষ অণুর (Individual molecule) ক্ষেত্রে তা চিন্তা করা যায় না।

মাত্র কয়েকবার টস করলে বেশি হেড পড়তে পারে অথবা বেশি টেইল পড়তে পাড়ে। কিন্তু হাজার বার টস করলে ধরে নিতে হবে পাঁচ শো বার হেড এবং পাঁচ শো বার টেইল পড়বে। তাহলে একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। কিন্তু সৃষ্টিতে ঠিক সামঞ্জস্য থাকে না। সামঞ্জস্যে ব্যাল্যান্স আসে। একদিকে ঝোক রাখতেই হবে নইলে পথ চলা যায় না। দুই পা এগিয়ে দুই পা পিছালে পথ চলা যায় না। বস্তুর ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটতে পারে না। চলা রাখতে হলে হাজার একবার টস করতে পারলে সমানভাবে হেড ও টেইল পড়বে না। কম বেশি হবে। তবে সামঞ্জস্য থাকবে চলার ছন্দে, সেখানে ছন্দ পতন হলে রোগ হয়েছে ধরে নিতে হবে। যে বস্তুর পরিবর্তন চলবে যে বস্তুতে গিয়ে, সে বস্তুতে আর পৌঁছাতে পারবে না। এই চলার সামঞ্জস্য রাখবার জন্য ঘুরে আসবে। সেখানেই সামঞ্জস্য। গ্রহ উপগ্রহরা ঘুরছে। এটা নিয়মের সামঞ্জস্য। এই কেন্দ্রভিত্তিক ঘূর্ণনের সঙ্গে সৃষ্টির সামঞ্জস্য হবে।

পৃথিবীর আকাশ ও চাঁদের আকাশ দুই হয়েছে বলে তাকে অতিক্রম করতে শক্তিশালী রকেট প্রয়োজন হয়। কারণ, রকেটের শরীরটাকে চালাতে উপযুক্ত শক্তির প্রয়োজন। তাই স্বাভাবিক ভাবে উভয়ের পার্থক্য বজায় আছে। আবার ভাব পারের কণিকা সেই বাধা অতিক্রম করছে শরীরের সমস্যা না থাকার জন্য। ক্ষুদ্রতার শক্তি সৃষ্টি করছে পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যের আবহাওয়া। সেই আবহাওয়া ভাব পারের কণিকাকে গিলে নিচ্ছে। সে জমা হয়ে বস্তু গড়ছে বলে শক্তি বলতে পারছি না। এই জড়তার মধ্যে একটা বস্তু তৈরি হলে তাকে পথ পার করতে আবার শক্তির প্রয়োজন হবে। এই শক্তি আবার বস্তুকে চলার শক্তিতে রূপান্তরিত

করে আকাশ গড়ে। এমনি ভাবে চলার সামঞ্জস্য রাখতে হবে চলার জন্য।

সামঞ্জস্যপূর্ণ চলাই বলে দিতে পারে সে কোথা থেকে আসছে এবং কোথায় যাচ্ছে। চেনা ছন্দ যদি ঠিক থাকে তবে বলে দেওয়া যায় সে অমুক কাজ করতে অমুক স্থানে যাচ্ছে। একটা লোকের বেড়াতে বেরুলে যে চলার গতি হবে, জরুরী কাজে বেরুলে সে গতি অনেক বেড়ে যাবে। তাই চলাই বলে দিতে পারে সে কোথায় যাচ্ছে। সেই কোথায় যাওয়ার শক্তি অনুযায়ী তার শরীরের গতি হয়। পৃথিবীর আকাশের সীমা পার হতে তাই কণিকা অনুযায়ী গতি হয়। কণিকাদের কোনটা ফিরে আসে নিজের শরীরের অনুযায়ী পথ না পেয়ে। এই যাওয়া আর না যাওয়ার মধ্যে একটা ছন্দ আছে। এই কারণে পরমাণুর সব ইলেকট্রন আলো দেয় না। যে ইলেকট্রন আলো না দিয়ে ফিরে আসে, সে আলো না দিলেও পরমাণুর কেন্দ্রে আলো দেওয়ার কারণ হয়। বস্তু উত্তপ্ত হয়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে শক্তি বিকর্ষণ করতে পারে না। তার জন্য আকর্ষণে কিছু সঞ্চয় করে নিতে হয়। যেমন অর্থ সঞ্চয় না করলে খরচ করার উপায় থাকে না। উত্তপ্ত বস্তু যে উত্তাপ ছাড়ে, তার জন্য তাকে পূরণ হতে হয়। সেই পূরণের চাপে কিছু ইলেকট্রন আলো না দিয়ে ফিরে এসে প্রমাণ করে যে, বাইরের চাপে তাকে ফিরতে হয়েছে কেন্দ্রকে উস্কে দেওয়ার জন্য।

সেই আকর্ষণ বিকর্ষণের বড় রূপ হল ঘূর্ণী। নদীর স্রোত বেঁধে রেখে ছোট পথে জল চালিত করলে সেখানে একটা ঘূর্ণীর সৃষ্টি হয়। সেখানে যে চাপে জল আসছে, সেই সমস্ত চাপের জল বেরুতে না পেরে ইলেকট্রনের মত ফিরে আসছে। ফিরে আসছে বলেই চাপটা প্রবল থাকছে। সব জল সহজে বেরিয়ে গেলে শক্তি সৃষ্টি হত না, ঘূর্ণীও সৃষ্টি হত না। প্রকৃতিতে এমনি ঘূর্ণী না থাকলে গ্রহ উপগ্রহদের সৃষ্টি হত না এবং তাদের সৃষ্টিও হত না। পরমাণুরও সৃষ্টি হত না এবং তার ইলেকট্রনের ঘূর্ণন থাকত না। এমনি সঞ্চয় ও খরচ অর্থাৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ না থাকলে জগৎ চালিত হতে পারত না। পৃথিবী বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ হারালে চলার চেয়ে ঘুরত বেশি। তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও নিজের ব্যক্তিগত জীবন যেমন আছে গোপনভাবে, সেই গোপনতা খরচ করে সামাজিক জীবনে চলাফেরা করে সে। এই প্রকৃতির মধ্যে তার সৃষ্টি বলে তার যেমন লজ্জা আছে, তেমনি প্রকাশ আছে। এই প্রকাশ কমলে সে ঘরে বসে নানা চিন্তায় সে চলে নিজে ঘুরপাক খাবে।

বস্তুর সঞ্চয়ে পরমাণু থাকে। বস্তুর প্রকাশ আলোতে সেই পরমাণু নাই।

শূন্যে তাই পরমাণু নাই। পরমাণু থাকলেও ভেসে থাকে। বস্তুর প্রলয়ে আকাশের জন্ম হলেও আকাশের অঙ্গ হিসাবে থাকে না। অর্থাৎ স্থিতিতে পরমাণু আছে, চলাতে পরমাণু নাই। তবু বস্তুতে হোক আর আকাশে হোক চলার ঘূর্ণনে পরমাণুর সৃষ্টি। বিরাট জলধারাকে সংকীর্ণ পথে চালনার ফলস্বরূপ ঘূর্ণীতে বস্তু এসে ধরা পড়ে ঘুরতে থাকে। আর তলা দিয়ে জল বেরিয়ে যেতে থাকে। সেখান এই ঘূর্ণায়মান বস্তু থাকে না। মোট কথা পরমাণুযুক্ত বস্তুথেকে যা বেরিয়ে আসে, তা পরমাণুহীন শক্তি। আকর্ষণে পরমাণুতে সেই শক্তি স্থান নিয়ে হয় পরমাণুযুক্ত বস্তু।

কেন্দ্রের নিজের জমা দেহকে পূরণ করে আকর্ষণে, তার নিজের অপ্রয়োজনীয় ত্যাগ করে বিকর্ষণে। এই বিকর্ষণের বস্তু অন্য কেন্দ্র গ্রহণ করে নিজের দেহকে পুষ্ট করতে, সেও তেমনি অপ্রয়োজনীয় বিকর্ষণ করে। এমনিভাবে জগতের সবার সঙ্গে সবার সম্বন্ধ রয়েছে। বিকর্ষণের অভাবজনিত শুষ্কতা শরীরকে ঠাণ্ডা করে। কারণ তার জন্য শরীরের উত্তাপও চলে যাচ্ছে। তাই জলের শুষ্কতায় জল জমে বরফ হয়। সেই কারণে বরফের মধ্যে ফাঁকা থাকে। ঠাণ্ডার বিপরীত উত্তাপ গ্রহণের পূর্ণতায় আবার সে বরফ গলে জল হয়। যেমন শুষ্ক কঠিন পদার্থ হয়। কণিকাদের মধ্যে যত দূরত্ব বাড়বে তত শীতলতা সৃষ্টি হবে আর শূন্যতা বাড়বে। শূন্যস্থান তাই ঠাণ্ডা। গ্যাসে শূন্যতা সৃষ্টি করতে উত্তাপের প্রয়োজন হয় বলেই উত্তাপ অনুভূত হয়। কিন্তু বাষ্প ঠাণ্ডা না হলেও শীতলতা সৃষ্টির জন্য সে উত্তাপ ছাড়ে। কারণ সে ফাঁপা বস্তু বলেই শূন্যতায় শীতলতা জন্ম নেয়। উত্তাপ ছাড়লে আবার জলে পরিণত হয়। ভেতরের ফাঁক আবার মরে যায়।

জল তাই না গরম, না ঠাণ্ডা, না শুষ্ক, না পূর্ণ। তাই পুরুষ প্রকৃতি যেন এক হয়ে আছে। তাই সৃষ্টি আর শেষ হয় না। সেখানে চলেছে চলা আর চলা। সে চলা কোনদিন শেষ হবে না। রিলে রেসে এক চলা শেষ হয়ে গেলে তার অবশিষ্ট নিয়ে আর এক চলা আরম্ভ হয়ে যায়। মসৃণ পথে তেল গড়িয়ে যায় গোলাকার ধারণ করে। পরমাণুর ইলেকট্রনও তেমনি চলে মসৃণ পথে ঢালুর দিকে। সবাই ঢালুর দিকে চলেছে। যে হাইড্রোজেন বেলুন উপরে উঠছে আমরা দেখি, সেই উপরে ওঠা কিন্তু সত্য নয়। আবহাওয়া তাকে গিলে নিচ্ছে লঘুতার ঢালুতে, যেমন ঢালু পথ তেলকে গ্রাস করতে থাকে মাধ্যাকর্ষণের জন্য। এইভাবে গড়িয়ে যাওয়ার জন্য পরমাণুর সৃষ্টি হয়েছে। পরমাণুতে সৃষ্ট গ্রহরাও সূর্যের চারদিকে তেমনি গড়িয়ে চলেছে। গ্রহের বস্তু এক ধরনের কেন্দ্রের বস্তু বলে গ্রহের আকর্ষণে গ্রহের পরে গড়ায় না। ঢালুর দিকে অর্থাৎ বিরাট কেন্দ্রের টানে

গড়ায়। এমনি ভাবে গড়ালে সেও ভেঙ্গে মসৃণ হয়ে গোলাকার বস্তু হয়ে যেতে থাকে। গ্রহ উপগ্রহরা যে ঘুরছে, সেই ঘুরন্ত অবস্থায় আরও ধারা তাতে প্রবেশ করছে। সেই ধারাকেও ঘুরতে হচ্ছে সেই গ্রহ উপগ্রহের শরীরের মধ্যে এসে।

বস্তু ছাড়া পরমাণু হয় না, আকাশ ছাড়া ভাব হয় না। উভয়ের মধ্যে তাই চুম্বকের উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুর আকর্ষণের সম্বন্ধ। এক পাশের জল অন্য পাশে যেতে থাকবে যতক্ষণ না দুই পাশের জল সম উচ্চতায় না আসবে। কিন্তু বিরাট জলধারা নিচের দিকের ক্ষুদ্র পথ ধরে বেরুতে থাকলে ঘূর্ণনের আকর্ষণ সৃষ্টি হবেই। সেই আকর্ষণে মূল জল ছাড়া ভাসন্ত আর সব কিছুকে আকর্ষণ করে টেনে আনবে। তারা সেখানে সংগঠিত হয়ে গ্রহ উপগ্রহের মত বস্তু সৃষ্টি করবে। তার ফলে মনে হবে যেন গ্রহ উপগ্রহ ঘুরছে। এই গ্রহ উপগ্রহগুলো নিজেদের পথে জলের চেয়ে হাল্কা হওয়ায় ডুবে অপর পাশে চলে যেতে পারে না। অবশ্য ক্ষুদ্র আকারের বস্তুগুলো ঘোলের মধ্যে পড়লে ডুবে যায়। এর উপমা স্বরূপ বলা যেতে পারে, একটা ঘোলে বড় নৌকা ডুবে যাবে না সে ঘুরতে থাকবে। ছোট নৌকা হলে সেই ঘূর্ণন তাকে গ্রাস করবে। এই পাশের জল অপর পাশে গিয়ে নিচু থেকে বুদবুদ তুলবে। সেই বুদবুদ ভেঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে বিগ ব্যাঙ্গের মত। গ্রহ উপগ্রহরা এমনি কারণে মহাকাশে পরস্পর থেকে দূরে চলে যায়। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন, কোনদিন কোন বিশাল অণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিল। তাই অণ্ড ভাঙ্গা ব্রহ্মাণ্ডের টুকরোগুলো পরস্পর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। একটা বিস্ফোরণের জোর ফুরালে একদিন চলা শেষ হয়ে যাবে। সৃষ্টি অমর বলেই অবিরত ধারার বুদবুদকে মেনে নিতে হবে আরও বিস্ফোরণের জন্য।

আইনস্টাইন ছাড়া ছাড়া অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন। সেই অনেক কিছুর মধ্যের যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পারেন নি বলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একক ক্ষেত্র নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। কারণ তিনিও জানতেন প্রত্যক্ষবাদ ছাড়া বিজ্ঞানি-মহল সর্বসম্মতিক্রমে সব কিছু মেনে নেবে না। বিখ্যাত দার্শনিক বিজ্ঞানী মাখ এবং ওস্টওয়াল্ড পরমাণুতত্ত্ব (atomic theory) বিশ্বাস করতেন না। কারণ তাঁরা পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। আবার যা দৃশ্যমান নয়, তার গতি সংক্রান্ত বিষয়কে পদার্থ বিজ্ঞানের ভেতর না ফেলে দর্শনের অধিবিদ্যায় (metaphysics) মধ্যে ফেলতেন। এ বিষয়ে তাঁদের মত ঠিকই। জগতে ভাব ও বস্তু দুটিই প্রভাব-শালী কেন্দ্রের জন্য। দুটিকে পদার্থ ভাবলে দুয়ের চরিত্র বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। ভাব ও বস্তুর আকর্ষণ বিকর্ষণ নিয়ে তাই আজও বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের কোন্দল লেগেই আছে। কেন্দ্র নিয়ে ভাবলে এই বিভেদ আর থাকত না।

তাই শুধু পদার্থ বিজ্ঞানী হিসাবে দুয়ের চিন্তা করায় তাঁকে বহু বিজ্ঞানীর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কেন্দ্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই সমালোচনা আর না হওয়াই উচিত। আইনস্টাইনও বলেছেন, যারা প্রত্যক্ষ করেই শুধু বর্ণনা

রূপে তাদের অনেক ক্ষেত্রে দার্শনিক কুসংস্কারে নিমজ্জিত হতে হয়।

তা হলে দেখা যাচ্ছে দু পক্ষেরই বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আইনস্টাইনও তাঁদের পুরোপুরি সমর্থন করতে পারেননি, তাঁরাও আইনস্টাইনকে সমর্থন করতে পারেন নি। পৃথিবী না থাকলে আকাশরূপী ভাব থাকে না, আবার আকাশ রূপী ভাব না থাকলে পৃথিবীরূপী বস্তু থাকে না। এই ঘটনা যখন সত্য, তাদের এক সূত্রে বাঁধতে কেন্দ্রবাদে আসতে বাধা কোথায় ?

সতেরো

পরমাণু না হলে বস্তু হয় না। পরমাণুর মধ্যে যে শূন্যতা আছে সেই শূন্যতা না থাকলে ইলেকট্রন ঘোরে না। তা হলে দেখা যাচ্ছে সেই ফাঁকায় চলার শক্তি বিদ্যমান। এই শক্তির ভাবপারের চূর্ণতা এত নিশ্ছিদ্র যে সেখানেও চলতে ইলেকট্রনকে বাধাজনিত ঢেউ প্রকাশ করতে হয় সময় সময়। তার মধ্যে নানা আবহাওয়া কাজ করে, যেমন সৌর জগতের আকাশ ও গ্রহদের মধ্যে কাজ করে। সেখানে তাই বার মাস এক রকম আবহাওয়া থাকে না। অক্ষে এবং কক্ষে ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর আকাশ নতুন নতুন বহিরাকাশের সম্মুখীন হয়ে রাত দিন ঋতু ইত্যাদি সৃষ্টি করছে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন কণিকা যেমন আছে, আকাশে ভাব তেমনি আছে। তার মধ্যে শক্তির প্রকাশ ঘটছে কিন্তু আলোর প্রকাশ ঘটছে না। আলোর প্রকাশ ঘটাতে হলে পরমাণুকে ভাঙতে হবে। ফলে সেই সঞ্চিত ভাবশক্তির একই সময়ে মুক্তিতে ইলেকট্রন অশেষ গতি পাবে। বোমার মত বন্ধন পরমাণুতে না থাকলেও, পরমাণুর বন্ধন রচিত হয় ভাবরূপী বাইরের চাপে। আঘাতে বন্ধনমুক্ত পরমাণু এমন গতি পেতে সক্ষম যে, আবহাওয়ার সংঘর্ষে আলো ফোটাতে থাকে। এখানে কণিকার চলা জনিত ঢেউ আলোর কারণ। আবহাওয়ার প্রতিরোধ না থাকলে তা সম্ভব নয়। তাই কণিকা না হলে এক থেকে অন্যে যাওয়ার ঢেউযুক্ত চলা থাকে না। ঝাঁকে ঝাঁকে আলোক কণিকা চলতে থাকলে অগ্রগামী কণিকারা আবহাওয়ার ঠেলায় পরস্পর মিশে স্তম্ভ সৃষ্টি করে। তখন পেছনের কণিকারা বেশি বাধার সম্মুখীন হয় না। স্তম্ভের মধ্যে চলে কম্পন সৃষ্টি করে। তখন স্তম্ভের গতির দিকে কণিকাজনিত আলোক তরঙ্গ সৃষ্টি করে।

এই চলার সংঘর্ষে কণিকা ভেঙ্গে ভাব স্তরে না পৌঁছালে আকাশ হত না। এই ভাব স্তর যদি না থাকত, আকাশে আলোর প্রকাশ হত না। কণিকাকে অশেষ গতি দিলেও সংঘর্ষের অভাবে আলো জ্বলত না। ভাবের চলাচল না থাকলে গ্রহেরাও চলত না। পরমাণুর ভর শক্তি থাকত না। ভর পরমাণুতে বাইরের প্রায় সমান চাপে শক্তি ধরে রাখে। প্রায় এই কারণে বলছি যে, সৃষ্টির সামঞ্জস্য শতকরা পঞ্চাশ পঞ্চাশ নয়। ১০১ ভাগের পঞ্চাশ ও একান্ন ভাগ। এই সামঞ্জস্য রাখতে

হবে চলার খাতিরে। নইলে পঞ্চাশ পঞ্চাশ হলে পা তুলতে হবে আর ফেলতে হবে। পথ চলা হবে না।

আর এক রকমের চলা আছে, তার নাম শক্তির চলা। সঙ্ঘবদ্ধ পরমাণুর একটিকে যদি বিস্ফোরিত করা যায় সেই বিস্ফোরণে পাশের পরমাণু বিস্ফোরিত হয়। এইভাবে পরমাণু নিজে এগিয়ে না গেলেও শক্তি ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলতে থাকে সব পরমাণুকে বিস্ফোরিত করতে করতে। এইভাবে আগুনও চলতে থাকে। এক ঘরে আগুন লাগলে সব বস্তিটাকে পুড়িয়ে দিতে পারে। সেখানে এই ধারাবাহিকতার প্রধান ভূমিকা নেয় অসীম আবহাওয়া। যা সর্বত্র ছড়িয়ে শক্তিকে অক্ষয় করে রেখেছে।

এই সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা আবহাওয়া সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বস্তুর অনুযায়ী। এই পার্থক্যে আবহাওয়া সর্বত্র শক্তি রূপে কাজ করছে। তবু তার স্থান ভেদে নানা ভাব হতে বাধ্য। তাই তা অনড় বিছিয়ে থাকা ঈথার নয়, যে ঈথারকে কল্পনা করেছিলেন হুইগেন্স।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রেনেল (Fresnel) ও ইয়ং (Young) বললেন, কণিকা নয়, তরঙ্গের ফল আলো। যদি সমান দুটি আলোর তরঙ্গের শীর্ষের সঙ্গে শীর্ষের (Crest to Crest) ও তলের সঙ্গে তলের মিলন ঘটে, তবে সে আলো উজ্জ্বলতর হবে। কিন্তু যদি সেই দুটি আলোর একটির শীর্ষের সঙ্গে অন্যটির তলের (crest to trough) মিলন হয় তবে তরঙ্গভঙ্গ জনিত অন্ধকার দেখাবে। এখানে তরঙ্গ তত্ত্ব প্রমাণিত হলেও, সে তরঙ্গ কণিকারই। একটা শরীরের বাধা ছাড়া তরঙ্গ হতে পারে না। আলোর কণিকা আছে বলে সে সোজা চলে, আবার সে কণিকার তরঙ্গ আছে বলে প্রয়োজনে বেঁকেও চলে।

ম্যাক্সওয়েল গণিতের সূত্রে বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গের কথা বলেন। সেই তরঙ্গের পেছনে কণিকা কাজ করছে বলে বিদ্যুচ্চৌম্বক সম্ভব হচ্ছে। একটা ট্রেন চলার সময় হাওয়া বিকর্ষণ করে। সেই বিকর্ষণের ফলে শূন্যস্থানে হাওয়া আকর্ষিত হয়। বিদ্যুচ্চৌম্বকের ক্ষেত্রেও তেমনি কণিকার শরীর জনিত তরঙ্গ কাজ করছে।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে হার্টজ (Hertz) ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বকে সমর্থন করে তিনি নিজেও গবেষণাগারে একটা প্রেরক যন্ত্রে তরঙ্গ সৃষ্টি করে ২৫ ফুট দূরের একটা গ্রাহক যন্ত্রে পাঠাতে সমর্থ হন। ফলে জন্ম হল আধুনিক বেতার বিজ্ঞানের। যে যুক্তিতে বেতার যন্ত্র আবিষ্কার সম্ভব হল, সেখানে কণিকার শক্তি সম্বন্ধে না জানলেও চলেছে। একক ক্ষেত্র তত্ত্বে তার দ্বারা সম্পূর্ণ ফল পাওয়া সম্ভব নয়। বেতারে তরঙ্গ পাঠানো গেলেও যোগাযোগের তারের কাজ করেছে শূন্যের পরস্পর সংযোজিত ভাবপারের কণিকারা। যেমন করে একটা পরমাণুকে বিস্ফোরিত করলে সঙ্ঘের অন্যান্যরাও বিস্ফোরিত হতে থাকে শৃঙ্খলা বজায় রেখে।

একক কেন্দ্র তত্ত্বের দিকে মানুষের যত মন যাবে, এই ধরণের অনেক অসম্পূর্ণতা

পূর্ণতার পথে চলবে। আইনস্টাইন বলেছেন, "মানুষের চেতনায় উপলব্ধ জগতের সত্য বিজ্ঞানীদের অনুমান নির্ভর, যার জন্য এই সত্য একেবারে চরম ও খাঁটি হতে পারে না। সময় সময় সত্যের পরিবর্তন হয়। কিন্তু বিশ্বের দ্বিতীয় রূপে যাকে বলা যেতে পারে Objective extrapersonal world, সত্য শাশ্বত, এ সত্যের কোন দিন পরিবর্তন হয় না।"

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্য তাহলে শাশ্বত সত্য হয় না। শাশ্বত সত্যকে পেতে হলে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্যদের সংযোগ ঘটাতে হবে। কিন্তু তারা এত প্রচুর যে মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারাও তা সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্যদের জুড়তে জুড়তে শাশ্বত সত্যের কাছাকাছি এসেও দুটি বস্তুকে আলাদা ভাবে রাখতে হবে দুটির পার্থক্য বাঁচাতে। সেখানে পার্থক্য না রাখলে আপেক্ষিকতা থাকে না। পার্থক্য থাকলে আবার একক ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্ভব হয় না। তাই একক কেন্দ্রতত্ত্বে এগুতে পারলে একক ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্ভব। কারণ, কেন্দ্রের সঙ্গে কেন্দ্রের পার্থক্য নাই।

একদিন ঈথার সত্য ছিল, আজ তা নাই। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেলসন বিখ্যাত ইনটারফেরোমিটার (Interferometer) যন্ত্রে তা প্রমাণ করেন। তাঁর মতে ঈথারকে যদি স্বীকার করতে হয় তবে পৃথিবীর কোন গতি নাই ধরে নিতে হবে। কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে অস্বীকার করে তাঁর পূর্বের টলেমির তত্ত্বকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। গ্রহরা সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, কোপার্নিকাসের এই তত্ত্বকে কে অস্বীকার করবে? কিন্তু ঈথারকে না মানা হলেও তার পরিবর্তে যে তরঙ্গতত্ত্ব খাড়া করা হয় সেখানেও সন্দেহ দেখা দিল।

আলো লিথিয়াম (lithium) সোডিয়াম (sodium) পটাসিয়াম (potassium) রুবিডিয়াম (rubidium) সীজিয়াম (caesium) ইত্যাদি কয়েকটি ধাতুর উপর পড়লে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। এই ব্যাপারে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে স্টোলাটভ (Stolatov) একটা পরীক্ষা চালালেন। বায়ুশূন্য একটা কাঁচের বোতলে দুটি ধাতুর প্লেট রেখে সে-দুটির সঙ্গে ইলেকট্রিক তার যোগ করে দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট চালালেন। কিন্তু কোন কারেন্ট পাওয়া গেল না। যখন সেখানে মার্কারী বা পারদের বাতির (mercury lamp) আলো ফেলা হল তখনই প্লেট থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হল। আলোটি সরিয়ে নেওয়া হলে আবার বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেল। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হার্টজ, লেনার্ড, হলবাখস প্রমুখ পরীক্ষা করে দেখেন, ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা বেরিয়ে আসছে ঐসব প্লেট থেকে। পরবর্তীকালে ঐ কণার নাম হয় ইলেকট্রন। আলোর উজ্জ্বলতার উপর ইলেকট্রনের গতি বাড়ে না বা কমে না। সে নিজের গতিতে চলে। ইলেকট্রনের সংখ্যার উপর উজ্জ্বলতা নির্ভর করে। এই ইলেকট্রনের বেগের উপর আলোর রঙ নির্ভর করে। আবার ইলেকট্রনের সবুজ আলোতে যে বেগ হবে, বেগুনী আলোতে হবে তার চেয়ে অনেক বেশি। লালের দিকের কোন আলো ফেললে ইলেকট্রন নির্গত হয় না। লাল

আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সে সূক্ষ্মস্থানে আঘাত করতে পারে না।

প্লাঙ্ক কণাবাদে বলেছেন, শক্তি নির্গত ও প্রবেশ খণ্ড খণ্ড ভাবে হয়। কিন্তু শক্তি প্রবাহিত হওয়ার সময় কি রূপ ধারণ করে তার কথা বলেন নি। আইনস্টাইন শক্তি নির্গত আর শোষণের কথা ছাড়াও দুই প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তীকালে অর্থাৎ আলোর চলার অবস্থার কথাও বলেছেন। তা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন (discrete) হলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য টুকরোর সমষ্টি। তিনি এই অবিভাজ্য টুকরোর নাম দেন ফোটন (photon)। আলোর একটি কণিকা ধাতু থেকে একটি ইলেকট্রন বের করে যে গতিবেগ দেবে, সেই আলোর অসংখ্য কণিকা অসংখ্য ইলেকট্রন বের করে সেই বেগ দেবে। আলোর বেশি কণিকা কর্তৃক নির্গত বেশি ইলেকট্রন বেশি আলোর বেগ দিতে পারে না। ইলেকট্রনের বেগ নির্ভর করে আলোর কম্পাঙ্কের উপর। এবং সে বেগ আলোর তীব্রতার উপর নির্ভর করে না। আলোর তীব্রতা নির্ভর করে তার কণিকাগুলির সংখ্যার উপর। এই আলোর তীব্রতা বাড়ালে বৈদ্যুতিক পথে বিদ্যুৎ প্রবাহ বাড়বে। তীব্রতা কমালে বিদ্যুৎ প্রবাহ কমবে।

আমরা জানি লাল আলো থেকে যত বেগুনী আলোর দিকে যাওয়া যাবে তত কম্পাঙ্ক বাড়বে। ফলে কণিকাগুলির শক্তিও তত বাড়বে। কোন ধাতু থেকে লাল আলোর কণিকা যে ইলেকট্রন বের করতে পারবে, তার গতি যা হবে, তার থেকে গতি বেশি হবে বেগুনী আলোর কণিকার দ্বারা নির্গত ইলেকট্রনের। বেগুনী আলোর কণিকার শক্তি ইলেকট্রনকে মুক্ত করে তাকে কিছু বেগও দিয়ে দিতে পারে। কারণ তারা প্রসরতায় ছাড়া ছাড়া হওয়ায় পৃথিবীর দিকে আসা চাপা আবহাওয়ায় গোলাকার সৃষ্ট ফোটন হয়ে সেই চাপেই ফোটন আলো দেয়। লাল আলোর সে শক্তি নাই।

নিউটনের কল্পিত আলোক কণিকাকে পুনর্জীভূত করে আইনস্টাইন ফোটন রূপে বর্ণনা করেন। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী জানা যায় আলোর দুটো রূপ। একটি হল তরঙ্গ রূপ, অপরটা হল শক্তির কণিকা বা ফোটন রূপ। আলোর শীর্ষের সঙ্গে অন্য একটির তলের যদি মিলন ঘটে তবে অন্ধকার দেখা যাবে তরঙ্গের জন্য। আলোর পথে কোন বাঁধা পড়লে তার বেঁকে যাওয়ার জন্যও দায়ী তরঙ্গ। কোন ধাতুর উপর আলো ফেললে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। এর জন্য দায়ী ফোটন। এই নিয়ম আলোর বেলায় যেমন সত্য, অন্যান্য সব শক্তির বিকর্ষণের বেলায়ও সত্য।

জলে একস্থানে ঘা দিলে তরঙ্গ দূরেও চলে যায়। তার কাছাকাছি বস্তু না থাকলেও দূরে তরঙ্গ এগিয়ে যায়। আলোকে যেখানে তরঙ্গ বলা হয়, সেখানে কাছাকাছি তরঙ্গের কারণ স্বরূপ কণা না থাকলেও দূর থেকে ঢেউ চালিত হয়েছে ধরতে হবে। তাই সেই তরঙ্গের কাছাকাছি বস্তুকে পাওয়া সম্ভব নয়। নিঃসীম শূন্যেও নিতান্ত শূন্যতা নাই। তাব পারের ধারায় বস্তুর চলন বহুদূর পর্যন্ত তরঙ্গ পাঠিয়ে দিচ্ছে। আলোর তরঙ্গ ধাতু থেকে ইলেকট্রন খসাতে পারে না, সেখানে

সরাসরি আলোক কণার প্রয়োজন হয়। তাই বলে সেখানে তরঙ্গকে অস্বীকার করা যায় না। রেডিও তরঙ্গে কণাকে পাই না, সেই কণার কাজ ট্রান্সমিটার করে দেয় তরঙ্গ তুলে, আর সেই তরঙ্গ এসে ধরা দেয় রিসিভারের আকর্ষণে।

বিরাট আয়তনের জল যখন সংকীর্ণ পথে যায়, তখন সেই বিরাট আয়তনের জলে একটা ঢেউ তুললে সেই সংকীর্ণ পথের টানে ঢেউ সংকীর্ণ হয়ে সেখানে ধরা পড়ে। তেমনি ট্রান্সমিটারে শব্দের ঢেউ তুললে রিসিভারে ধরা পড়ে। সেই স্রোতের আকর্ষণ আগে হাত বাড়িয়ে শব্দটাকে টেনে নেয়। নইলে সে শব্দ ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ নিয়মে সবার শব্দ বিকর্ষণের ক্ষমতা আছে, আবার আকর্ষণের ক্ষমতা আছে। আসবাবপূর্ণ ঘরে তাই শব্দ করলে শূন্য ঘরের মত গম গম আওয়াজ দেয় না, কারণ ঘরের আসবাবপত্র, মালগুলো সেই শব্দের অংশ ভাগ করে নেয়। প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে আকাশের বা শূন্যের সংযোগ স্থানে নিজের নিজের স্তর সৃষ্টি হয়। তেমনি জলের সঙ্গে আকাশের সংযোগস্থলে একটা স্তর সৃষ্টি হয়, সেই স্তর বেয়ে শব্দ প্রবাহিত হয় অন্যান্য পথের তুলনায় আরও সুষ্ঠু ভাবে।

আঙুল দিয়ে জল নাড়তে থাকলে ঢেউ চারদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। অর্থাৎ আঙুলের শক্তি চারদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। এই বিস্তারের জন্য আঙুলের দিকে আকর্ষণ হিসাবে আসছে জল। সে আকর্ষণ আঙুলের শক্তিতে বাধা পেয়ে ঢেউ বিস্তারে সেও সাহায্য করে। আঙুল এখানে কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের আকর্ষণ বিকর্ষণ ছাড়া শব্দের গতি, আলোর গতি ইত্যাদিও সম্ভব নয়। তাদের গতি বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার হয়। এক সেকেণ্ডে বাতাসে তরঙ্গ বেগের মান ৪০০ গজ বা ৩৬০ মিটার। সেই একই সময়ে আলোর তরঙ্গ এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বা তিন লক্ষ কিলোমিটার। এই সব তরঙ্গ নিয়ে চিন্তা করতে করতে স্কুলে পাঠ্যাবস্থাতেই আইনস্টাইনের মাথায় আপেক্ষিকতাবাদের চিন্তা এসেছিল।

চিন্তা করা যাক সমুদ্রের একটা জাহাজের গতিবেগ জলের তরঙ্গ বেগের সমান। তখন সেই জাহাজের যাত্রীর কাছে মনে হবে তরঙ্গগুলি গতিহীন। অর্থাৎ তরঙ্গের সঙ্গে সমান তালে চলায় জাহাজের আপেক্ষিকে তরঙ্গগুলি স্থির। সেই জাহাজটি যদি আলোর বেগে চলতে পারে, তবে আলোর গতিও যাত্রীর কাছে স্থির মনে হবে। তখন যদি জাহাজের পেছন দিকে আলো জ্বেলে দেওয়া যায়, সে আলো সামনের কোন পর্দা পর্যন্ত পৌঁছাবে না। ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বানুসারে কেউ যদি আলোর বেগে আলোর রশ্মির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারে, তবে সে দেখবে, আলোর তরঙ্গ স্থির। তার ফলে রশ্মিটি আর আলো নয়। এ তত্ত্ব ভুল। আসলে কিন্তু রশ্মিটিকে আলোই দেখাবে। কারণ দুই গতি পাশাপাশি যাওয়ায় দুটি আলাদা পথ, দুটি আলাদা ইলেকট্রো ম্যাগনেট সৃষ্টি হবে। দুটি পথই আলাদা আলাদা চলনশীল।

রশ্মিটি আলো থাকবে না তখনই, যখন সে যে মাধ্যম ভেদ করে ছুটে সংঘর্ষে

আলো ফোটাচ্ছে সেই মাধ্যম অনুসরণ করে যদি সেই রশ্মির বেগে ছোটে। অবশ্য তাতে আলাদা পথ আলাদা ইলেকট্রো ম্যাগনেট হবে না। দুয়ের পার্থক্য না থাকলে এক পথে দুই শক্তি সৃষ্টি হতে পারে না। আলোর সঙ্গে আলোর পথও একই বেগে ছুটলে পথের সংঘর্ষ না থাকায় আলো ফুটবে না। আলোর বেগে অন্য কেউ আলোর পাশ দিয়ে ছুটে গেলে সে আলো দেখতে পাবে। কারণ, আলো থেকে তার বিশেষ দূরত্ব না থাকায় বিদ্যুচ্চৌম্বক তার কাছে পৌঁছাচ্ছে আলাদাভাবে।

যেকোন মানুষের ভেতর পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তিরা কাজ করছে, যে শক্তিরা শরীরের কেন্দ্রের সঙ্গে বাঁধা। যাদের একটাকে বাদ দিলে অপরটা খোঁড়া হয়ে যায়। এদের চালনা করছে মন। পঞ্চেন্দ্রিয় হল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের ব্যবহার মনে যাচাই হলে সেই মানুষটির সত্য দেখা হয়। এমনিভাবে প্রত্যেকের নিজের নিজের সত্য আছে। সেই সত্যের গতিও আছে। আলোর যে গতি তার সবই ইলেকট্রন থেকে আসে না। আকাশের মাধ্যম তাকে সাহায্য করে। ক্লাসের ফার্স্ট বয়কে জানলে সেকেণ্ড থার্ড বয়ের প্রশ্ন আসে, তেমনি আলোর দ্রুত গতির কথা এলে মৃদু গতির কথা আসে। পায়ের আঙুলে চোট লাগলে তার সাড়া আগে ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে ঢেউয়ের মত। সেই ঢেউ আবার সর্বত্র ঘা খেয়ে চোটের মুখে ব্যথা জাগায়। জলে ঢিল ফেললে যেমন ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে গেলেও সেই ঢেউয়ের চাপ আবার সেই ঢিলের কেন্দ্রে ফিরে আসে। এখানেও কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ কাজ করছে। আবার চলার পথে একটাকে বুঝতে অন্যটার পরিচয় লাগছে। আলোর দ্রুতগতি আকাশের অন্যান্য মৃদুগতিতে আঘাত খায় বলেই আলো ফোটে। পথের ও আলোর কণিকার দ্রুতগতি এক হলে আলো ফুটিত না।

কঠিন পদার্থে আঘাত করলে সেই পদার্থে যে ঢেউ সৃষ্টি হয়, তাতে কণাগুলি সরে যায়না। একের কম্পন অন্যে সঞ্চারিত হয়। কঠিন পদার্থটি মৃত নক্ষত্রের মত নিরেট হলে সেই কম্পন সম্ভব হতনা। তরল পদার্থে আঘাত করলে যে ঢেউ সৃষ্টি হয় তাতেও কণিকাদের একের কম্পন অন্যে নিলেও কিছু কিছু কণিকা স্থান বদল করে। কারণ আঘাতের ঢেউ যত সময় ধরে ছড়াতে থাকে, সেই সময়ের মধ্যে পাশের জল কিছু কিছু সেই শূন্যস্থান পূরণ করে ফেলে। এই পূরণের আকর্ষণ বেশি হতে বাধ্য। কারণ, জলের একটা নিজস্ব বাঁধন আছে। তা না হলে জল অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারত না। গ্যাস অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায় না। আবরণ না থাকলে সে ছড়িয়ে যাবে। এক কণিকার কম্পন অন্য কণিকায় সঞ্চারিত হবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে কণিকাও সরতে থাকবে। আকাশের অবস্থাও তাই, সেও ছড়িয়ে যেতে চায়, কারণ কঠিনে, তরলে সর্বত্র তার স্থান আছে। পৃথিবীর আকর্ষণ বিকর্ষণের জন্য তার নিজের আকাশ ধরা আছে। এবং তার মধ্যেই আকাশের ভাব পারের কণিকারা চলাফেরা করছে। সেখানে কোন কিছুর তীব্র গতি শক্তি সৃষ্টি করতে পারে। বড় শরীরের বস্তুর গতি বেশি দরকার হয় না। তাকে অল্প চালালে শক্তি

পাওয়া যাবে। সেই শক্তির নাম বাতাস। আলোকশক্তি পেতে হলে আলোক কণিকার দরকার হবে। তার শরীর ছোট বলে তার শক্তি প্রকাশ করতে হলে বেশি গতি প্রয়োজন। এই সূক্ষ্ম শরীরের জন্য সূক্ষ্ম শুঁচের মত গতি আমাদের শরীরে শুঁচের মত বিঁধে যায়।

পঞ্চেন্দ্রিয়র মত সবার সঙ্গে সবার সম্পর্ক আছে। চোখের আপেক্ষিকতা দেখতে তাই ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে না, যত সময় না মন সায় দিচ্ছে। মন এই চোখের দেখাকে কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বকের দ্বারা বিচার করে রায় দেবে। সব পরীক্ষায় সব ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন নাও হতে পারে। যে পরীক্ষায় যে কটির প্রয়োজন, মন ঠিক সেই কটিকে নিয়ে যাচাই করে দেখবে, চোখ যা দেখছে ঠিক দেখছে কি না।

আমরা আলোর তরঙ্গকে দেখি, কিন্তু তরঙ্গের কারণকে দেখি না। আলো যে সেই কারণের তরঙ্গ তা চিন্তা না করে বলি আলো হল কণিকার ফল অথবা তরঙ্গের ফল। অথচ কণিকা না হলে তরঙ্গ হয় না। তরঙ্গের কাছে কণিকাকে না দেখলেও সেই সত্য মানতে হবে যে, কণিকা থেকে তরঙ্গের সৃষ্টি। চোখের দেখা তাই আংশিক সত্য। চোখের দেখার আপেক্ষিকতাবাদ বস্তুর সঙ্গে বস্তুর তুলনা করে। মনের দেখার আপেক্ষিকতাবাদ বস্তুর সঙ্গে গুণেরও তুলনা করে। যেমন ধরা যাক, রেডিওতে এক শিল্পীর গান শুনলাম। গানটি খুব ভাল লাগায় মন উসখুস করতে লাগল, শিল্পীকে কেমন দেখতে? যখন শোনা গেল অমুক স্থানে তিনি আসছেন, মন তখন টেনে নিয়ে যাবে শিল্পীকে দেখাতে। যদি তার চেহারা সুন্দর হয়, তখন বলাতে বাধ্য করে, এমন চেহারা না হলে কি অমন সুর বেরোয়! সেখানে কিন্তু বস্তুর সঙ্গে গুণের তুলনা হল। এই আপেক্ষিকতাবাদে কানের সঙ্গে চোখেরও প্রয়োজন হল। সবার মূলে মনের প্রয়োজন হল। মনকে যখন পাচ্ছি শুধু চোখের দেখাকে বিশ্বাস করব কেন? শুধু কানের শোনাকে বিশ্বাস করব কেন? শুধু নাকের ঘ্রাণ শক্তিকে বিশ্বাস করব কেন? শুধু জিভের আস্বাদনকে বিশ্বাস করব কেন? শুধু ত্বকের স্পর্শশক্তিকে বিশ্বাস করব কেন? মন থাকলে শুধু পদার্থের সঙ্গে পদার্থের তুলনা করব কেন? শুধু গতির সঙ্গে গতির তুলনা করব কেন? শুধু ভাবের সঙ্গে ভাবের তুলনা করব কেন?

মন থেকে কোন কিছুকে বুঝতে তার সবকিছুর সঙ্গে সবকিছুর বিচার করতে হবে। সব বিচার করে আসতে হবে এক কেন্দ্রে। তবেই আপেক্ষিকতাবাদের সন্দেহ ভঞ্জন হবে। একটা উড়ন্ত পাখিকে তাক করে গুলী ছুড়লাম। কিন্তু তাতে পাখিটি পড়বে না। সেই পাখিটিকে তাক না করে যদি তার চলার পথ হিসাব করে শূন্যতায় গুলি চালানো যায় তবে পাখিটি পড়বে। এই পাখিটিকে দেখা ও তাক করা তা হলে সত্য নয়। সত্য পাখিটি থেকে দূরে শূন্যে অবস্থান করছে। পাখির চলাটা সত্য বলেই পাখিটি পড়ল। পাখিটি কোথাও বসে থাকলে তাকে গুলী করলে

পাখিটি পড়ত। পাখিটি স্থির বলে পাখিটি সত্য। তাই গুলী করাও সত্য, গুলী করার তাকও সত্য বলে শিকারীও সত্য। চলায় সত্য শূন্যে বাস করে। শূন্যে সত্য এসে অবস্থান করে, তাই পৃথিবী না থাকলে শূন্য থাকে না, শূন্য না থাকলে পৃথিবী থাকে না। সবার মিলনের ফল সত্য। আজকাল তো পঞ্চেন্দ্রিয় না থাকলেও কমপিউটারে সত্য প্রকাশ করতে পারছে, যা আপেক্ষিকতাবাদকেও হার মানিয়ে দিতে পারে। ছয় রিপুও একের সঙ্গে বাঁধা পড়ে আছে। কাম থাকলে লোভ হয়। লোভে কিছু আয়ত্ত করতে গিয়ে বাঁধা পাওয়ায় ক্রোধ হয়।

আমরা একটা ফুল দেখলাম, ফুল দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার রঙও দেখলাম, তার পাপড়িও দেখলাম। তেমনি ট্রেনে বসে ট্রেনের গতি দেখলাম, সেই গতির সঙ্গে তাল রেখে পাশের একটা চলন্ত ট্রেনের গতি বুঝলাম। আমরা ট্রেনে বসে থাকলেও, আমাদের গতি সেই ট্রেনের গতির সমান। এমনি না ভেবে, নিজেকে স্থির ভেবে যদি সবার আলাদা আলাদা গতি জানতে চাই তবে জটিলতাই বাড়বে। তাতে সহজ পথ ছেড়ে ঘাড় বেড় দিয়ে কান ধরার মত কাজ হবে। পৃথিবীর বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ১৯ মাইল জানলে, নিজের গতি জানার আর প্রয়োজন হবে না, যদি বসেও থাকি। নিজেকে পৃথিবী ভাবলে, অন্য হিসাবের জটিলতা কমবে। দর্শন যেমন বৈজ্ঞানিক জগতের প্রসার বাড়ায়, আপেক্ষিকতাবাদ তেমনি বৈজ্ঞানিক জগতের প্রসার বাড়ায়। আপেক্ষিকতাবাদ তাই বিজ্ঞান নয়, দর্শন। একে বিজ্ঞান ভাবলে বিজ্ঞানের সর্বনাশ হবে। এই আসল কথা বোঝাবার জন্য এত আলোচনা করা গেল।

আইনস্টাইনের দু-শ বছর পূর্বে লাইবনিৎস বলেছিলেন, Space is the order or relation of things among themselves. Without things occupying it, it is nothing. অর্থাৎ মহাকাশ শুধু বস্তুগুলির নিজেদের মধ্যে বিন্যাস। মহাকাশে যে সব বস্তু আছে, সেগুলি যদি না থাকে মহাকাশ কিছুই নয়। এই কথা ভেবেই আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে বলেছিলেন, বস্তুশূন্য মহাকাশের কোন অস্তিত্ব নাই। বস্তু আছে বলেই মহাকাশের অস্তিত্ব আছে।

আলোক কণিকারা যত ছড়িয়ে পড়বে, তত ঔজ্জ্বল্য হারাবে তাদের তরঙ্গ সৃষ্টি হলেও। এই কণিকারা ঝাঁকে ঝাঁকে চললে সবার তরঙ্গ মিশে প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে। এই কণিকারা সঙ্ঘবদ্ধ হতে হতে বহু ফোটন সৃষ্টি করবে, যেমন দুধ মন্থনে মাখন সৃষ্টি হয়। সেই সব ফোটনের আবরণের মধ্যে কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ শুরু হলে কম্পন সৃষ্টি হবে। এই কম্পাঙ্কের উপর আলোর গতি নির্ভর করে। কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণে ফোটনের আকার গোলাকার হয়। তার গতির মুখে বেগ বাড়তে থাকে পেছনের ঠেলায়। শুধু মাত্র কণিকার এই পিছলানো স্বভাব থাকে না। কণিকাদের সঙ্ঘবদ্ধতায় এবং পেছনের চাপে পরমাণুর মত শক্তি বিকীর্ণ হয়।

এইভাবে আলো বিস্তার করতে সূর্যের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন পরমাণু সৃষ্টি। এদের চলার ফলে আকাশের প্রতি কণার সংঘাতে আলো সৃষ্টি হয়।

আলোকে স্বচ্ছ গোলাকার কাচের মধ্যে দিলে আলো উজ্জ্বল হয় বেশি। সেই কাচের চিমনি যদি গোলাকার না হয়ে অন্য আকারের হয়, অত ঔজ্জ্বল্য দেখা যাবে না। কারণ তাতে আলোক কণিকারা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে না শক্তির ঠেলায়। চিমনি গোলাকার কাচের হলে শক্তির ঠেলায় সর্বত্র সমানভাবে কণারা আবরণ সৃষ্টি করতে পারে। এই সমতা কাচের স্বচ্ছ সমতায় বাইরের আবহাওয়ায় সমভাবে উজ্জ্বলতা দান করতে পারে। এই সমতায় বাইরের আবহাওয়া সাম্য ভাব পাওয়ায় আলো পরিষ্কার হয়। যদি চিমনির দোষে আলোর মধ্যে উঁচু নিচু অসাম্য প্রকাশ পায় তবে তার মধ্যে অন্ধকার বাসা বাঁধে। স্বচ্ছ বস্তুর মসৃণতায় সাম্যাবস্থার সৃষ্টি। আবার চিমনি খুলে দিলে নানা শক্তি নানাদিকে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে শক্তি বেরিয়ে গেলে অন্ধকার জমাট বাঁধে। কালো পাথরের চিমনি ভেদ করে আলো প্রকাশ পায় না। তবু সেই কালো পাথর যদি মসৃণ থাকে, সেই মসৃণতায় আলো ফেললে আলো প্রতিফলিত হয়। এখানে মসৃণতার প্রতিফলনের জন্য কালো রঙ পর্যন্ত নজর যায় না, প্রতিফলন দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দেয়।

এই দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দেওয়ার শক্তি আলোক কণিকাদের নাই। কণিকারা আলোর সমবায়ে একটা স্তম্ভ সৃষ্টি করায় দৃষ্টি প্রবেশ করতে পারল না। পরমাণু মিশে যেমন বস্তু হয়, তেমনি আলোক কণিকা মিশে আলোর স্তম্ভ হয়। অবশ্য কোন কোন সময় দুই একটি কণিকা বেরিয়ে আসে। যেমন বাজারে বহু লোকের চিৎকার মিশে একটা আওয়াজের স্তম্ভ হলেও সেই স্তম্ভ ভেদ করে দুই একটা মানুষের তীক্ষ্ণ স্বর বেরিয়ে আসে আলাদা ভাবে। এমনি ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ কণিকায় আর কণিকা থাকে না বলে, কণিকাদের ছন্দ ধারা হয়ে ধারাবাহিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ছন্দের মাঝে মাঝে যে বিরতি থাকে, সেই বিরতিতে অন্ধকার স্থান নিতে পারে না। আলোর উৎস থেকে বেরুবার সময় কণিকাদের সবাই সমান ভাবে শক্তি না দেওয়ায় সেই ছন্দের মধ্যে অন্ধকার স্থান নিত। যদিও সেই ছন্দ না থাকলে উৎসের কেন্দ্রের ঠেলায় কণিকারা বেরিয়ে আসতে পারত না।

জল নিচের দিকে থাকে বলে সেই জলের দিকে জল গড়ায়। আলোর মধ্যে ছন্দের ফাকের অন্ধকার থাকলে সেই গভীরতায় অন্ধকার গড়ায়। আলোর মধ্যে যখন অন্ধকার থাকতে পারে না, তখন শক্তির ঠেলায় অন্ধকারের গড়িয়ে যাওয়ার গভীরতা থাকে না। এই আলো স্বচ্ছ মসৃণ কাচের চিমনি ভেদ করে বেরুলে বাইরের আঁধার সেদিকে গড়াতে পারে না ছন্দের ফাকের অভাবে। কিন্তু খোলা আলোতে পারে, সেখানে আলোর শক্তিশালী স্তম্ভ গড়ে না ওঠায়। এই কারণে রাত্রে আমরা যে আলোর দ্বারা কোন বস্তুকে দেখতে পাই না, সেই আলোতে আমরা সেই স্বচ্ছ কাচকে দেখতে পাই। কারণ পৃথিবীতে দেখতে পাই আলোতে

যেমন অন্ধকার থাকে, অন্ধকারেও তেমনি আলো থাকে। মসৃণতা আর অমসৃণতা দিয়ে সেখান থেকে আলোকে ও অন্ধকারকে বেছে নিতে পারি। আলো যে স্তম্ভ সৃষ্টি করতে পারে, তা অ্যাটম ফাটলে বুঝতে পারি। তার প্রভাব যত দূর চলে তত দূর ঘিরে আগুনের স্তম্ভ সৃষ্টি করে। বস্তু যেমন কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণে ক্ষয় হয়, তেমনি সেই স্তম্ভের মধ্যে কেন্দ্র সৃষ্টি হওয়ায় নানা কণিকা ক্ষয় হতে. হতে বেরিয়ে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। নানা দিকে নানা বস্তুতে ঢুকে বিস্ফোরিত করে তোলে সবকিছুকে বহুদিন ধরে।

তারকারা আকাশে মিটমিট করছে দেখা যায়। মিটমিট করার অর্থ আলোর বাড়া আর কমা। বিকর্ষণে আলো বাড়ে, আকর্ষণে আলো কমে। এই নীতিকে সৃষ্টির সবকিছুকেই মেনে নিতে হয়। আকাশে অনেক যুগ্ম তারা আছে। তারাও মিটমিট করে। যুগ্ম তারা জোড়ায় আছে বলে পরস্পরের আকর্ষণে বিকর্ষণে বাঁধা আছে। দুয়ের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা আকাশ আছে, কারণ তারা আলাদা আলাদা হয়ে আছে। আবার দুই আকাশ সহ তাদের নিয়ে বড় আকাশ সৃষ্টি হয়েছে। একটা তারা যখন বিকর্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, দ্বিতীয়টা তখন আকর্ষণে ঔজ্জ্বল্য হারাচ্ছে। এই দ্বিতীয় তারাটি যখন আকর্ষণে শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে বিকর্ষণ শুরু করল, প্রথম তারাটি তখন আবার আকর্ষণে সেই পরিত্যক্ত শক্তি নিতে ঔজ্জ্বল্য হারাল। এইভাবে শক্তি বিনিময় চলতে থাকে উভয়ের মধ্যে। এমনি আকর্ষণ বিকর্ষণের এবড়ো খেবড়ো পথ অতিক্রম করে পরস্পর পরস্পরের চারদিকে ঘোরে। এই পথই তাদের সহজ পথ। এই আবর্তনের সময় পৃথিবীর দিকে যে তারাটি আসছে সে তারাটি আকর্ষণ করার জন্য কিছুটা কম তেজী হয়ে পড়ছে। পৃথিবীর দিক থেকে যে তারাটি সরে যাচ্ছে, সে তার টানে তেজ ছাড়লেও তার আলো পৃথিবীর দিকে আসতে বেশি পথ অতিক্রম করায় দুটি তারার আলোই সমান দেখাচ্ছে। নইলে দুই তারার আলোর নির্দিষ্ট গতিবেগ থাকলে বিভিন্ন দূরত্ব থেকে সমান আলো দিতে পারে না।

যুগ্ম তারা দুটি নিজের নিজের আকাশে বাস করলেও, দুটি তারার আবার মিলিত একটি আকাশ আছে। এই কারণের জন্য কেউ কারো ঘাড়ে গিয়ে পড়ে না নিরাপদ দূরত্বের জন্য। আবার কেউ কাউকে ছেড়ে যেতে পারে না দুয়ের আকাশ এক প্রধান আকাশে বাস করছে বলে। এই বাঁধনের জন্য পরস্পরের শক্তি বিনিময় হচ্ছে। তাই উভয়ের আলোর পার্থক্য বুঝতে পারি না। তাছাড়া আমরা কোন সূর্যের দেহকে দেখতে পাই না তার আকর্ষণ বিকর্ষণে জ্যোতির জন্য। শুধু দেখতে পাই সেই জ্যোতির মিটমিটে আলোর খেলা। আমরা সূর্যের যতটুকু আলো দেখতে পাই, তাও দেখতে পেতাম না যদি তার নিজস্ব আকাশের কাচের মত স্বচ্ছতা না থাকত। তাহলে সেই আলোর চাপ আমাদের দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিত। তাই আলোর বেগ যেমন উৎসের উপর নির্ভরশীল তেমনি আকাশের আবরণের

উপরেও নির্ভরশীল। তাহলে দেখা গেল এই যুগ্ম তারা (double star) প্রত্যেকে নিজের নিজের কেন্দ্র নিয়েও উভয়ের একটি সাধারণ অভিকর্ষ বিন্দুকে কেন্দ্র করে (centre of gravity) পরস্পরের চারদিকে ঘুরছে।

দুটি তারা একই মহাকাশের আবরণের মধ্যে থাকলে সেই আবরণ তাদের আলোর গতি দুটিকে মিশিয়ে এক করে দেয়। একটা গোলাকার কাচের আবরণে দুটি দুরকম পাওয়ারের বাল্ব জ্বললেও, আলো একই রকমের প্রকাশ করবে। যদিও কাচের আবরণের মধ্যে দুটি জ্বলন্ত বাল্বকে দেখা যাচ্ছে। এখানে যদি দুটি বাল্বের বদলে দুটি তারকা আকর্ষণ বিকর্ষণ করত, তবে তারকা দুটির ঔজ্জ্বল্য এক দেখাত এবং তাদের আলোর প্রকাশ এক হত।

একটা প্রদীপ জ্বললে তার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পাব, তার উৎসে অন্ধারের অন্ধকার। সেই প্রদীপ থেকে যত দূরে সরে যাওয়া যাবে, সেই অন্ধকার ক্রমে মিলিয়ে যেতে থাকবে। আরও দূরে চলে গেলে সেই অন্ধকার আর দেখা যাবে না। দেখা যাবে শুধু আলোক বিচ্ছুরণ। এর কারণ, আলোর বিচ্ছুরণ থাকলেও আঁধারের বিচ্ছুরণ নাই।

যুগ্ম তারার যুগ্ম আকাশ থাকলেও দূরে দাঁড়িয়ে তাদের একই আকাশে দেখতে পাব। কারণ তাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে। তারা পরস্পরের চারদিকে ঘুরলেও আলো একই দেখা যাবে। কারণ তাদের শক্তি একই আকাশে পুঞ্জীভূত হয়ে সেই আকাশ থেকে বিতরিত হচ্ছে। বস্তুর চেয়ে আলো সূক্ষ্ম, তাই তাকে ভেদ করে দুটি তারা দেখলেও ফলে দুটি আলোর ঘূর্ণন দেখলেও আলো আমরা একটাই দেখতে পাই। অনেক লোক তাদের অনেক শক্তি দিয়ে দড়ি টানলেও দড়িতে কিন্তু একটা শক্তি সৃষ্টি হচ্ছে। যুগ্ম তারার আলোর ক্ষেত্রেও তাই।

আঠারো

আপেক্ষিকতাবাদে বস্তুর চেয়ে ঘটনার প্রাধান্য বেশি। এই ঘটনাকে প্রকাশ করা যায় চারটি স্থানাঙ্ক (co-ordinate) সম্বলিত একটা বিন্দুর দ্বারা। তাদের তিনটি হল মহাকাশ-সংক্রান্ত অক্ষাংশ দ্রাঘিমা এবং উচ্চতা। চতুর্থটি হল জাগতিক বিন্দু (world point)। এই জাগতিক বিন্দুর সঞ্চার পথের (locus) দ্বারা কোন কিছুর গতি নির্ধারিত হয়। এই সঞ্চার পথকে বলা হয় জাগতিক রেখা (world line)। বিশ্বের সকল বিষয় এমনি ঘটনাগুলির সমষ্টিগত ফল চার মাত্রার (four dimensional) জাগতিক বিন্দুগুলো, যাদের বলা হয় চার মাত্রার মহাকাশ সময় সন্ততি। একেই আবার মিনকভস্কি বলেছেন বিশ্ব।

একটা রেল লাইনকে এক মাত্রার (one dimensional) বলা যায়। কারণ, তার শুধু দৈর্ঘ্য আছে। একটা খেলার মাঠ দুই মাত্রার। কারণ তার দৈর্ঘ্য, ও প্রস্থ আছে। একটি ঘর তিন মাত্রার। কারণ তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা আছে। একটা

প্লেন আগুন লেগে পড়ে গেলে চার মাত্রার হিসাব হবে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ছাড়াও সময়ের হিসাব করতে হবে। এই সময় রূপ মাত্রাকে বলে চতুর্থ মাত্রা বা fourth dimension। একটা বিমান একটা শহর থেকে অন্য একটা শহরে যাবে, সেখানে মাঝ পথে নামার কথা ওঠে না। অর্থাৎ এখানে কোন বিচ্ছিন্নতা থাকে না। থাকে অবিচ্ছিন্ন বক্রাকার পথ। এই অবিচ্ছিন্ন বক্রাকার পথকে লক্ষ্য রেখে চার মাত্রার মহাকাশ সন্ততির মধ্য দিয়ে (four dimensional space-time continuum) ভাবতে হবে।

একটা রুলার এক মাত্রার সন্ততি বা Continuum। একে আমরা নানা ভাগে ভাগ করতে পারি প্রয়োজন মত। রুলারটা যদি অশেষ অনন্ত হয়, তাকে প্রয়োজন মত ভাগ করে অন্তের ভেতর ফেলতে পারি। একটা ট্রেন লাইনকে এই প্রয়োজনে নানা স্টেশনে ভাগ করা হয়েছে। বহু মানুষের জন্য বহু সেণ্টারের প্রয়োজন হয়েছে। একটা মানুষের জন্য প্রয়োজন একটা স্টেশানের। এই এক বা বহুর যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি সবার মূলে পৃথিবীর কেন্দ্রের নিজস্ব একটা প্রয়োজন আছে। তার সঙ্গে তাল রেখে আপেক্ষিকতাবাদ দাঁড় করাতে পারলে আরও অনেক কিছু জানা যেত। একটা সেণ্টার যদি নিজের চারদিকে ঘোরে, তার শরীর নাই বলে স্থানের চলা থাকছে না। পৃথিবীর সেণ্টারকে ঘিরে শরীর আছে, তাই সেণ্টার ঘুরলে ভূস্তর ঘুরছে, তাই আমরাও ঘুরছি। প্লেনের পাইলট নিজের প্রয়োজনে নিজের গন্তব্য স্থান ঠিক করে সেই মত চলে। সে চলার সময় আমার কথা যখন শুনবে না তখন আমি দর্শক মাত্র। তার চলাকে তাই আমার বিচার করে নিতে হবে। তেমনি বিচার করে নিতে হবে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর চলা, পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্রের চলা।

যদি পৃথিবীর সেণ্টার থেকে সূর্যের সেণ্টারে, সূর্যের সেণ্টার থেকে চন্দ্রের সেণ্টারে ও চন্দ্রের সেণ্টার থেকে আবার পৃথিবীর সেণ্টারে লাইন টানা যায়, তবে মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন যথাসম্ভব পরস্পরের দূরত্ব নির্ভুল জানতে পারবে। তারপর সবার সেণ্টারভিত্তিক ঘূর্ণন জানলে এই তিনের আকাশে যে কোন চলন্ত বস্তুর অবস্থানের দূরত্ব জানা সম্ভব। চতুর্থ মাত্রার সময়ের হিসাব তখন অনেক সহজ হবে। কারণ আমাদের জানা আছে, একটা নির্দিষ্ট স্থান না হলে সেখান থেকে পরস্পরের দূরত্ব জানা গেলেও নির্দিষ্ট অবস্থান জানা যায় না।

গতিটা ট্রেনের যাত্রীর নয়। তেমনি সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণনায়মান পৃথিবীর গতি থাকলেও, সেই গতি তার অধিবাসীর নয়। অধিবাসীদের গতি হবে নিজের নিজের প্রয়োজনের তাগিতে চললে। একটা গতিকে অনুকরণ করে সমতা আনতে গেলে, নিজস্ব গতির মূল্যায়ন হয় না। সমস্ত গতির মূল্যায়ন করতে গেলে, প্রথমে সূর্যের গতি জানতে হবে, তার প্রভাবে প্রভাবিত পৃথিবীর গতি জানতে হবে। এই পৃথিবীর গতি আমাদের চলার চরিত্রে কাজ করছে। এই পৃথিবীর পরে দাঁড়িয়ে

সবকিছুর আপেক্ষিকতাই আসল আপেক্ষিকতা। তবু প্রয়োজনের ইন্ধনেএকটা ট্রেন গতি বাড়িয়ে অপর একটা ট্রেনকে ধরে প্রয়োজন মেটাতে পারে। সেখানে আপেক্ষিকতার ভিত্তি প্রয়োজনের পরে। লক্ষ্য সেখানে আপেক্ষিকতা নয়, প্রয়োজন। এই প্রয়োজন যদি না থাকে, আপেক্ষিকতা সৃষ্টি হয় না।

একটা বেলুনের দুটি দাগ যতই কাছাকাছি থাকুক না কেন, যত ফোলানো যাবে তত তাদের পরস্পরের দূরত্ব বাড়তে থাকবে। এর থেকে আর একটা ছোট বেলুন ফুলিয়ে দুই বেলুনের মুখ এমন ভাবে জুড়ে দিতে হবে যে, যাতে উভয় বেলুনের হাওয়া উভয় বেলুনে যাতায়াত করতে পারে। তাহলে দেখা যাবে দুই বেলুন নিজের নিজের ক্ষমতা মত হাওয়া নিয়ে থাকবে। এখানে একের প্রভাব, অন্যের পরে পড়ছে না। কিন্তু যদি বড় বেলুনটাকে পৃথিবী ও ছোট বেলুনটাকে চন্দ্র ধরা যায়, তবে উভয়ের বস্তুর পার্থক্য থাকবে, তাদের বিক্রিয়ার পার্থক্য থাকবে নিজের নিজের কেন্দ্রের চরিত্রে।

কেন্দ্রভিত্তিক নানা বস্তুর নানা পার্থক্যের জন্য আকর্ষণ বিকর্ষণ সৃষ্টি। আকর্ষণ শীতলতা সৃষ্টি করে, বিকর্ষণ তাপ সৃষ্টি করে। আকর্ষণের শীতলতায় শরীর সংকুচিত হয়, বিকর্ষণের তাপে শরীর প্রসারিত হয়। স্নান করবার সময় তাই মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢাললে শরীরের তাপের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাসও বেরিয়ে যায়।

একটা বস্তু থেকে উষ্ণতায় যা শক্তি হয়ে বেরুল, তা ঠাণ্ডা হলে অন্যের মধ্যে চেপে বসে। এইভাবে চলাচল অনন্তকাল ধরে চলছে ও চলবে। একটা পদার্থের মধ্যে পরমাণুর ইলেকট্রনও চলে এই কারণে। যে হাওয়া আমাদের শরীরে চাপ দিয়ে শীতল করে, সেই হাওয়া কিন্তু অন্য বস্তু থেকে উত্তাপ পেয়ে বেরিয়ে এসেছে। এই চলাচলে আকাশ বাতাস ভরে আছে। নানা বস্তুর চাহিদা অনুযায়ী চাপ সৃষ্টি করে। এই ধারার যে চাপ তার সমস্তটাই চাপলে সে বস্তু ভেঙে যেত। কিন্তু বস্তুটার কেন্দ্রভিত্তিক ঠেলা তা প্রশমিত করছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শীতলতা মাত্রেই বস্তু ঘেঁষা, উষ্ণতা মাত্রেই আকাশ বা ভাব ঘেঁসা। ঘুমানোর সময় জেগে থাকা জ্বালা—অশান্তি। ঘুমালে কিছু জানা যায় না, তাই শান্তি। তাই বুঝি জানতে না পারাই শান্তি। নইলে ঘুমিয়ে কি করে বুঝলাম শান্তিতে ঘুম হয়েছে। মৃত্যুকে তাই ভয় না করে পরম শান্তি ভাবা উচিত। অন্ধকার বিশ্রামের আলয়।

কেন্দ্রবাদ বাইরের হিসাব না বাড়িয়ে ভেতরের কেন্দ্রের হিসাব বাড়ায়। কেন্দ্রের হিসাব বাড়ালে বাইরের হিসাব ধরা পড়ে। কেন্দ্রের আকর্ষণ বিকর্ষণে যেমন বস্তু গড়ে ওঠে, তেমনি গড়া শেষ হলে সেই আকর্ষণ বিকর্ষণেই বস্তু জরাজীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়তে চায়। পৃথিবী এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে, আবার তার এই ভাবেই মৃত্যু হবে। সূর্যেরও এইভাবে মৃত্যু হবে। সূর্য যে ছায়া পথের কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে, সেই কেন্দ্রের আকর্ষণ বিকর্ষণে ছায়াপথ প্রসার লাভ করছে। একদিন এই ছায়াপথ সৃষ্টি হয়েছিল আকর্ষণ বিকর্ষণে। যদি তার বিস্ফোরণেও সৃষ্টি হয়ে থাকে,

এসে বিস্ফোরণও আকর্ষণ বিকর্ষণের ফল। সেখানে আপেক্ষিকতার হিসাব ঠিক থাকে না বাইরের পরে নির্ভরতা থাকায়। কেন্দ্রবাদের কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুর হিসাব পরিষ্কার হবে।

ইউরেনিয়ামের মত ভারী যৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রীনকে (atomic nucleus) নিউট্রন কণিকা দ্বারা আঘাত করলে কেন্দ্রীন বিভাজনের (fission) ফলে শক্তি নির্গত হয়। এই শক্তির মূল কেন্দ্রীনকে দুই ভাগ করে দুটি অন্য পদার্থের কেন্দ্রীন সৃষ্টি করে। মূল কেন্দ্রীন যে শক্তি ধারণ করেছিল, তা দুই ভাগ হলে সেই শক্তি দুই ভাগ হয় না। সৃষ্ট দুই কেন্দ্রীনের নিজের নিজের উপযোগী শক্তি ধরতে বাড়তি শক্তির কিছু প্রয়োজন হয়। আকর্ষণে সেই শক্তি চেপে আসায় বিকর্ষণে তার উপযোগী শক্তি প্রকাশ করে। এখানে কেন্দ্রধর্মী কেন্দ্রীনই বড় কথা। আলোর গতির মুখে কণিকারা মিলে ফোটন সৃষ্টি করলে যে নতুন শক্তি সৃষ্টি হয় তা আবার অধিক উষ্ণতায় একাধিক হাল্কা পরমাণু কেন্দ্রীনের সংযোজনে উৎপাদিত শক্তির মত। এক্ষেত্রে অনেকগুলো কেন্দ্রীনের নিজের নিজের শক্তি এক কেন্দ্রীনের শক্তিতে রূপান্তরিত হতে গিয়ে পূর্বের বাড়তি শক্তি প্রকাশ করল। ইলেকট্রন ফোটনে রূপান্তরিত হতে যেমন আলো প্রকাশ করে, সেই কণিকাকে ভাঙলেও তেমনি আলো প্রকাশ করে। এখানে ফোটনের পরমাণুর চরিত্র প্রকাশ পায়। পৃথিবীর পক্ষে যা ফোটন, সূর্যের পক্ষে তা হাইড্রোজেন পরমাণু। সেও ফুটন্ত কণিকা একত্রিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে। তাই সূর্যের আলো আর পৃথিবীর আলো এক শক্তি নয়, যেমন সূর্যের কেন্দ্রের শক্তি ও পৃথিবীর কেন্দ্রের শক্তি একশক্তি নয়। যদিও তাদের আকর্ষণ বিকর্ষণের দিক থেকে চরিত্র এক। সূর্যের চেয়ে আরও বড় বড় তারকায় হাইড্রোজেনের চেয়ে ভারী পরমাণুরা শক্তি প্রকাশ করছে। এইসব পরমাণু জমেই গাগনিক বস্তুদের সৃষ্টি। সূর্যে সংঘর্ষে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে, পৃথিবীতে তেমনি ইলেকট্রন আলোক কণিকায় রূপান্তরিত হচ্ছে। হিলিয়ামে যেমন সূর্য গঠিত। আলোক কণিকায় তেমনি পৃথিবী গঠিত। তাই সে শুধু আলোক কণিকা নয়, পৃথিবী গঠনের কণিকা। এই কণিকা শুধু আলো নয় অন্যান্য শক্তিও প্রকাশ করে। শক্তি প্রকাশ পাওয়ার পর যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় আবহাওয়ায় সেই শূন্যতাকে পূরণ করতে চারদিক থেকে বায়ু চেপে এসে আর এক শক্তি প্রকাশ করে। এই শক্তি প্রকাশের মূলে একটা অস্থায়ী কেন্দ্র কাজ করে। কেন্দ্র না হলে কোনকিছু একস্থানে মিলে শক্তি প্রকাশ করতে পারে না। তাহলে দেখা গেল, কেন্দ্রধর্মী কেন্দ্রীন বিভাজনে শক্তি সৃষ্টি হয়, আবার কেন্দ্রীন সংযোজনেও শক্তি সৃষ্টি হয়। হাল্কা কেন্দ্রীন সংযোজনের ফলে যে ভারী কেন্দ্রীনের শক্তি প্রকাশ পায়, তেমনি শক্তি সূর্যেও সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর ভারী কেন্দ্রীন বিভাজনের ফলে যে শক্তি সৃষ্টি হয়, সেই প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয় পরমাণু বোমা প্রস্তুত করতে, পারমাণবিক চুল্লীতে (atomic reactor)।

শক্তির বিনাশ হলে বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। একটা বস্তুকে পোড়ালে মনে হবে বস্তুটি বিনাশ হল। আসলে তা শক্তিতে রূপান্তরিত হল কার্বন-ডাইঅক্সাইড (Carbon dioxide) গ্যাসে, জলীয় বাষ্পে (Water Vapour) এবং ভস্ম ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যে। বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে পরে আবার ঠাণ্ডা হয়ে নানা বস্তুতে রূপ পাল্টায়। এইসব বস্তুর ভর আগের না পোড়া বস্তুর ভরের সমান। কেন্দ্রীন বিভাজনে যে শক্তি পাই তাকে আমরা শক্তি বলব, যেমন শূন্যে পাখা নাড়লে অথবা অন্য কারণে যে হাওয়া পাই তাকে বাতাস বলি। এই শক্তি ও বাতাসকে আমরা অনুভব করতে পারি। আকাশ শক্তিতে গড়া, সেই আকাশ বায়ুতে ভরা বললেও তাদের আমরা শক্তি বলি না, বায়ু বলি না। এই দুটি ধারা প্রাকৃতিক সৃষ্টিতে কাজে লাগে। এই ধারার মধ্যে কেন্দ্রীন বিভাজনের শক্তি প্রকাশ পায় বলে দুটিকে এক শক্তি ধরলে বিজ্ঞানের শক্তির হিসাব ভুল হবে। তেমনি ভুল হত তরল জল বাষ্প হলেও বাষ্পকে জল ভাবা, বা জলকে বাষ্প ভাবা। যদিও দুটির মধ্যে জল দুটিভাবে আছে।

একটা বস্তু পৃথিবীর অভিকর্ষে পৃথিবীর উপরে পড়ে। কারণ তার নিজস্ব আকাশ নাই। চন্দ্রের নিজস্ব আকাশ আছে বলে পৃথিবীর বুকে পড়ে না। কিন্তু ক্ষুদ্রতার জন্য পৃথিবীর কাছে বাঁধা পড়ে আছে। আবার যুগ্ম তারকার দুটি তারকা প্রায় সমপর্যায়ের বলে উভয় উভয়ের চারদিকে ঘোরে। বস্তু আকাশে দাঁড়াতে পারে না, পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে। তাকে এই অভিকর্ষ থেকে বাইরে আনলে তার নিজের কেন্দ্রের আকর্ষণ বিকর্ষণে আকাশের মত অন্তত একটা আবরণ সৃষ্টি করতে পারত। বস্তু ভাবাকারে ক্ষয় হলে আকাশ সৃষ্টি হয়। চন্দ্রের সেই আকাশকে শোষণ করে পৃথিবী। সেই ক্ষীয়মান আকাশকে আবার পূর্ণ করে চন্দ্র।

এই যোগাযোগ চলছে আকাশ পথে মসৃণতার জন্য। তাই চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে পারছে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরতে পারছে। পৃথিবীর পরে সে মসৃণতা নাই বলে একটা বস্তু পৃথিবীর পরে গড়িয়ে চলতে পারে না। কিন্তু বস্তুর মধ্যে ইলেকট্রনের আকাশে চলার মসৃণতা আছে বলে ইলেকট্রন ঘুরতে পারে। যখন যেমন মোড় নেয়ার দরকার হয়, আকাশ সেইভাবে অবনমিত হয়ে পথ চলতে সাহায্য করে। এখানে পদার্থের জাড্য নিয়ম (Low of Inertia) প্রায় থাকে না। বস্তুতে এই শক্তির অভাব ঘটলে বস্তু জাড্য অবস্থায় থাকে।

বিজ্ঞানে দুইভাবে ভরের (mass) ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমভাবে বস্তুর পদার্থের পরিমাণকে বলা হয় ভর। দ্বিতীয়ভাবে কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে, তার মধ্যে যে পরিবর্তন আসতে চায় কিন্তু জাড্যগুণের জন্য সেই পরিবর্তন বাধা পায়। বস্তুটির এই গুণকে বলে ভর। একটা ভারী পাথরকে ঠেলে ফেলতে যে শক্তির প্রয়োজন সেই পাথরটি দশগুণ ভারী হলে সেই শক্তির তুলনায় দশগুণ শক্তি বেশি প্রয়োজন হবে তাকে ঠেলে ফেলতে। এই ভরকে বলে জাড্যগুণজনিত

ভর বা inertial mass।

কোন বস্তুর উপর শক্তি কাজ করলে বেগ ক্রমে ত্বরান্বিত হতে থাকে। কোন বস্তুর চলার দিকে বলটি কাজ করতে থাকলে বেগ ত্বরান্বিত হয়। এই নিয়ম থেকে আমরা ত্বরণের (acceleration) ধারণা পাই। আবার ত্বরণকে বলা হয় প্রতি সেকেণ্ডে বেগের পরিবর্তন। সেই কারণে তার একক হিসাবে দূরত্ব প্রতি "বর্গ সেকেণ্ডে" ব্যবহার করা হয়। বল, ভর ও ত্বরণের সম্বন্ধ পাওয়া যায় নিউটনের গতিতত্ত্ব থেকে। বল ও ত্বরণের অনুপাত হল ভর। এই ভরের একক সি. জি. এস পদ্ধতিতে (সেন্টিমিটার গ্রাম সেকেণ্ড পদ্ধতি) হল গ্রাম।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে জানা যায় বস্তুর বেগ বাড়লে তার ভর বেড়ে যায়। আবার ভর কম হওয়ায় গতি বেড়ে যাবে ত্বরণ বেশী হওয়ায়। একই সমতল ভূমিতে একটা মারবেলগুলি, একটা টেনিস বল এবং একটা কামানের গোলা—এমনি বিভিন্ন ভরের বস্তুর উপর একই রকমের আঘাত করলে বিভিন্ন দূরত্বে ছিটকে যাবে। মারবেলের ভর সবচেয়ে কম হওয়ায় সবচেয়ে বেশি ত্বরণের জন্য সবচেয়ে দ্রুত যাবে। তিনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভরের বস্তু কামানের গোলাটি সবচেয়ে মন্দ গতিতে যাবে। এইরূপ ভরকে জাড্যজনিত ভর বা inertial mass বলা হয়। তবু ঐ তিনটি বস্তু একমাপের হলেও সূক্ষ্মে বস্তুভেদে ভর ভিন্ন।

স্থূলত্বে এই তিনটি বস্তুকে যদি একই উচ্চতা থেকে একই সময়ে ফেলে দেওয়া যায়, তবে তারা একই সময়ে মাটিতে পড়বে। এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে নিউটনের পতনশীল বস্তুতত্ত্বের মধ্যে। এই পতনের জন্য তাঁর পূর্বসূরীদের গবেষণালব্ধ ফলকে আরও বিশদভাবে পর্যালোচনা করে একটা তত্ত্ব খাড়া করেন। এই মহাকর্ষতত্ত্ব (Low of Gravitation) তাঁর মাথায় খেলে যায় গাছ থেকে আপেল পড়া দেখে। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুকণা প্রত্যেক বস্তুকণাকে আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণের মান হল, বস্তুকণা দুটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক (directly proportional) এবং এদের আভ্যন্তরিক দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক (inversely proportional)।

মহাকর্ষতত্ত্বে মনে রাখতে হবে এই বিশ্বের যেকোন আয়তনের বস্তুর ভর আছে। আর সেই ভর বস্তুর কেন্দ্রে অবস্থিত। এই বিন্দুর নাম ভার কেন্দ্র (centre of gravity)। আর বিশ্বের সব বস্তুকে ভাবতে হবে ভর বিন্দু বা mass point। এই কারণে যে অভিকর্ষ সৃষ্টি হয়, তার জন্য পৃথিবীর উপরের বস্তু ক্রমবর্ধমান বেগে পৃথিবীর দিকে ত্বরণ হয়। তাকে বলা হয় অভিকর্ষ ত্বরণ (acceleration due to gravity)। এই অভিকর্ষ না থাকলে দাঁড়িপাল্লার কোন প্রয়োজন হত না। এখানে অভিকর্ষ কাজে লাগছে। আবার অভিকর্ষ কাজে লাগে না, সমতলে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকার সময় তার জাড্যগুণজনিত ভরের মান বের করতে। এখানে অভিকর্ষ গাড়িটিকে মাটিতে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাতে তার মানের

কোন পরিবর্তন হচ্ছে না।

বস্তু অনুযায়ী জ্ঞান গড়া যায়, আবার জ্ঞান অনুযায়ী বস্তু গড়া যায়। একটা বাড়ি করতে জ্ঞান অনুযায়ী ইট সাজিয়ে বাড়ি গড়া যায়। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রে বস্তু অনুযায়ী জ্ঞান গড়তে হয়। কারণ সেখানে আমাদের হাত নাই। ছোট সমতল ভূমিতে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি চলে। সেখানে নির্ভুল ভাবে বলে দেওয়া যায়, দুটি বিন্দুর ভেতর ক্ষুদ্রতম রেখাটি হল সরলরেখা। একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রি। এই হিসাব সমতলে সত্য হলেও গোলাকার পৃথিবীর ক্ষেত্রে সত্য নয়। ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপের কোন দেশে সরলরেখায় যেতে হলে মাটি ভেদ করে যেতে হবে, কারণ পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার।

এক্ষেত্রে সরলরেখায় যেতে গেলে সরলভাব আর থাকে না। বক্রভাব হয়ে যায়। এ বক্রতার হিসাব সমতলের জ্যামিতিতে চলে না। তাই গন্তব্যে যেতে হলে পৃথিবী ভেদ করে সরলরেখায় না গিয়ে সুবিধা মত সরলরেখায় পৃথিবীর মাটির উপর দিয়ে যেতে হবে। এইটাই হচ্ছে প্রাকৃতিক সরলরেখা। তাই জ্ঞানের ইউক্লিডীয় জ্যামিতির হিসাব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রে ভুল হয়ে যায়। এই ভুলই আইনস্টাইনকে স্পর্শ করেছিল। তাই তিনি এই জ্যামিতির হিসাব ছেড়ে দেন। আলোকে আমরা সরলরেখায় চলতে দেখলেও, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় বেঁকে যায়। এই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে আলোর যে বক্রপথ, তাই সহজ পথ। কোথাও বস্তুর আধিক্য ও মহাকাশের ঘনত্বের আধিক্য হেতু তাকে বক্র পথে চলতেই হয়। বস্তুর প্রভাবশূন্য তাই শুধু শূন্য নয়, সেও বস্তুর চলার পথকে বাঁকাতে পারে। বস্তু তাই শুধু বস্তু নয়, সে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে শূন্য হচ্ছে।

এইসব জটিলতার জন্য বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে তেমন কাজ হল না দেখে আইনস্টাইন ১৯১৬ সালে প্রকাশ করেন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ। তাঁর ক্ষেত্র সমীকরণের দ্বারা মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের বাস্তব অস্তিত্ব এবং মহাকর্ষ ক্ষেত্রের কোন স্থানে একটা একক ভরের (unit mass) উপর কি ধরণের ক্রিয়া হবে অর্থাৎ ভরটির গতির দিক ও বেগ জানা যায়। অবশ্য ম্যাক্সওয়েলের ক্ষেত্র সমীকরণের (field equation) দ্বারা জানা যায় বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রের বাস্তব গঠন কেমন এবং মহাকাশের যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ঐ ক্ষেত্রের শক্তি কেমন।

বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রের বেলায় শক্তি তরঙ্গের আকারে যায় তাই তাকে বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ (electromagnetic waves) বলে। এই বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গের মধ্যে পড়ে রেডিও তরঙ্গ, তাপ, আলো, এক্স-রশ্মি সহ সমস্ত বিকীর্ণ শক্তি। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে বলা হয়েছে, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের বেলাতেও মহাকর্ষীয় তরঙ্গ (gravitational waves) কাজ করে। মহাকর্ষের প্রভাব একস্থান থেকে অন্যস্থানে আলোর বেগে এবং তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত

হয়। বৈদ্যুতিক আধানে অর্থাৎ তামার তারে কিংবা যে কোন ভাল বিদ্যুৎ পরিবাহীতে (electrical conduclor। যেমন বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়, তেমনি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বস্তুর ভরের উপর কাজ করে। তবে এই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ শক্তি দুর্বল।

নিউটনের তত্ত্বের দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যার সমস্যাগুলির (astronomical problems) সমাধান করা যায়, তেমনি আইনস্টাইনের তত্ত্বের দ্বারাও করা যায়। যদি সব ক্ষেত্রে একই রূপ হত তবে নিউটনের সহজ তত্ত্ব ছেড়ে কেউ আইনস্টাইনের জটিল তত্ত্ব নিত না। তবে কয়েকটি ঘটনার উত্তর খুঁজতে আইনস্টাইনের তত্ত্ব ফলপ্রসূ হওয়ায় নিউটনের তত্ত্ব খারিজ হয়ে যায়। তবু বলতে হবে আইনস্টাইনের তত্ত্বে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বে আসা যাবে না। আপেক্ষিকতাবাদেও সবকিছু প্রমাণ হবে না এই কারণে যে, এই মতবাদ সবার দৃষ্টিকে কেন্দ্র থেকে সরিয়ে এনে বাইরে টানছে। অর্থাৎ কেন্দ্রের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক না রেখে ক্ষেত্রে টেনে আনছে। ক্ষেত্রে একটার সঙ্গে আরেকটার সম্পর্ক বা আপেক্ষিকতা ভাল চলে, কেন্দ্রের তেমন চলে না। বিজ্ঞানীরা যখন বললেন ভর কেন্দ্রের উপর নির্ভর করে, তখনও আপেক্ষিকতাবাদ সেদিক যেতে পারল না। তাই নিউটনীয় তত্ত্বের স্থানে আপেক্ষিকতাবাদ দাঁড়ালেও, সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। তাই তার স্থানে দাঁড়াতে চায় কেন্দ্রবাদ।

অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা, বিগ ব্যাঙের জন্য ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুরা পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বলে আকাশকে আলোকিত করতে পারে না। তা ঠিক নয়। আলোকিত করতে পারত না, যদি তারা আলোর বেগে ছুটতে পারত। বস্তুর পক্ষে সে বেগ পাওয়া সম্ভব নয়। সেই ধারণায় বরং রাতের আকাশ আলোকিত থাকা উচিত। নইলে এক সূর্য যেখানে এত আলো দেয়, সেখানে অসংখ্য নক্ষত্র কেন আকাশকে আলোকিত করতে পারে না ?

যখনই আমরা দেখি, ভাবতে হবে আমরা অন্ধকারের মধ্যে আছি। অন্ধকারের মধ্যে থাকি বলেই কোন আলো বস্তুকে দেখায়। আলোর মধ্যে থাকা মানে বস্তুর কণিকাদের জটলার মধ্যে থাকা। সেই আলোর মধ্যে থেকেও কোন কিছু দেখতে হলে আপেক্ষিক অন্ধকারের মধ্যে থাকতে হবে। অন্ধকারে একমুখী ধারা থাকে, বলে আলো সৃষ্টি হয় না। আলো জ্বাললেই সেই ধারার সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বলেই আলো দেখি। যেখানে সেই একমুখী ধারাও নেই সেখানে আলো জ্বলবে না। ধারা বস্তুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকার সৃষ্টি। এই কণিকারা যখন আরও ভেঙ্গে বাষ্পের স্তরও পেরিয়ে আকাশের পর্যায়ে ভাব সৃষ্টি হয়, তখন আলোক সৃষ্টির সংঘাতের উপযুক্ত থাকে না। তাই নির্মল আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। বস্তুময় সংঘর্ষের আকাশ আলোকময়।

মণি অনুযায়ী আমরা বস্তু দেখি। এই বস্তুকে দেখার জন্য সেই দিকে আলো চললে বস্তুটিকে দেখি, কিন্তু তার পাশের আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। পুকুর ধারের একটা ঘর

থেকে সংকীর্ণ পথে একটা আলো এসে পুকুরের জলে পড়লে, তার প্রতিফলন বেশ জোরদার হয়ে বিপরীতমুখী যে দাঁড়িয়ে থাকবে তার চোখে পড়বে। প্রতিফলনের শক্তি সরাসরি আলোর শক্তির চেয়ে বেশি মনে হবে, জলের মসৃণতার ঠেলার জন্য। আলোর সরাসরি আসতে অনেক বাধা। প্রথম আলোর উৎস যেখানেই থাক না কেন, রাস্তায় প্রতিমুহূর্তের সংঘর্ষে আলো সৃষ্টি হতে হচ্ছে। উৎসের জোরে কণিকার গতি কিছুটা ঠিক থাকে। বস্তুর গায়ে যে আলো আমরা দেখি, যে পথে সেই আলো গিয়েছে, সেই আলোকে দেখি না। বস্তুর সংঘর্ষে বস্তুর গায়ের আলোতে জোর হয়। শূন্যে আপেক্ষিক অন্ধকার বিরাজ করতে থাকে তখনও। অথবা আপেক্ষিক আলো বিরাজ করতে পারে, আবহাওয়ায় যদি বস্তু কণা থাকে। বস্তু আলো প্রতিফলিত করে, আবার বস্তু কুয়াশা অথবা ধোয়াশা হলে আলো রুদ্ধ করে। যদি ধোয়াশা অথবা কুয়াশা আলোর গতি অনুযায়ী চালু থাকত, তবে আলোক কণিকার গতি বোঝা যেত। ফলে আলো পরিষ্কার হত খানিকটা। ধোয়াশা ও কুয়াশায় আলো বাধা পেলে আলোর উৎসকে বড় দেখায়। চাঁদকে গাছের আড়াল থেকে দেখলে বড় দেখায়।

ঘরের সেই আলোটাকে যদি বাইরে আনা যায় তবে আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। সে আলো পুকুরের জলকেও আলোকিত করবে, কারণ জল বস্তু। কিন্তু সেই পুকুরের এপারে আলোর বিপরীত দিকে যে কোন মানুষের চোখে শক্ত হয়ে প্রতিফলন আসবে। অথচ সর্বত্র সেই আলোর বিস্তার। এর জন্য দায়ী তার ছোট চোখের মণি। তার পাশে আর একজন দাঁড়ালে সেও চোখে দেখবে একই রকম আলোর প্রতিফলন আসছে। এই দুজনের চোখে আসা প্রতিফলন একরকম দেখা গেলেও এক প্রতিফলন নয়। দুজনের চোখে দুই প্রতিফলন। তবু পরস্পরের প্রতিফলন পরস্পর দেখতে পাচ্ছে না। পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টিপথে তাকালে দেখতে পাবে অন্ধকার। দুজনই ভাববে, এই প্রতিফলন শুধু তারই চোখে পড়ছে। অপরের চোখে পড়েনি। তার দৃষ্টিপথ অন্ধকার। এমনি দুজন কেন, লাইন দিয়ে যত লোককেই দাঁড় করানো যাকনা কেন, সবাই ভাববে আলো প্রত্যেকের নিজের নিজের চোখে পড়েছে, আর কারো নয়। চোখের মণি গোলাকার না হয়ে যদি চওড়া হত প্রতিফলনও সবার চোখে বড় দেখাত।

আলো কিন্তু পুকুরে সমানভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, সবাই নিজের নিজের মত প্রতিফলন নিচ্ছে। সবাই সমান প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছে যেমন রেডিওতে গান হলে সবাই একই গান শুনতে পায় আলাদা আলাদা ভাবে। অথচ কেউ কারো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তেমনি রাত্রে পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে সবাই একটা তারাকে দেখছি সমানভাবে। সমানভাবে সে সবার চোখে আলো দিচ্ছে, তবু সে আলোতে তাদের অঞ্চল আলোকিত হচ্ছে না। তেমনি ভাবে অঞ্চল আলোকিত হলে তারাকে অত উজ্জ্বল দেখাত না। চোখের মণিকে যত উজ্জ্বল করে সে তারা, পৃথিবীর

মাটিকেও সে সেই পরিমাণ উজ্জ্বল করে না অমসৃণ স্থানের জন্য। চোখের মণি ছোট হওয়ায় তার উজ্জ্বলতায় ছোট হয়ে সমগ্র ভাবে ধরা দেয়।

আমরা সূর্য দেখি, রৌদ্র দেখি কণিকাদের চাঞ্চল্যের মধ্যে। বস্তু হিসাবে আকাশে কণিকা ছড়িয়ে থাকায় আলোও ছড়িয়ে থাকে। তখনও আমরা অন্ধকারে থাকি। সে অন্ধকার থাকে চোখের কালো তারায়। সেই কালো তারার আকর্ষণে আমরা সূর্য দেখি, রৌদ্র দেখি। সেই দেখা শরীরের মধ্যে বিকর্ষণে উপলব্ধি করি। মনের এই বিকর্ষণ আরো চিন্তার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন দেখায়। তাও এক ধরণের আলো। সে আলো অনেক সূক্ষ্ম। সেখানে অক্সিজেনের চেয়ে আরও সূক্ষ্ম অনুঘটক এসে আঘাত করে সে আলো জ্বালতে।

ডাইন দিকে ঢিল ফেললে ডাইন দিকের লোককে মারা যায় বাম দিকে ঢিল ফেললে বাঁম দিকের লোককে মারা যায়। কিন্তু আলো শব্দ ইত্যাদি গোলাকারে উৎপন্ন হয় বলে সবদিকের লোক জানতে পারে। একটা কথা যে দিকেই ফিরে বলা হোক না কেন, কম বেশি সবাই পুরো কথাটা শুনতে পাবে। ডাইন দিকে ফিরে বললে ডাইন দিকের লোক বেশি শুনতে পেলেও বামদিকের লোকও সেই কথাটা আস্তে হলেও পুরো শুনতে পাবে। পুকুর ধারের আলো এবড়ো খেবড়ো হলে সবাই সমান ভাবে প্রতিফলন পেত না। আলো নিজে কেন্দ্র হয়ে চারদিকে ছড়ায় বলেই চারদিকের বস্তু পায়। কেন্দ্রভিত্তিক বস্তুর প্রতিফলন সবদিকেই সমান। কারণ গোলাকার বস্তুর সব স্থান উন্নত বা উঁচু স্থান। এই গোলাকার ছাড়া যে কোন আকার সমান উঁচু হয় না। একদিকে নিচু অন্যদিকে উঁচু হতেই হবে। তাই তার গতি ছোঁড়া ঢিলের মত বিশেষ দিকে যায়।

আলোক কণিকা পৃথিবীর মত গোলাকার। তাই কোন কারণ না ঘটলে যে কোন একদিকে সরে না। তাদের মধ্যে শক্তির ভর আছে। তাদের যে দিকে চালনা করা যায় সেদিকে চলে। আর বাইরের চাপ তাদের বিস্ফোরিত করতে থাকে, ফলে সবাই গোলাকারে আলো ছাড়তে থাকে সংঘর্ষে। সংঘর্ষ ছাড়া আলো হয় না। গ্যাস সিলিণ্ডারে গ্যাসীয় তরল ভরা থাকে। তাতে আগুন ভরা থাকে না। তারা সংকীর্ণ পথে বেরিয়ে আবহাওয়ার বিশেষ বিশেষ কণিকায় ঘা খেয়ে আলো প্রকাশ করে।

উনিশ

উদ্দীপিত নিঃসরণ তত্ত্ব (Theory of Stimulated Emission) হল শক্তির নিঃসরণ। এই শক্তি নিঃসরণ হয় পরমাণু থেকে। ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিলেটাসের থেলস (Thales of Miletus) প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপায় আবিষ্কার করেন। গ্রীক ভাষায় ইলেকট্রনের মানে হল অ্যাম্বার। তিনি হলদে রঙের স্ফটিক জাতীয় এই অ্যাম্বারকে (amber) কিছু দিয়ে ঘসে দেখলেন যে, তার গায়ে কাগজের

টুকরো ধরলে লাফিয়ে উঠে লেগে যায়। সেই ইলেকট্রন বা অ্যাম্বার থেকে এই শক্তির সৃষ্টি বলে তাকে বলা হয় ইলেকট্রিসিটি। এই ধরণের শক্তি এখন দেখতে পাওয়া যায় একটা কাচের কি এবোনাইটের কি রেজিনের কি ঐ জাতীয় কোন বস্তুর উপর ফ্লানেল কিংবা সিল্কের কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঘষলে।

আগে ধারণা ছিল বিদ্যুৎ হল অবিচ্ছিন্ন তরল বা বায়বীয় পদার্থ। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্টোনে (Stoney) বললেন, বিদ্যুৎ সে সব কিছু নয়, বিদ্যুৎ হল টুকরো টুকরো বস্তুর সমষ্টি। যার নাম ইলেকট্রন। এই এক একটি ইলেকট্রন হল এক একটি ইউনিট। দু হাজার বছরের বেশি সময় ধরে মানুষের ধারণা ছিল বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ হল পরমাণু। তাকে আর ভাঙ্গা যায় না। তাকেও পরে ভেঙ্গে ইলেকট্রন বের করা হল। স্টোনে ইলেকট্রনের সঠিক বিবরণ দিতে না পারলেও পরে জানা যায় ইলেকট্রন শুধু বিদ্যুতের ক্ষুদ্রতম অংশ নয়, বস্তুরও ক্ষুদ্রতম অংশ।

হাইড্রোজেন পরমাণুতে আছে গ্যাসের বৈশিষ্ট্য, অক্সিজেনের পরমাণুতে আছে গ্যাসের গুণ ইত্যাদি। জগতে যত রকম পদার্থ আছে, তত প্রকারের পরমাণু আছে। তাই স্বভাবতই পরমাণুতে পদার্থের গুণ থাকে। পরমাণু একই হলে একই পদার্থ সৃষ্টি হত। যখন পরমাণুর ইলেকট্রনে আসা গেল, তখন দেখা গেল সৃষ্টির সব ইলেকট্রন একই বস্তু। তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। একটা পরমাণুর আকার ইলেকট্রনের চেয়ে এক লক্ষ গুণ বড়। পরমাণুর আয়তন (Volume) ইলেকট্রনের চেয়ে ১০ কোটির কোটি গুণ বড়। তাহলে দেখা গেল, যত ক্ষুদ্রের দিকে যাওয়া যায়, সেণ্টারের প্রভাব ঠিকমত প্রকাশ পায়। তাই সব ইলেকট্রনের চরিত্র এক।

পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠনের বিষয়ে টমসন, রাদার ফোর্ড দেখলেন, পরমাণু বৈদ্যুতিক ভাবে নিরপেক্ষ (neutral)। সেই পরমাণুর ভেতরে ঋণাত্মক ইলেকট্রন থাকলেই, তাকে প্রশমিত (neutralize) করবার জন্য সমপরিমাণে ধনাত্মক বিদ্যুৎকে থাকতেই হবে। তাই মনে করলেন, ধনাত্মক আধানগুলি মেঘের মত পরমাণুর ভেতরে ছড়িয়ে আছে, আর তাতে ইলেকট্রনগুলি ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। এই সমস্যার মধ্যে প্লাঙ্কের কণাবাদের (quantum theory) সাহায্যে ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন আলোর কণারূপ প্রতিষ্ঠিত করলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রাদার ফোর্ড বললেন, ধনাত্মক বিদ্যুতাহিত হল কঠিন একটি বস্তু আছে, তার নাম কেন্দ্রীন। পরমাণুর সমস্ত ভর সেই কেন্দ্রীনে অবস্থান করে। এই কেন্দ্রীনে থাকে প্রোটন, এবং তার বাইরে ঘোরে ইলেকট্রন। এই দুটি হবে সমসংখ্যক। এই ইলেকট্রনের সংখ্যার তুলনায়, কেন্দ্রীনের ভেতরের কণিকার সংখ্যা যদি বেশি হয়, তবে ইলেকট্রনের সমসংখ্যক কণিকাদের প্রোটন বলতে হবে, বাকীগুলিকে বলতে হবে নিউট্রন। তেমনি ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীনে আছে ৯২টি প্রোটন ও ১৪৬টি নিউট্রন। কেন্দ্রীনের বাইরে আছে ৯২টি ইলেকট্রন। কেন্দ্রীনের আধান ও তার বাইরের প্রতিটি

ইলেকট্রনের আধান বিপরীতধর্মী বলে তাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে। ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন থেকে শক্তি বেরিয়ে আসতে থাকলে এক সময় ইলেকট্রন কেন্দ্রীনের উপর পড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় না। কেন্দ্রবাদ অনুযায়ী শক্তি শেষ না হওয়ার কারণ কেন্দ্রভিত্তিক (কেন্দ্রীনভিত্তিক নয়) আকর্ষণ বিকর্ষণে পূরণ হয়। পরমাণুকে উত্তপ্ত করলে কেন্দ্রীনের ভেতরে উত্তাপ সৃষ্টি হলে উনানে হাড়ির ভাত ফোটার মত ফুটতে থাকে। ফলেই সেই ভাতের মত ইলেট্রন ওঠা নামা করে। উঠে নামার সময় কিছু শক্তি ছেড়ে নেমে যায় নিজের বা অন্য কক্ষে। এক শক্তি থেকে অন্য শক্তিতে মোড় নিতে হলেও শক্তি বেরিয়ে আসে। উষ্ণতা যত বাড়তে থাকে উচ্চতর মানের ফোটন অর্থাৎ হলদে, সবুজ, নীল, বেগুনী, ইত্যাদি রঙের আলোর ফোটন নির্গত হতে থাকে। ইলেকট্রন নিজেও আলোক প্রকাশ করে, আবার পরমাণুর কেন্দ্রে ফিরে যাওয়ার সময় তার পরিত্যক্ত বাষ্প ও আলোক প্রকাশ করে।

ইলেকট্রনের যমজ বলা যায়, এমন একটি কণিকা ডিরাক গাণিতিক সূত্রে প্রমাণ করেন। তাকে তখন বলা হল বিপরীত ইলেকট্রন (anti electron)। সর্বপ্রকারে তা ইলেকট্রনের মতই, পার্থক্য শুধু বিদ্যুৎ আধানের প্রকৃতিতে। ডিরাকের সূত্রমত সেই বিপরীত ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ আধান ধনাত্মক, ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ আধান ঋণাত্মক। ডিরাক তাঁর বিপরীত ইলেকট্রনের নাম দেন পজিট্রন (positron)।

মহাজাগতিক রশ্মির ও জাগতিক রশ্মির ইলেকট্রন নিজের নিজের স্থানের চরিত্রে নির্মিত হয়েছে। মহাজগতের পজিট্রন পৃথিবীর পরে ধনাত্মক, আর পৃথিবীর ইলেকট্রন তো ঋণাত্মকই। এই দুয়ের সংঘর্ষে বিজ্ঞানীরা সৃষ্টি করলেন শক্তির ফোটন। ফলে সেই দুটি বস্তু কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে গেল। আইনস্টাইনের তত্ত্ব মতে এই ফোটনের সৃষ্টি। এমনি ভাবে বিজ্ঞানীরা বিপরীত বস্তুর (anti matter) সন্ধান করতে গিয়ে পেয়ে গেলেন বিপরীত প্রোটন, বিপরীত নিউট্রন ইত্যাদি। এইভাবে কণিকার তালিকা বড় হয়ে চলেছে।

এইভাবে কণিকার তালিকা বেড়ে যাওয়ায় হাইজেনবার্গ একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের আবিষ্কারের চেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিলেন। তিনি বললেন, "এইসব কণিকার উপরে নানা প্রকার শক্তির ক্ষেত্রের জটিল ক্রিয়া কাজ করছে। সেই জন্য এটি বোধগম্য হওয়া কঠিন, কি প্রকারে তাদের নানা আচরণ বিধিতে একটা বিশিষ্ট সহজ তত্ত্বের দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে।"

হাইজেন বার্গের এই মন্তব্য সত্য। এক ক্ষেত্রের সঙ্গে অন্য ক্ষেত্রকে মেলানো সম্ভব নয়, যে হারে পরমাণুর তালিকা বেড়ে চলেছে। তাদের প্রভাবজনিত ক্ষেত্রও আলাদা আলাদা। তাঁর মতে আলাদা আলাদা ভাবে পরমাণু আবিষ্কার করতে হবে, এবং আলাদা আলাদা ভাবেই তাদের ক্ষেত্র বিচার করতে হবে। কিন্তু তা

করতে গেলে পদার্থ বিজ্ঞান ক্রমে ক্রমে জটিল হয়ে পড়তে থাকবে। এই দুই মতবাদীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছে।

এই বিতর্কের মধ্যে একমাত্র পথ দেখাতে পারে একীভূত কেন্দ্রতত্ত্ব। এই তত্ত্ব জগতের সমস্ত বস্তুকে, আকাশকে, ধর্মকে, রাজনীতিকে, গণনীতিকে, আলোকে, অন্ধকারকে, সময়কে, ভাবকে এক করতে পারে। জগতের যা কিছু দেখতে পাই, বুঝতে পারি সবই এক সূত্রে বাঁধা। এক বস্তু শক্তির ঘোড়ায় চেপে অন্য বস্তুতে চলে যায়, এতো আমরা বিজ্ঞান জগতে হামেশাই দেখতে পাচ্ছি। বিশেষজ্ঞ পদার্থবিজ্ঞাবিৎ (experimental physicist) রাদারফোর্ড ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখান, রেডিয়ামের মত একটা স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্ক্রিয় (spontaneously radioactive) পদার্থ থেকে নির্গত উচ্চশক্তি সম্পন্ন আলফা কণিকা (alpha particle) দিয়ে নাইট্রোজেন পরমাণুকে আঘাত করলে অক্সিজেন পরমাণু সৃষ্টি হয়। তাতে শক্তি মুক্ত (liberated) না হয়ে শোষিত (absorbed) হয়। কিন্তু রাদারফোর্ডের ছাত্র কক্‌ক্রোফ্‌ট (Cockcroft) ও ওয়াল্টন (Walton) একটা যন্ত্র নির্মাণ করে সেই যন্ত্রে শক্তি উৎপাদক পরমাণু বিভাজন প্রক্রিয়ায় সাফল্য অর্জন করেন। তাঁরা দেখান, সেই যন্ত্রের দ্বারা প্রোটন রশ্মিকে অতি দ্রুত বেগবান করে উচ্চ শক্তি উৎপাদন করা হয়। সেই রশ্মির আঘাতে লিথিয়াম পরমাণুকে বিভাজিত করে হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত করা হয়। বোধহয় জ্বালানি সৃষ্টি করতে শক্তি উৎপাদিত হয় অনুঘটক সৃষ্টি করতে শক্তি উৎপাদিত হয় না। হিলিয়াম করতে যে সামান্য ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তা আইনস্টাইনের সূত্র $E = m \times c^2$-এর সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু রাদারফোর্ড দেখে যেতে পারেননি যে, পরমাণু থেকে অপর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তি উৎপাদন হতে পারে। অক্সিজেন সৃষ্টি করতে যে শক্তি শোষিত হয়েছিল রাদারফোর্ডের পরীক্ষায়, সেই অক্সিজেনের শক্তি কিন্তু তাপ উৎপাদন করতে ব্যয় হয়।

এক এক পরমাণুর এক এক গুণ থাকলেও তাদের ইলেকট্রনদের ক্ষেত্রে পার্থক্য নাই। এই ইলেকট্রন থেকে ভাব জগতের শুরু। তাই আকাশের মধ্যেও একাত্মতা আছে। আবার পজিট্রনেএসে শেষ হয়েছে ভরযুক্ত পদার্থের। পদার্থের একাত্মতাও রাদারফোর্ড ও তাঁর দুই ছাত্রের পরীক্ষায় প্রমাণিত হল। রেডিয়াম, আলফা কণিকা ও নাইট্রোজেন পরমাণুর সম্পর্ক আছে অক্সিজেন পরমাণু সৃষ্টির ক্ষেত্রে। প্রোটন রশ্মি ও লিথিয়াম পরমাণুর মধ্যে সম্পর্ক আছে হিলিয়াম পরমাণু সৃষ্টির ক্ষেত্রে। হাইড্রোজেন আবার হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়। এই হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের সম্পর্ক আছে জল সৃষ্টির ক্ষেত্রে। এই জল বরফ হচ্ছে, বাষ্প হচ্ছে। মাটি তো সবকিছুর মিশ্রণ, সেই মাটির সঙ্গে নাইট্রোজেন সার ও জল মিশে ফসল ফলাচ্ছে। তাহলে দেখা গেল সবার সঙ্গে সবার অন্তর্নিহিত সম্পর্ক আছে। প্রতিটি পরমাণুকে আলাদা আলাদা বিচার করলে কোনদিন বিজ্ঞানকে সহজ করা যাবে না। কেন্দ্রতত্ত্বই সবাইকে মেলাতে পারে।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে তিনি বলেছেন, একটা ঘূর্ণনরত থালার কেন্দ্রের কাছে একটা ঘড়ি ও তার ধারের কাছে সেই একই রকমের অন্য একটা ঘড়ি থাকলে দেখা যাবে, ধারের কাছে থাকা ঘড়িটির সময় কেন্দ্রের কাছে রাখা ঘড়িটির সময়ের চেয়ে ধীরে চলছে। এর কারণ কেন্দ্রের কাছের বেগের চেয়ে ধারের কাছের বেগ অনেক বেশি। একই রকমের দুটি ঘড়ির একটিকে সূর্যে ও অপরটিকে পৃথিবীতে রাখলে দেখা যাবে সূর্যের ঘড়ির সময় ধীরে চলছে, পৃথিবীর ঘড়ির সময় তার তুলনায় দ্রুত চলছে। এর কারণ হল সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র পৃথিবীর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। তবু বুঝতে হবে থালার উপরের দুটি ঘড়ি সম্পূর্ণ থালার নির্দেশেই ঘুরছে। সৌরজগতের ক্ষেত্রে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরলেও তাদের নিজের নিজের কেন্দ্র থাকায় সূর্যের ও পৃথিবীর মধ্যে তারতম্য আছে। থালার ঘড়ির মত এখানে সময় বাঁধা নাই।

সময়ের দ্রুত গতি ও মন্থরতার জন্য কখনও থালার কিনারার বেগকে দায়ী করা হচ্ছে, আবার কখনও সূর্যের প্রবল মহাকর্ষ ক্ষেত্রকে দায়ী করা হচ্ছে। সৌরজগৎকে একটা ঘূর্ণনরত থালা ধরলে, তার সেন্টারের কাছে বুধে একটা ঘড়ি ও পৃথিবীতে একটা ঘড়ি রাখলে তো বুধের ঘড়ির সময়ের তুলনায় পৃথিবীর ঘড়ির সময় মৃদু হওয়া উচিত। দেখা যাচ্ছে আপেক্ষিকতাবাদ দিয়ে সব কিছুকে কোনদিন একে বাঁধা যাবে না। আইনস্টাইনও তাই পারেন নি।

সূর্যে সময়ের গতি কম বলে সোডিয়াম পরমাণু থেকে নির্গত আলোর কম্পাঙ্ক কম। সেই তুলনায় পৃথিবীর সোডিয়াম পরমাণু থেকে নির্গত আলোর কম্পাঙ্ক হবে বেশি। তাই তার আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে ছোট। সূর্যের সোডিয়াম পরমাণুর আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে বড়। আসলে পৃথিবীর সোডিয়াম পরমাণুর বর্ণালী হল উজ্জ্বল হলদে রেখা, তবে সেই বর্ণালীকে সূর্যে লাল ঘেঁসা দেখায় কেন? বৈজ্ঞানিকরা বলেন, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনুযায়ী রঙের পরিচয়। সূর্যে সোডিয়াম পরমাণুর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হওয়ায় তার হলদে রঙ লালের দিকে সরে গিয়েছে। এই রঙকে ইংরেজীতে বলা হয় shift towards the red। আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত বড় হবে, তত সেটি লালের দিকে যাবে। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত ছোট হবে তত সেটি ভায়োলেট বা বেগনী রঙের দিকে যাবে। এই রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সব চেয়ে কম। লালের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি।

সমস্ত দাহ্য বস্তু এই সাত রঙের সমবায়ে সৃষ্টি। আদর্শ দাহ্য বস্তু কেরোসিন। তাকে জলে ভাসিয়ে দিলে সাত বর্ণকে জলে ভাসতে দেখা যায়। কাঁচা কালো কয়লা জ্বলতে থাকলে দেখা যায় কালো থেকে স্তরে স্তরে সাত রঙ বেরিয়ে আসছে। সেই সাত রঙের সাদা ধোঁয়া দূরে সরে যাচ্ছে, যদিও তার কাছে হাওয়ার ঠেলায় কালো ধোঁয়া বিস্তার লাভ করেছে। তবু সেই কালো ধোঁয়া বিস্তারিত হতে হতে সাত রঙে আকাশে মিলিয়ে যায়। এই সব রঙকে যদি হাওয়া থেকে আলাদা করে আনা যায় তবে আবার কয়লায় রূপান্তরিত হবে। কালো বস্তুর প্রতিফলন নাই বলে কাছেও কালো দূরেও কালো। তার পরের ক্রম রঙগুলো ক্রম দূরত্বে ক্রম ক্ষুদ্র আর কালো দেখাবে। বেগুনী রঙকে যে দূরত্বে কালো দেখাবে, নীল রঙকে

তার চেয়ে বেশী দূরত্বে কালো দেখাবে। তার চেয়ে বেশী দূরে সবুজ রঙকে কালো দেখাবে। তার চেয়ে বেশী দূরত্বে হলদে রঙকে, তার চেয়ে বেশী দূরত্বে লাল রঙকে কালো দেখাবে। আবার তারা কাছে আসতে থাকলে কত কাছে এলে তাদের নিজের নিজের রঙ চেনাবে, তা অঙ্ক কষে রঙের পরিচয় পাওয়া যায়। সাদার প্রতিফলন সব চেয়ে বেশী বলে সবচেয়ে দূরে চেনা যাবে। কালো সব দূরত্বে কালো। এমন কি দর্শকের চোখের তারাও কালো তাই কালোকে দেখা যায় না পার্থক্যের অভাবে। চোখের কালো মণি দিয়ে দর্শক যে কালোকে দেখতে চায়, দৃষ্টিপথও তার কালো। কালো বস্তু মসৃণ হলে তার প্রতিফলিত আলো দেখা যায়, তবু কালোকে দেখা যায় না। চোখ বুঁজলে অর্থাৎ না দেখলে আমরা কালোতে ডুবে যাই। কালোকে সম্প্রসারিত করে নানা রঙ সৃষ্টি করতে পারলে সেই নানা রঙকে দেখতে পাই কালো মণি দিয়ে। তাই কালো রঙ ও অন্ধকার সবচেয়ে নীরেট। তাকে খুঁচিয়ে সব রঙ ও আলোর সৃষ্টি। কালো না হলে তাই আলো হয় না। আবার নীরেট বস্তু ঠাণ্ডা বেশি। তার সঙ্গে তাই আঁধারের সম্পর্ক আছে। নীরেটকে উস্কিয়ে আলো করলেই নীরেটত্ব হারায়।

কালোর পরে সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে আর সাদা হল তার মাথার আচ্ছাদন। যাবতীয় বিশ্বভুবন এরই মধ্যে চলাফেরা করছে। একটা প্রদীপ জ্বাললে পলতেটা আগে কালো অঙ্গার হয়ে লাল আলো দেয়। এখানে কিন্তু রঙ সরাসরি একেবারে কালো থেকে লাল হয়নি। আমাদের অলক্ষ্যে কিন্তু বেগুনী, নীল, সবুজ, কমলা ইত্যাদি পার হয়ে এসে লাল আলো দেখাচ্ছে। আলোকে কালো অঙ্গার থেকে খুঁচিয়ে বের করে অক্সিজেন। কালোর প্রকাশ নাই বলে অক্সিজেনের অভাবে আলো জ্বলবে না।

লাল শুধু লাল নয়, তাকে লাল হতে অনেকগুলো আলোর স্তর পার হয়ে আসতে হয়েছে। সাদা শুধু সাদা নয় তাকেও আসতে হয়েছে সব আলোর প্রতিফলন পার হয়ে। প্রতিফলনে ছাড়া সব রঙের গুঁড়া মেশালে সাদা রঙ পাওয়া যায় না। প্রতিটি রঙকে চলতে দিতে হবে। চলার গুণে নানা রঙ নানা রঙে পরিণত হয়, আবার সব রঙের প্রতিফলন থেকে ত্রিপার্শ্ব কাচ দ্বারা তাদের আলাদা করে দেখা যায়। আলো একটা বোর্ডের ছিদ্রপথ দিয়ে ত্রিপার্শ্ব কাচ ভেদ করে কোন পর্দায় পড়লে রামধনুর সাত রকম কণিকা তরঙ্গের সাত রঙ দেখা যায় অর্থাৎ তারা বস্তুর কাছাকাছি এল। আবার ঐ ত্রিপার্শ্ব কাচের সাত বর্ণ আর একটা ত্রিপার্শ্ব কাচের ভেতর দিয়ে গেলে সাদা রঙ পাওয়া যায়। অর্থাৎ বস্তু ভাবের দিকে গেল।

পরমাণুকে উত্তপ্ত করলে কিছু ইলেকট্রন বেরিয়ে যায়, কিছু ইলেকট্রন কক্ষ পরিবর্তন করে উপরে এসে বিকিরণ দিয়ে আবার নিজের কক্ষের দিকে ফিরে যায় কেন্দ্রের উত্তাপে শূন্যতার আকর্ষণে। বদ্ধ কৌটার বায়ুর মত যত ইলেকট্রন বাইরের দিকে বেরিয়ে আসতে থাকবে তত শূন্যতার আকর্ষণ বাড়তে থাকবে। সেদিকে বাইরের চাপ এলে আর বিকিরণ হয় না। ফলে আঁধার দেখা যাবে। তখন অন্যদিকে আবার ইলেকট্রনের ওঠা নামার বিকিরণ শুরু হয়ে যাবে।

১১ বছর অন্তর যে সৌর কলঙ্ক দেখা যায় তারও কারণ এই। সূর্যের কোন অংশ থেকে বিকর্ষণে বস্তু শূন্য হলে কিছুদিন আকর্ষণ প্রবল হওয়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। মৃত নক্ষত্রের আকর্ষণের কাছাকাছি এলেও এমনটি হয়। তখন আশেপাশের তুলনায় সেখানে ৩০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা কমে যায়। আকর্ষণ বিকর্ষণের এমনি কারণের জন্য সৌরকলঙ্ক ঘুরে ঘুরে আসে। তবে ১১ বছর অন্তর এর তীব্রতা বেড়ে যায়। তখন এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে বেতার সংযোগ হঠাৎ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। তার কারণ সূর্যের কেন্দ্রে তখন ভীষণ ভাবে বায়ুমণ্ডলের পতন কাজ করতে থাকে।

লাল আলো হল সুষ্ঠু সজ্যবদ্ধ আলো। তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হওয়ার কারণ তার ভারী বলিষ্ঠ শরীর। বলা যেতে পারে এই লাল আলোই সমস্ত আলোর পূর্ণ যৌবনের আলো। অন্যান্য আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হয় বাধা কম বলেই। তাই গতি শক্তিও বেশি।

শ্বেতবামন স্তরে এলে সূর্য শরীরের দিক থেকে বহুগুণ ছোট হলেও ভর থাকবে অপরিবর্তনীয়। কারণ চাপে ছোট হতে থাকার ফলে শক্তি সমান প্রকাশ করতে থাকে। গামছাকে জল থেকে তুললে যে পরিমাণ জল পড়তে থাকে, তাকে নিঙড়ালে ছোট হতে থাকলেও প্রায় সেই পরিমাণ জল পড়তে থাকে ক্রমে চাপ বাড়ায়। তবে তার স্থায়িত্ব বেশি সময় নয়। তবু যত সময় শ্বেত বামনের সেই চাপের ভর শক্তি ঠিক থাকবে, শরীর ছোট হতে থাকায় অভিকর্ষ বল বেড়ে যাবে বিপুল অঙ্কে। গ্রহের শরীরের ওজনও বাড়তে থাকবে নীরেট হওয়ায়।

সাদা রঙের পরে আর কোন রঙ হয় না। সেই দীর্ঘ তরঙ্গের উচ্চতা থেকে একেবারে লাফিয়ে শ্বেত বামন স্তর থেকে কৃষ্ণ বামনে নামে না। সেও নানা রঙের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত কৃষ্ণ বামনের স্তরে নামে জ্বালানী না থাকায়। এখানে তার সূর্যের জীবন শেষ হয়ে গেলেও অন্য জীবন শুরু হয়। কালো কার্বনকে যতই চাপে রাখা যাক, তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি চালিত হতে পারে। সে বিভিন্ন গ্যাসের শোষক। সেই শোষণের গুণ কৃষ্ণ বামনের আছে। কৃষ্ণ বামনের এই আকর্ষণের সঙ্গে পতন শক্তিও কাজ করছে। কৃষ্ণ বামনের আকর্ষণ তো আছেই, আবার তার দিকে আবহাওয়ার চাপ সবকিছুকে ভীষণভাবে ঠেলে দেয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্ত বলেই, সে চাপে অনন্তের চাপ থাকে। বিকর্ষণের তখন বিশেষ সময় পায় না কৃষ্ণ বামন। যে হেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব বস্তু একটু হেলে চলা ফেরা করে সেই হেতু কোথাও না কোথাও বিকর্ষণের পথ পেয়ে যায় সে। সেখানে সংঘর্ষে তার আলো ফোটে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণ আলাদা বলে কিছু নাই। কেন্দ্রবাদ অনুযায়ী সবার সঙ্গে সবার যোগ থাকতেই হবে। শ্বেত বামনের হিলিয়ামরূপী সাদা ছাইতে পারমাণবিক গুণ থাকে। কৃষ্ণ বামনের মধ্যে যে হেতু পরমাণু থাকে না, তার ছাইতে পারমাণবিক গুণ থাকতে পারে না। এবং তা সম্ভবও নয় চাপের জন্য।

তবু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্ত বলে মৃত সূর্য সেই অনন্তে আলাদা হয়ে পড়ে থাকতে পারে না। তাকে কেন্দ্র করে মহাকাশের যে চাপ থাকে সেই অনন্তের সঙ্গে তার

যোগাযোগ ঘটায়। তখন কৃষ্ণ বামন হয়ে ওঠে আর একটা সৌরজগতের কেন্দ্রে। কৃষ্ণ বামনের কালো রঙ নিজে জলে উঠতে না পারলেও হয়তো মহাকাশের চাপে একদিন বিস্ফোরিত হয়ে প্রাণবান হতে পারে। তাছাড়া কৃষ্ণ বামনে আসতে ক্রমান্বয়ে সংকোচনে ক্রমান্বয়ে অনন্তের চাপ আসছিল, সংকোচন শেষ হলে বাইয়ের চাপ কমে যাওয়ায় বিস্ফোরিত হয়ে প্রাণবান হতে পারে।

মেঘনাদ সাহা তাঁর আয়নিত করণ সম্বন্ধে বলেছিলেন, ক্রম বর্ধমান তাপে কঠিন পদার্থ তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয়, সেই গ্যাসীয় পদার্থ ভেঙ্গে সরল যৌগ পদার্থ সৃষ্টি হয়। সেই যৌগ পদার্থ থেকে মৌল পদার্থ সৃষ্টি হয়। এই মৌলিক পদার্থের অণুরা ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে পরমাণু মুক্ত হয়। এই পরমাণু থেকে আবার ইলেকট্রনরা বেরিয়ে যেতে থাকে। এই খণ্ডিত পরমাণুটিকে বলে আয়ন। আবার সেই কৃষ্ণ বামন আবহাওয়ার চাপে আবার পূর্ণ হলে সে আবার তার উত্তাপে পদার্থদের ঘর-সংসার গড়বে ও ভাঙবে। ভাঙতে ভাঙতে আবার আয়নিত হয়ে প্রসার লাভ করবে।

আলো বাতাসের অভাবে বন্ধ ঘরের হাওয়া বেরিয়ে আসতে পারে না। সরাসরি বাইরের আলো বাতাসের সঙ্গে যোগাযোগ হলে হাওয়া বাইরে আসতে পারে। ঘরের ভেতরের বস্তুর আকর্ষণ বিকর্ষণের পরিত্যক্ত বিষাক্ততা তাই ঘরেই জমা হতে থাকে। সেই বদ্ধ ঘর খুললেই বিষাক্ত হাওয়া বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। বদ্ধ নর্দমাতেও এমনি গ্যাস সৃষ্টি হয়। কিছুটা ছিদ্র থাকলেই যে সব গ্যাস বেরিয়ে আসবে তার কোন মানে নেই, ঘরে আবহাওয়ার মধ্যে আবহাওয়ার আকারে বদ্ধ হয়ে থাকে। যেমন অণুর মধ্যে পরমাণু বদ্ধ হয়ে থাকে। গ্যাস ঘোরাফেরা করে কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ যুক্ত বস্তুর ধারে কাছে। বদ্ধ শূন্য কৌটায় বস্তুকণা না থাকার জন্য বিকর্ষণের তুলনায় আকর্ষণ বেশী সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীর আকর্ষণ বিকর্ষণে চারটি পথ দেখতে পাই। একটা হচ্ছে আলোর পথ, যে উৎসের শক্তির ঠেলায় পথ করে চলে। তাই শক্তি ফুরিয়ে গেলে আলোও ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হল পৃথিবীর আকর্ষণের পথ। সে আলোর মত যে কোন দিকে যেতে পারে না। সেখানে কাজ করে ওজনযুক্ত পতন শক্তি। তৃতীয়টি হল বিকর্ষণের পথ। সে পথে যায় হাইড্রোজেন ইত্যাদি হাল্কা বস্তু। চতুর্থ পথটি হল পৃথিবীকে বেষ্টন করে চাঁদ ইত্যাদির ঘোরার পথ। এক এক বেষ্টনধর্মী পথে এক এক ধরণের বস্তু পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। জগতে যত রকমের চলা আছে এই চারটি চলার যে কোন একটির নিয়ম মেনে চলে। এই চারটি পথ আকাশে দেখা যায় না। ঠিক বস্তু হলে ঠিক ঠিক পথ হয়ে যায়। পরমাণুতেও এমনি চারটি পথ আছে।

বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে চলে। সে শক্তি আবার বস্তু নিয়ে চলে অন্য বস্তু সৃষ্টি করতে। বস্তু থেকেই তাই গুণ সৃষ্টি হয়। গুণ ক্ষয় হতে হতে বস্তুও ক্ষয় হয়ে যায়। বস্তুর শক্তির রকমারিত্বে বস্তুর ক্ষয়ের রকমারিত্ব হয়। বস্তুর শক্তি আগুন হলে বস্তুকে শেষ করে ফেলে। শক্তি কমের দিকে গিয়ে অ্যাসিড হলে টক স্বাদ পাই। তারও বস্তু ক্ষয়ের ক্ষমতা আছে। মিষ্টি, নোনতা সবাই বস্তুর ক্ষয়ের

রকমারিত্বের গুণ। ভাব আকারে সবাইকে স্বাদ দেয় তারা। এই স্বাদের গ্যাসই গন্ধ। এমনি গ্যাস সব বস্তু থেকে ভাবাকারে বেরিয়ে যায় আকাশ সৃষ্টি করতে ও ঘন হয়ে বস্তু সৃষ্টি করতে।

কঠিন পদার্থের তুলনায় তরল পদার্থ শূন্য, তরল পদার্থের তুলনায় গ্যাসীয় পদার্থ শূন্য, গ্যাসীয় পদার্থের তুলনায় পৃথিবীর আকাশ শূন্য। তাই প্রত্যেকের মধ্যে প্রত্যেকের উপযোগী শূন্যতা ও পূর্ণতা বাস করে। আবার লোহার আছে চুম্বকত্ব শূন্যতা। তাই লোহার বিকর্ষণকে চুম্বকের শূন্যতা আকর্ষণ করতে পারে। আলোর কাছে অন্ধকার শূন্য। ট্রান্সমিটারের কাছে রিসিভার শূন্য। এই শূন্যতা পূর্ণতাকে গ্রাস করে বলে সেও পূর্ণতা পায় অন্য বিষয়ে। তাই সে অন্য কিছু ছাড়ে অন্য শূন্যতায়। যেমন আমরা নিশ্বাসে অক্সিজেন নিয়ে পূর্ণ হয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ছাড়ি গাছের জন্য। গাছ তাতে পূর্ণ হয়ে আমাদের জন্য অক্সিজেন ছাড়ে। হাওয়াতেই তাই সবকিছু চলাচল করছে ব্রহ্মাণ্ড গড়তে এবং ভাঙতে।

আলো ও আনন্দের চরিত্র একই এবং অন্ধকার ও দুঃখের চরিত্র একই। আনন্দ চরম বিকর্ষিত হলে ব্যালান্স হারায়, যা জলের বা গ্যাসের কণিকার ক্ষেত্রে দেখা যায়। কণিকা হাল্কা হয়ে যত ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকবে, ততই এই চরিত্রের হবে। কেন্দ্রের দিকে আসতে থাকলে চরিত্র বাঁধনের মধ্যে আসে। এই বাঁধন কেন্দ্রে চরম হলে কেন্দ্রের উস্কানিতে বিকর্ষিত হয়। বাইরে এসে হাল্কা হয়ে চরিত্র হারিয়ে ফেলবে। দুঃখও যত গভীর হবে শরীর মন জড় হতে থাকবে। সেই দুঃখ শেষ গভীর কেন্দ্রে গেলে উস্কানিতে ত্যাগের মুক্তি আসে। অর্থাৎ সেই মুক্তি-আনন্দ হয়ে বাইরে বেরিয়ে আত্মহারা হবে। আত্মকেন্দ্রকে হারালে সবার চঞ্চল হতে হয় অন্য আত্মকেন্দ্রের জন্য। কেন্দ্রভিত্তিক, চলা ফেরা ছেড়ে কোনকিছু কল্পনা করা যায় না। চন্দ্র আকর্ষণ বিকর্ষণে যে নিজস্ব আকাশ সৃষ্টি করেছে সেই নিজস্ব আকাশ সহ চাঁদ পৃথিবীর আকাশের চেয়ে হাল্কা বলেই ভেসে আছে। নইলে সে পৃথিবীর বুকে ডুবে যেত। একটা বস্তুর তেমনি আকাশ নাই বলে পৃথিবীর বুকে পড়ে থাকে।

মন্দ গতিতে একটা গাড়ি চলতে থাকলে তার পেছন দিক থেকে দ্রুত গতি সম্পন্ন গাড়ি আঘাত করলে সে গাড়ি দ্রুত গতি পাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িকে সেই একই আঘাত করলে ততখানি গতি পাবে না। কারণ তার মধ্যে কোন চলা ছিল না। এই না চলাই ঘাতক গাড়িটা খানিক শক্তিকে খেয়ে ফেলেছে। তাই আরও বেশি শব্দরূপে শক্তি প্রকাশ করে। তাছাড়া এই দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি না চললেও শক্তি প্রকাশ করে মহাকালের ধারায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে। যে ভাবেই হোক সবারই চলতে হয়েছে, চলতে হচ্ছে ও চলতে হবে। আকর্ষণধর্মী কালো গহ্বরের আকাশ থাকতে পারে না। বিকর্ষণের আকাশ না থাকায় সে কালো ও নিরেট। এই কালো রঙের জন্য নিরেট হয়েও কালো গহ্বরের নিস্তার নাই। কালোর আকাশ না থাকায় সমস্ত শক্তি তাকে সরাসরি খুঁচিয়ে ভাঙবে। তখন কালো রঙ বস্তুসহ নানা রঙে ছড়িয়ে পড়বে।

একটা বস্তুকে আঘাত করলে তা ছড়িয়ে পড়ে বস্তুটির সর্বত্র। সেই বস্তুর

একস্থানে উত্তাপ দিলে সে স্থান থেকে উত্তাপ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শরীরে আঘাত লাগলে মস্তিষ্কের চেতনা চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। জীবের মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতার সঙ্গে বস্তুর আঘাত ছড়িয়ে যাওয়ার সূক্ষ্ম ধারার সম্পর্ক আছে।

পৃথিবীর ধারা যত উপরে উঠতে থাকে, তত প্রসরতার জন্য ধারার কণারা ভাঙতে থাকে কণাদের পথমত। আকাশের ছাঁচে পড়ে কথা সৃষ্টি হয়। পরে অশেষ শূন্য হয় অসীম আকাশের শূন্যতার আকর্ষণে। তখন বস্তুভাব না থাকার জন্য সূর্যের ধারায় আলো ফোটে না। সেই ধারা পৃথিবীর বস্তুর ধারার সঙ্গে সংঘর্ষে রৌদ্র ফোটায়। অথচ সেখানে তখনও অন্ধকার। এই মহাকাশ থেকে কোন বস্তু, গ্রহ উপগ্রহদের সংকীর্ণতায় ঢুকলেই সংকীর্ণতার জন্য সংঘর্ষের আলো বেশি হবেই। মহাশূন্যে আলো না থাকাই প্রমাণ করে বিকিরণহীনতার আকর্ষণ সেখানে বিরাজমান। সূর্যের ধারা এই আকর্ষণের বাঁধন ভেদ করে আসার মত। বাঁধন ঠিক থাকলে সমস্ত শক্তি চারদিকে জমা হয়ে একসঙ্গে ফোটে। তেমনি বোমার মত গতি-শক্তি পায় সূর্যের ধারা। সাবানের বুদবুদের ফেনা যেমন ফেঁপে উঠে ফেটে যায়, তেমনি আলোক কণিকাদের বুদবুদে ফোটন সৃষ্টি হয়ে ফাটতে ফাটতে আলো দেয়। সময়ের সংক্ষিপ্ততা না হলে বিস্ফোরণ প্রচণ্ড হয় না। বস্তুর শক্তিতে রূপান্তরিত হতে সময়ের সংক্ষিপ্ততার উপর নির্ভর করতে হয়। মূলত পৃথিবী বিকর্ষণ করে, আকাশ আকর্ষণ করে। এই আকাশ ও পৃথিবীর চরিত্র প্রাণীর মধ্যে এক সঙ্গে বাস করে বলে নিশ্বাস প্রশ্বাস চালায়। পৃথিবীর ভেতরেও নিশ্বাস প্রশ্বাস চলে, আকাশেও নিশ্বাস প্রশ্বাস চলে। এই দুই নিশ্বাস প্রশ্বাস আকাশ ও পৃথিবীর পরস্পরের নিশ্বাস প্রশ্বাস সৃষ্টি করেছে। নিশ্বাসের স্থূলরূপ বস্তু, আর প্রশ্বাসের সূক্ষ্মরূপ আকাশ।

মহাকাশে শূন্যতার ভাগ বেশি বলেই সব বস্তু চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে। তার কাছে কোন গ্রহকে টেনে আনতে পারলে বস্তুটি সেইদিকে ধাবিত হবে। কারণ বস্তুর কাছে গ্রহের শূন্য এলেই আকর্ষণ বিকর্ষণ সৃষ্টি হয় বলেই চলৎশক্তি ফিরে আসে। তবে সেখানে আন্তগ্রহ বস্তু, আন্তর্নক্ষত্র বস্তু, আন্তর্ব্রহ্মাণ্ড বস্তু থাকলেও মহাশূন্যতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারে না। তবে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যবর্তীস্থানে যে বস্তুরা আছে তাদের প্রত্যেকেই অন্যান্য গ্রহদের মত সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে। সেখানে একটা গ্রহের স্থান হয় না বলে সে স্থান পূরণের জন্য এইসব গ্রহাণু বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় গ্রহিকা (minor planet or asteroid) ঘুরে চলেছে। পূর্বেই বলেছি বস্তু হলেই তার স্থান হয় না, আবার স্থান হলেই তার বস্তু হয় না। অথচ কোন স্থানে অসামঞ্জস্য থাকে না।

সূর্যের নিজস্ব আলো আছে তা আংশিক সত্য। যদি তার আবহাওয়া না থাকত, তবে সূর্যের শক্তি বেরিয়ে এলেও সংঘর্ষের অভাবে আলো ফুটত না। আর এই সূর্যের আলো না থাকলে চন্দ্রের বিকর্ষণের সংঘর্ষে চন্দ্র আলোকিত হত না। আলো যদি সংঘর্ষ ছাড়া ফুটত তবে মহাশূন্য আলোকময় হয়ে উঠত। তবে সেখানে বস্তু ভাবাকারে আছে বলে খানিকটা চক চক করে মাত্র। অন্যান্য তারকা গ্যাসে তৈরি হলেও সূর্য সম্পূর্ণ গ্যাসে তৈরি নয়। তার মধ্যে একটা কাঠামো আছে বলেই তার গ্রহরা নিয়ম মেনে চলে। তাদের দুই মেরু থাকে। তাছাড়া সূর্য যদি শুধু

গ্যাস হত তবে বিশাল বিশাল তারকার সংস্পর্শে ফেটে নিঃশেষ হয়ে যেত। তার কেন্দ্রীয় বস্তুর গ্যাসে তৈরি হতে হয়েছে বলে কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ চালাচ্ছে।

নীহারিকার মধ্যে কঠিন বস্তুর সূক্ষ্ম কণা, কোথাও কোথাও তারাও দেখতে পাওয়া যায় বলে তার মধ্যে গ্যাস হতে বাধ্য। নীহারিকার (nebula) মধ্যে যে সব আন্তর্নক্ষত্র বস্তু (inter-stellar matter) আছে, তাদের প্রধান উপাদান হল হাইড্রোজেন গ্যাস। তাছাড়া নীহারিকার মধ্যে কঠিন বস্তুকণাও থাকে। বস্তুর মধ্যে যেমন আকর্ষণ বিকর্ষণের ঘূর্ণন আছে, তেমনি শূন্যেও ঘূর্ণন আছে। সেই ঘূর্ণনে হয়তো কণারা মিলিত হয়ে হাইড্রোজেন সৃষ্টি করছে। তারা আবার সৃষ্টি করছে সূর্য। নীহারিকার মধ্যে এমনি রূপান্তর ঘটতে ঘটতে আরও বড় সূর্যদের সৃষ্টি করে।

আমাদের সূর্য যে ব্রহ্মাণ্ডে তার নাম আমাদের ব্রহ্মাণ্ড (our galaxy)। এই ব্রহ্মাণ্ডকে পাশ থেকে দেখলে গরুর গাড়ির চাকার মত দেখায়। এই ব্রহ্মাণ্ডে ১০ হাজার কোটি তারা আর নীহারিকা ছাড়াও অন্যান্য বস্তুতে ভরা। এর দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ এক লক্ষ আলোকবর্ষ, আর গড় উচ্চতা পাঁচ হাজার আলোকবর্ষ। আমাদের সূর্য আছে এর কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে। পৃথিবীর দৃষ্টি কোণে দেখা যায় সেই আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র আছে ধনু রাশির (Sagittarius) দিকে। এই আমাদের ব্রহ্মাণ্ডকে সংস্কৃত, বাংলা ইত্যাদি ভাষায় বলে ছায়াপথ বা আকাশ গঙ্গা। ইংরেজিতে বলে milky way galaxy।

এই আন্তর্নক্ষত্রের বাইরে আছে আন্তর্ব্রহ্মাণ্ড মহাকাশ। এমনি আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের মত সেখানে কয়েক শ' কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। তবে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড ছাড়াও কাছাকাছি আরও তিনটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। তাদের দুটি আছে দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে। তারা হল বৃহৎ ম্যাগেল্লানীয় মেঘ, (Large Magellanic Cloud) লঘু ম্যাগেল্লানীয় মেঘ (Small Magellanic Cloud)। অনুকূল আবহাওয়ায় খালি চোখে এদের দেখা যায় ছোট পাতলা মেঘের টুকরোর মত। এমনি অপর ব্রহ্মাণ্ডকে দেখা যায় উত্তর গোলার্ধের আকাশে। তার নাম হল অ্যাণ্ড্রোমিডা (Andromeda)। এই অ্যাণ্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ডটি আছে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড থেকে ২০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে। কিন্তু অ্যাণ্ড্রোমিডা মণ্ডলের তারাগুলো আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ৮০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে। তাছাড়া উত্তর মেরুতে আছে ধ্রুবতারা। এদের আকর্ষণে পৃথিবীর ভূখণ্ড দক্ষিণ মুখী চলেছে তিল তিল করে। এদিকে কঠিন বস্তু বেশি জমায় সূর্য উত্তরমুখী হলে শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ে অনেক বেশি। তাই গ্রীষ্ম চলতে থাকে। পৃথিবীর বিকর্ষণীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সূর্যকে বড় দেখায়—যেমন কুয়াশা ভেদ করে কোন আলোকে বড় দেখায়।

সূর্য আবার দক্ষিণমুখী হলে শীত প্রকাশ পায়। দক্ষিণের পূর্বোক্ত দুটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণে যে চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় তার আকর্ষণে সূর্যের গ্যাসের হেলিয়াম শিখার কিছু অংশ টেনে নেয়। সেখানে নিশ্চয় মরণযাত্রী তারা আছে। সেই তারা আকর্ষণে আমাদের সূর্যের শক্তির আকাশকে টেনে নেয়। তাই শীতে পৃথিবীর সূর্যের কাছে এগিয়ে যায়। তাদের মধ্যে কিছু কিছু আপেক্ষিক শূন্যে বুদ বুদ সৃষ্টি হয়। তাদের আপেক্ষিক শূন্যতা বস্তু টেনে গ্রহ সৃষ্টি করে। ফলে সূর্য

পৃথিবীর দিকে তাপ ছাড়ে কম। তাছাড়া বড় বড় শিখা সেই যুগ্ম ব্রহ্মাণ্ডের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকার ফলে সূর্য কৃশ হয়ে ছোট আকার ধারণ করে। এই ছোট সূর্য পৃথিবীর অল্প স্থানকে আলোকিত করায় দিন হয় ছোট, রাত হয় বড়। তাছাড়া শীতে পৃথিবীর ঊর্ধ্বমুখী ধারা কম থাকায় সূর্যের ধারার সঙ্গে সংঘর্ষ হয় কম। এই কারণে পৃথিবী বেশি ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর আকাশও সংকুচিত হয়ে যায়। সূর্যের এদিকে বেশি ঠাণ্ডা দেওয়ার অর্থ অপর দিকে গ্রীষ্ম সৃষ্টি করা। আকর্ষণে তার শিখা সেই দিকে প্রসারিত হয় বলেই।

এইসব কারণে ভূ-পৃষ্ঠকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ হল উত্তরের কঠিন অঞ্চল, দ্বিতীয় হল দক্ষিণের সামুদ্রিক তরল অঞ্চল, তৃতীয় হল মধ্যের গ্যাসীয় অঞ্চল। দক্ষিণের তরল আর উত্তরের কঠিন মিশে সূর্যের উত্তাপে গ্যাস বিস্তার করে। পেটের দিকে গ্যাস সৃষ্টি হওয়ায় মধ্যস্ফীতি বেড়েছে। নইলে সূর্য লম্বা হত। এই গ্যাসে বায়ুস্তর সৃষ্টি হওয়ায় দুই মেরু আপেক্ষিক শূন্যতার আকর্ষণে রূপ নিয়েছে। শুধু জল বাষ্প হলেই আবার তা জলে পরিণত হয়। এখানে তা না হয়ে সেই তরলের সঙ্গে বস্তু মিশে গ্যাস, পরে বায়ুস্তর সৃষ্টি করেছে। এক ভাবে গ্যাস বা হাওয়ার স্তরের ঠেলা পৃথিবীর কেন্দ্রের পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। সূর্য দক্ষিণমুখী হতে থাকে সেই স্তর কমার সঙ্গে সঙ্গে। তখন বাইরের চাপ বাড়তে থাকে। আবহাওয়ায় সূর্যের সঙ্গে সংঘর্ষ তখন কমতে থাকে। বাষ্পের অভাবে আবহাওয়া হয়ে যায় শুষ্ক।

এই কারণে কুমেরুর দিক থেকে মাটি সরে গিয়েছে উত্তর দিকে। তাই দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলের সঙ্গে কুমেরু অন্তরীপ এবং দক্ষিণ আমেরিকার টিয়েরা ডেল ফিউগো অভিমুখী অন্যান্য অন্তরীপগুলির গঠন প্রকৃতির মিল আছে। আবার অস্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। উভয় অঞ্চলের জীবাশ্মের মধ্যেও বেশ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড এইভাবে ভেঙ্গে উত্তরমুখী হয়েছে। শুধু পৃথিবীর এই ভূমি সরে যাওয়া নয়, ব্রহ্মাণ্ড জোটও সরে যাচ্ছে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে। পরমাণুর মধ্যেও এমনি খেলা চলেছে। উত্তর মুখে সরে গেলেই কি তাদের শেষ হয়ে গেল ? না, তা যায় না। উত্তর মেরুও স্থানচ্যুত হয়ে নূতন উত্তর মেরু সৃষ্টি করে। আবার সেই দিকে সব চলতে থাকে। আমাদের সূর্যের মত এমনি কাঠামো অনেক তারকার নাই বলে তাদের সৌরজগৎ নাই। এই সৌরজগৎ যখন জীর্ণ হতে হতে ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে সরতে থাকবে, তখন সেখানে যে তারকা আসবে সে সৌরজগৎ সৃষ্টি করতে পারবে। সবারই মেরুপ্রদেশ ঠাণ্ডা। সূর্যের উত্তরায়ণে সূর্যের দক্ষিণ মেরুর সঙ্গে পৃথিবীর উত্তর মেরুর সংস্পর্শে তেমন শীত হয় না। কারণ পৃথিবীর উপর মেরুর চৌম্বকত্ব সূর্যের উত্তর মেরুর চেয়ে দুর্বল। সূর্যের দক্ষিণায়নে সূর্যের উত্তর মেরুর সঙ্গে পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর সংস্পর্শে শীত হয়। কারণ সূর্যের উত্তর মেরু পৃথিবীকে টেনে কাছে আনলেও গ্যাসের স্বল্পতায় ছোট হয়েযায় বলেই দিন ছোট হয়। সূর্যের আকর্ষণ বেশি হওয়ায় পৃথিবীর গ্যাসকেও টেনে নেয়। এমনি সৌরজগতের মধ্যে বিনিময় হয়। সৌর জগৎও সামগ্রিকভাবে জিলিপির মত ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র থেকে ক্রম প্রসারতায় ক্ষয় হয়ে অসীমের শূন্যতায় মিশে যাবে, আবার গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টির মাল মসলা হতে।
